রাজাধিরাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজাধিরাজ

কামাল রাহমান

© কামাল রাহমান
প্রথম প্রকাশ
বিজয় দিবস, ২০১৮
প্রচ্ছদ
দেওয়ান আতিকুর রহমান

ধ্রুবপদ
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড ঢাকা-১১০০
প্রকাশক ॥ আবুল বাশার ফিরোজ
মুদ্রণ ঃ আলভী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
সেলফোন : ০১৬৭০-৭৬৯০৪২

দাম
৩৭৭ টাকা

ISBN 978-984-8023-01-3

Rajadhiraj
(a collection of short stories)
by Kamal Rahman
Published by Abul Basar Firoz, Dhrubapada
Rumi Market 68-69 Paridas Road, Dhaka-1100
Mobile : 01670-769042
e-mail : dhrubapadafiroz@yahoo.com
: dhrubapadafiroz@gmail.com
First Edition : The Victory Day of 2018
Price : Taka 377 Only US $ 19 ∈ 15

USA DISTRIBUTOR : MUKTADHARA
37 69 74th ST F 1 2, JACKSON HEIGHTS
NY 11372 TEL : (718) 565-7258

ঘরে বসে ধ্রুবপদ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/dhrubapada

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোনে অর্ডার করতে 015 1952 1971 হট লাইন 16297 এবং
www.porua.combd

অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

কয়েক হাজার চৌকস ও দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও কিছুটা হতাশাগ্রস্ত মানুষের বিচ্ছিন্ন একটা দল যখন কলস্বনা ভাগীরথী নদীর মনোহর তীরে এসে পৌঁছে তখন ভরা পূর্ণিমার আশ্চর্য এক রাত শুরুর লগ্ন ভেসে চলেছে বিস্তীর্ণ নদী ও চরাচরের উপর দিয়ে। সন্ধ্যার আলো ও অন্ধকার পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এমন আশ্চর্য জ্যোৎস্নার মনমাতানো আবেশ এরকম একটা ভূখণ্ডেই হয়তো সম্ভব! ওখানেই তাঁবু ফেলতে আদেশ দেয় দ্বিধাগ্রস্ত ও কিছুটা বিমর্ষ সামন্ত সেন। ভগবানের পৃথিবীর উত্তরভাগের দেবরাজ্যের শুরুটা মনে হয় এখান থেকে। এমন স্নিগ্ধ পরিবেশ সামন্তের জীবনে হয়তো এই প্রথম এসেছে।

'তাঁবু ফেলার মতো জায়গাই বটে, যুবরাজ।' ফিসফিসিয়ে বলে ওদের ছোট্ট সেনাদলের প্রধান গোবিন্দা চক্রপাণি। সামন্তের চেয়ে বয়সে কিছু বড় সে। নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ নির্ভীক এই সেনাপতি এত বেশি দিয়েছে সেনবংশের কাছে যে দেশান্তরী হওয়ার সময় অন্য কারো বিষয় মাথায়ই আসেনি সামন্তের।

'নিরাপদ কতটা?'

'পথ দেখিয়ে আনা ওই সৈনিক যা বলেছে তাতে এক রাতের মধ্যে অতিক্রম করে আসতে পারে এমন কোনো সেনাচৌকি চারদিকে নেই।'

'এলাকাটা কী পালরাজাদের আওতায় পড়ে?'

'ওভাবে বলা যায় না, যুবরাজ।'

নদীর জলে চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখিয়ে আবার বলে গোবিন্দা, 'মহাশয় দক্ষিণরায়ের এ অঞ্চলে কারো কর্তৃত্বই তেমন নেই। ছোট ছোট অনেক সামন্তরাজা আছে, নামেই শুধু রাজা। খুব সহজে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসা যাবে ওদের। চারদিকে শুধু ঘন বনবাদাড় আর নিচু জলাভূমি। লোকালয়

খুব কম। বাঘভালুকের জঙ্গল। দক্ষিণদিক তো একেবারে বিরান, সমুদ্র পর্যন্ত খুব দুর্গম।'

'ঠিক আছে গোবি, সৈন্যদের বিশ্রামে পাঠিয়ে দাও। পাচকদের বল খুব তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করতে। খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্বস্ত পাহারাদারদের রেখে বাকিদের পুরোপুরি বিশ্রামে পাঠিয়ে দাও। কত রাত যে প্রায় নির্ঘুম কাটিয়েছে ওরা! পথের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠা দরকার। কে জানে, সামনে কী আছে!'

'মনে হয় না খারাপ কিছু আর আছে, যুবরাজ। এ অঞ্চলটা নিয়ে পালরাজাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। খুব কম ধকল পেরিয়ে ছোটখাটো একটা সামন্তরাজ্য গড়ে তোলা যাবে আশা করি। যদি অল্পে তুষ্ট থাকা যায় তাহলে আশপাশের সামন্তরাজাদের বশে আনা খুব কঠিন হবে না।'

'অনেক খোঁজখবর নিয়েছ দেখছি। এ নিয়ে কাল কথা হবে। তুমিও ক্লান্ত নিশ্চয়। শিশু ও নারীরা এরই মধ্যে ক্লান্তির শেষধাপে পৌঁছে গেছে। সবার জন্য একটু আরাম-আয়েসের আদেশ দাও, ভাই।'

'তাই হবে যুবরাজ।'

ওদের ডানদিকে হাত ঘুরিয়ে বলে গোবিন্দা, 'ওদিকে দেখুন যুবরাজ, তাঁবুর সারি তৈরি হয়ে গেছে, খাবারের সুগন্ধিও ভেসে আসছে বাতাস থেকে।'

'সবদিকেই তোমার চোখ-কান সজাগ, গোবি!'

চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে গোবিন্দা বলে, 'ঠিক আছে, প্রভু। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, সেনাপতি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। চৌকস পাহারাদারদের চঞ্চল ছায়া জ্যোৎস্নার আদিম আলোয় প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় ওদের সঙ্গে। সামন্তর চোখে ঘুম আসে না। পৈতৃক রাজ্যপাট ছেড়ে একরকম বনবাসের আয়োজন করতে হয়েছে। শাব্দিক অর্থেই এখন ক্লান্ত সে। কর্ণাট আক্রমণকারী দাক্ষিণাত্যের দুর্বল দস্যুদের সঙ্গেই যে শুধু লড়তে হয়েছে, তাই না, আর্থিক সঙ্কট, গৃহবিবাদ, পার্শ্ববর্তী রাজাদের রাজ্যলোলুপতা, এসব থেকে কর্ণাটের ওই অংশটাকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবনের প্রায় পুরোটাই কাটাতে হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহে। আর না, এবার একটু শান্তি চাই। মনের গভীরে গোপন আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে একটা। দাদু বীরসেনের কাছে শোনা গল্প, ওদের কোনো এক পূর্বপুরুষ কর্ণাটে এসেছিল সমতট থেকে। চন্দ্র রাজবংশের পতনের পর দেশ থেকে সুদূর কর্ণাটে পাড়ি জমায় ওরা। এই রাঢ়, বঙ্গ, সমতট ওদের পূর্বপুরুষদের দেশ। এখানেই জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। সম্ভব হলে পুবের বাংলা নামের দেশটা থেকে বহিরাগত বর্মনদের উচ্ছেদ করে একটা শক্তিশালী সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণাটে বড় কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি ওদের। ওখানের ক্ষত্রিয়রা যদি প্রকৃত যোদ্ধা হতো তাহলে ওদের ব্রাহ্মণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মক্ষত্রিয় হতে হতো না। নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, দানদক্ষিণা হাতিয়ে, আরাম-আয়েসের ভেতর ধীর লয়ের এক পুণ্য জীবন উপভোগ করতে পারত পুরুষ-পরম্পরা।

আপাত-ধীরে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর জলে জ্যোৎস্নার অপরূপ কারুকাজ অভাবিত শিহরণ জাগায় সামন্তর হৃদয়ে। ওদের তিরুপিল্লী নদীতে জ্যোৎস্নার এমন অকল্পনীয় আল্পনা চোখে পড়েনি কখনো! হয়তো ছিল, রাজ্য শাসনের ডামাডোলে তাকিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি সেসব। এখন, জীবনের এই অলস অবসরে পৃথিবীর রূপ যেন মায়াবী জাদু নিয়ে ধরা দিয়েছে সামন্তের কোমল আলিঙ্গনে।

এত বিস্তৃত এই নদীর শরীর যে অপর তীর প্রায় চোখে পড়ে না। জ্যোৎস্নাধোয়া গাঢ় নীল আকাশের নিচে কালো ছায়ার মতো স্থলের আভা। নদীর ওপারও মনে হয় এমন জঙ্গলাকীর্ণ হবে। প্রাকৃতিক এক সুরক্ষা আছে এর মধ্যে। ধরে নেয়া যায় পুবদিক থেকে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা কম। দক্ষিণে ঘন বন, হিংস্র পশুদের রাজত্ব। পশ্চিম ও উত্তর দিক দুটো সামলাতে পারলে অনেক নিরাপদ একটা আবাস গড়ে তোলা যাবে হয়তো। যদ্দূর বুঝেছে সামন্ত, ভাগীরথীকে পুবে রেখে, পশ্চিমের ছোট ছোট সামন্তরাজাদের সঙ্গে বিবাদে না জড়িয়ে, দক্ষিণে দামোদর নদ, উত্তরে অজয় নদ অথবা সবকিছু অনুকূলে থাকলে ময়ূরাক্ষী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছোট্ট একটা রাজ্যপাট গড়ে তোলা তেমন কঠিন হবে না।

জ্বলজ্বলে সন্ধ্যাতারা পুবাকাশ হতে কখন পশ্চিমাকাশে শেষরাতের তারা হয়ে মিলিয়ে যেতে বসেছে খেয়াল নেই সামন্তের। নদীর নীরব তীরে বসে আগামীদিনের স্বপ্নজাল বুনে চলেছে সে। হঠাৎ এক আর্তচিৎকারে লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মশাল নিয়ে রাতজাগা সৈন্যদের কজন দৌড়াতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে পাহারাদারদের একজনের ছিন্নভিন্ন শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। ওর সঙ্গীটি ঘটনার আকস্মিকতায় পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ওদের দলের সর্দার কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। ওকে আশ্বস্ত করার পর জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, তিরাপ্পা?'

'ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা একটা বাঘের দিকে বল্লম তাক করেছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর। আমার নড়ে ওঠার আগেই, চোখের নিমিষে সবকিছু শেষ হয়ে যায়।' ভয়ার্ত গলায় জবাব দেয় সে। পথ প্রদর্শক দলের সর্দার বলে, 'এখানের বুনো প্রাণীরা খুব হিংস্র। কিন্তু ওদের আক্রমণ না করলে সাধারণত এরকম করে না ওরা। বাঘটা হয়তো ভেবেছিল সে আক্রান্ত

হয়েছে। জ্যোৎস্না রাতে নদীতে জল খেতে আসে ওরা। এখন ওদের প্রজনন মৌসুম, এমনিতেই গা-গরম।'

একেবারে বোবা হয়ে যায় সবাই। ভয়ে গা ছমছম করে অনেকের। স্থানীয় পাহারাদার একজন মন্তব্য করে, 'ওরা তো আর দাক্ষিণাত্যের মেছো বাঘ না, চাঁদসদাগরের বনের হালুম হালুম বাঘ। কুমিরের সঙ্গে পাল্লা ধরে বাস করে ওরা। মা মনসাদেবীর রাজ্য এটা। একটু সাবধানে থাকা উচিত সবার।'

হট্টগোলের ভেতর রাত পোহায়। পুবদিকে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে। এমন একটা দুর্ঘটনা দিয়ে দিনের শুরু কল্পনা করতে পারেনি সামন্ত। ওকে সৎকারের আদেশ দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর পর্যন্ত ডুবে থাকে ঘুমের ভেতর।

ঘুম ভাঙে এক অস্বস্তি নিয়ে। গুমোট গরম। বাতাসে আর্দ্রতা এত বেশি যে নিশ্বাস নেয়া কষ্টকর। রাতের ঐ স্নিগ্ধ আবহাওয়ার একেবারে বিপরীত এখন। মনে পড়ে রাতের শেষ প্রহরের ওই বিভীষিকার কথা। রক্তারক্তি দেখে এত অভ্যস্ত ক্ষত্রিয় কুলজাত পুরুষেরা যে মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না মনের খুব গভীরে। অথচ এরকম এক অপঘাতে মৃত্যু সামন্তের ক্ষত্রিয় হৃদয়েও দাগ কাটে। একেবারে অকারণে একটা প্রাণ ঝরে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটে, ওটা স্বাভাবিক নিয়ম, মনের একটা প্রস্তুতি থাকে ওটার জন্য। কিন্তু বনের পশু একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষকে এভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে রেখে যাবে, তা হয় কীভাবে!

রাতের অন্ধকারে যে জোনাকিরা ছিল স্নিগ্ধ আলো দেয়া পতঙ্গ, ওরাই দিনের বেলা ভোল পাল্টে এমন অসহনীয় মাছির ঝাঁক হয়ে ফিরে আসবে তা ভাবতে পারেনি সামন্ত। ভনভনে মাছি ও চরম বিরক্তিকর ভ্যাঁপসা গরম অতিষ্ঠ করে তোলে ওকে। নদীতে স্নান করে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। সেখানেও নাকি কুমিরের ভয়! স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটার একটু সুযোগও নেই। দুপুরের খাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয় সামন্ত সেন, আর এক মুহূর্তও না এখানে। যতদূর উত্তরে যাওয়া যায়, এগিয়ে যাবে ওরা। আশা করে দামোদর নদের তীর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে নতুন কোনো ঝামেলায় না জড়িয়ে। বরেন্দ্রের পালরাজারা এখন প্রতিহাররাজের আক্রমণে এত ব্যতিব্যস্ত যে এই অপয়া ও নিষ্ফলা অঞ্চলের দিকে ততটা মনোযোগ রাখতে পারবে না, এটা এক বড় ভরসা।

সামন্ত সেনের কোনো তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে উত্তরে এগিয়ে দামোদর যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে যেয়ে আস্তানা গাড়ে। চারদিকে গভীর অরণ্য। অসংখ্য ফলমূলের গাছ। পাখপাখালি ও অসাধারণ জীববৈচিত্র্য সামন্তকে স্বস্তি এনে দেয়। অরণ্যের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে লোকালয় গড়ে তোলে। আশপাশের ছোটবড় সামন্তের সঙ্গে কিছু সংঘর্ষ সামলে নেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনায়াসে। ছোটখাটো এসব সংঘর্ষে যথেষ্ট শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে হেমন্ত। যদি একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গোবিন্দার পুত্র বৈজুকে রাজমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে হেমন্তকে প্রধান সেনাপতি করার আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে সামন্ত।

জঙ্গলে অনেক বুনো মহিষ। এদের কিছু কিছু ধরে পোষ মানিয়ে নিয়েছে সামন্তের সৈন্যেরা। ওদের সবার দুধের চাহিদা মিটে যায় ভালোভাবে। নদীতে রয়েছে প্রচুর মাছ। কিছু গৃহস্থ পরিবারকে জমি দিয়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা করে স্থায়ী লোকালয় গড়ে তোলে ওরা। সদাশিবের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজা-অর্চনা করে। এখানের অধিবাসীরা শিবের অনুসারী হওয়ায় বিষয়টা অনেক সহজ হয়েছে।

আবাসনের ব্যবস্থা ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে সামন্তের জীবনে। প্রাচীনকাল থেকে কালো দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী বারবার উত্তরে অভিযান চালিয়ে এসেছে। অজয় নদের তীরে অনেক পুরোনো জনবসতি গড়ে উঠেছিল। হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছিল এখানে। উর্বর জমি, নদনদী ও খালবিলে প্রচুর মাছ ও স্থলের বন্য প্রাণীর সহজলভ্যতা মানুষের জীবন বাসোপযোগী করে তুলেছিল। কর্ণাট থেকে বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর উত্তরমুখী স্রোত আর স্থানীয়দের সহজ সরল মেলামেশায় নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। এদের মধ্য থেকে শক্তসামর্থ্য মানুষদের নিয়ে ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলে সামন্ত। এখানের মানুষদের গাত্রবর্ণ দক্ষিণীদের মতো এত কালো না। অনেকটা তাম্রবর্ণ ও মনোহর। রমণীদের দেহসৌষ্ঠব আকর্ষণীয়। শরীর কোমল ও পেলব। পুরুষদের আত্মলগ্ন করে নেয় গভীর মমতা ও ভালোবাসায়। পোড়ামাটির অলঙ্কার পরিধান করে ওরা। ফুল, পাতা ও প্রাকৃতিক অন্যান্য উপাদান দিয়ে বানানো সাজেও অপরূপ দেখায় ওদের। কর্ণাট থেকে উচ্চমানের নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকা এসে সামন্ত রাজসভা অলঙ্কৃত করতে থাকে। দক্ষিণের নর্তকীদের অপূর্ব সব নৃত্যভঙ্গিমা রাঢ়ের রমণীদের কমনীয় শরীরে নতুন এক মাত্রা এনে দেয়।

অজয় নদের উজানে রয়েছে তামার খনি। অনেক কারিগর রয়েছে সেখানে যারা তামার সঙ্গে লোহা মিশিয়ে খুব ভালো বল্লম ও তরবারি বানাতে পারে। কারুকাজ করা রুপা ও তামার অলঙ্কার মেয়েদের মন কেড়ে নেয়। গৃহস্থালি সামগ্রীও তৈরি করা যায় তামার সঙ্গে অন্যান্য আকরিক মিশিয়ে। এদেশের কারিগরের খ্যাতি অনেক দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

অসংখ্য ছোট ছোট নদী, উপনদী ও খালবিল থাকায় জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ এখানে। ব্যবসাবাণিজ্যের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এমনকি

বড় একটা নৌসেনাদল গড়ে তোলা যেতে পারে যে-কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিকে দিয়ে। হেমন্তের ভেতর ওই সম্ভাবনার বীজ বুনে দেয় সামন্ত।

সামন্তরাজের আশ্রম ঘিরে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও অক্লান্ত শ্রম কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের ঐ ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিপুল সমৃদ্ধি এনে দেয়। দক্ষিণ থেকে আরো অনেকে এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে। এখানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় না থাকায় পূজা-অর্চনার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এনে এখানকার উর্বর ভূমি দান করে ওদের প্রতিষ্ঠিত করে। পালরাজ্যের অধীন অনেক পরিবার ওখানকার অত্যাচারী সামন্ত, রাজা, ভূস্বামী ও অমাত্যদের নির্মম পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পদ্মাবতী নদী অতিক্রম করে এদিকে এসে লোকালয় গড়ে তোলে। সবাইকে স্বাগত জানায় সেনরাজারা। ভবিষ্যৎ সেনরাজ্যের আদি প্রজা এরাই।

রাজমহিষীর ইচ্ছানুসারে গোবিন্দার জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে হেমন্তের বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তুলে। কন্যাটি যেন এক অপ্সরী! ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ও ছায়া সুনিবিড় রাঢ় অঞ্চলে বাস করে গায়ের রংটাও হয়ে উঠেছে ওর উজ্জ্বল তামার মতো দ্যুতিময়। চোখেমুখে ওর বনের হরিণীর চাঞ্চল্য, সাজপোশাকে ঝলমলে রাজকীয় চাকচিক্য, পায়ের ছন্দে ও দেহভঙ্গিতে, গ্রীবার রমণীয় আন্দোলনে আকাশের সাদা মেঘের সৌন্দর্য ঝরে পড়ে। রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাসে এত জাঁকালো বিয়ের অনুষ্ঠান এর আগে দেখা যায়নি। সাত দিন সাত রাত চলে বিয়ের ধূমধাম। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো, আর অজয় নদ ও ভাগীরথী নদীর মিলনস্থলের বিস্তীর্ণ তীরজুড়ে হাজার হাজার মশালের আলো নক্ষত্রের মতো আশ্রমের আকাশ আলোকিত করে রাখে। প্রচুর সুখাদ্য, ও সোমরসের ছড়াছড়ি লোকালয়ের মানুষগুলোকে আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে রাখে পুরো হপ্তা জুড়ে। এই প্রথম এমন এক রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে রাঢ়বাসী। কর্ণাট থেকে আসা আত্মীয়স্বজনের ঢল নামে অজয় নদীর দুতীরে। উত্তরের পালরাজ্য থেকেও অনেক আত্মীয়পরিজন এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে। কর্ণাটের অভ্যন্তরীণ হানাহানির সময় কর্ণাট ছেড়ে পালরাজাদের অধীনে সৈনিক হিসেবে চাকরি নিয়েছিল ওরা। এখন ওদের অনেকে রাজ্য-সেনাদলের উচ্চপদে আসীন রয়েছে। পরবর্তীতে সেনরাজাদের শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে ওরা। দক্ষিণ থেকে আসা আত্মীয়কুলের অনেকেই আর ফিরে যায় না। এদের অনেকেই ছিল বীরযোদ্ধা, প্রকৃত ক্ষত্রিয়। হেমন্তের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে এরা। এদের সঙ্গে আসা গায়ক-বাদকদল ও ক্রীড়া-কৌতুকদলের সম্মিলিত কলগুঞ্জনে সামন্ত সেনের মনোবাঞ্ছা পুরোপুরি সফল হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঢ়ের পশ্চিমে শূর নামে ছোট্ট একটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাও করেছিল দক্ষিণ থেকে আসা কালো দ্রাবিড়েরা। কালক্রমে দ্রাবিড়দের বিস্তৃতি গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী পেরিয়ে সমতট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শূর রাজবংশটা ছোট হলেও যুদ্ধবিদ্যায় ছিল খুব পারদর্শী, জাত ক্ষত্রিয় ওরা। ওদের সঙ্গে ভবিষ্যতে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার বাসনা মনে মনে পোষণ করে সামন্ত।

রাজকীয় ওই বিবাহ অনুষ্ঠানের পর সংসার ও রাজ্যপাট হতে এক রকম সরে আসে সামন্ত। রাজমহিষী ও হেমন্তের উপর প্রায় সবটুকু দায়িত্ব চাপিয়ে বন্ধু ও সুহৃদ গোবিন্দাকে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে দাঁড়ায় রাঢ় অঞ্চলে প্রথম রাতে ফেলা ওই তাঁবুর জায়গাটাতে। রক্তাক্ত ওই দিনের স্মৃতি এখনো ভুলতে পারেনি সামন্ত। ওখানে আবার তাঁবু ফেলার জন্য আদেশ দেয় গোবিন্দাকে। কিন্তু ঐ রাতে যত সহজ ছিল ওটা, এখন তা নয়। তখন সামন্ত ছিল এক ভাগ্যান্বেষী যুবক, আজ এক প্রৌঢ়, প্রায়বৃদ্ধ রাজা। রাজার পক্ষে যেখানে সেখানে তাঁবু ফেলা সম্ভব না। নিরাপদও না। এসব যুক্তি শুনতে রাজি না সামন্ত। ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এ জীবন থেকে পরিত্রাণ চায় সে। পূর্ণ অবসর চায়। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তাঁবু ফেলে গোবিন্দার সৈন্যদল।

এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে ওরা। তখন এটা ছিল সুনসান জঙ্গলের মতো এক জায়গা। দেখে মনে হয় আশপাশে কিছু বসতি গড়ে উঠেছে এখন। জঙ্গলের গাছপালা ও লতাগুল্ম এখানে খুব বেশি ঘন। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গাছ-কাটা গুঁড়ি বলে যে কাছেই হয়তো রয়েছে মানুষের বাস। দিনের আলোয় কাঠ কাটতে আসা এক-দুজন কাঠুরে দেখা যায়।

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামন্তের মনোজগৎ ঘিরে ধরে আরো গভীর অন্ধকার। খুব বিষণ্ন দেখায় ওকে।

রাতের অন্ধকারে ভাগীরথীর নির্জন তীরে এসে বসে গোবিন্দাকে নিয়ে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটানোর পর সামন্ত বলে, 'গোবি, মনে হয় প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমার। ওপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয় এখন।'

'কী যে বলেন যুবরাজ! পৌত্র-প্রপৌত্রাদির মুখদর্শন না করে কোনো রাজা স্বর্গে গিয়েও সুখ পান না।'

'কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু সবার ভাগ্য তো আর একই রকম হয় না, গোবি।'

'তা অবশ্য ঠিক যুবরাজ।'

'গোবি, তুমি কী আমাকে এখনো যুবরাজই বলবে! আমি তো এক রাজা এখন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনেই। যে-রাতে প্রথম তাঁবু ফেলেছিল ওরা এখানে, ওটা ছিল তীব্র জ্যোৎস্নায় ভেসে বেড়ানো মেঘের মতো হালকা, রহস্যঘেরা ও অজানা এক অলৌকিক রাত। ঠিক তার বিপরীত যেন আজ। চেপে বসা অন্ধকারে সামান্য দূরের কোনোকিছুও চোখে পড়ে না। অথচ সামনের ঐ নদীটা রয়েছে ওখানেই। এর দু'তীরের বালুময় লঘুস্থল, বনজঙ্গল, বুনোপ্রাণী, নিশাচর পাখির ঝাঁক, প্রকৃতির বিচিত্র আয়োজন, সবই রয়েছে, শুধু নেই ওদের দৃষ্টির ভেতর এসবের কোনো অস্তিত্ব! নীরবতা ভেঙে আবার বলে গোবিন্দা, 'প্রার্থনা করি আপনি রাজা-মহারাজা হোন। তবুও আমার কাছে আপনি যুবরাজ, প্রভু।'

'ঠিক আছে, গোবি।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসে আবার ওদের ভেতর। জঙ্গলের গভীর দিকে একটা আলোড়ন টের পাওয়া যায়। গা ছমছম করে ওঠে দুজনের। এখানে কাটানো প্রথম রাতের কথা মনে পড়ে। আরো সাবধান হয়ে বসে ওরা। দূরের একটা ঝোপ ঘিরে জোনাকির আলোর মেলা বসেছে। নিকষ কালো অন্ধকারের ভেতর আলোর ওই বৃত্তটাকে মনে হয় পৃথিবীর একমাত্র অস্তিত্বশীল আয়োজন। বিষাদে ঢাকা ঐ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য গোবিন্দাকে জিজ্ঞেস করে সামন্ত সেন, 'আমার মনের একটা ইচ্ছে পূরণ করবে তুমি, গোবি?'

'বলুন, যুবরাজ।'

'রাজমহিষীকেও কথাটা বলার ইচ্ছে করিনি। এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে আমার গোবি। আমার চিতা যেন ভাগীরথীর এ জায়গাটায় তৈরি হয়। পুবদিকে একটা রাজ্য গড়ার স্বপ্ন এখান থেকে দেখা শুরু করেছিলাম আমি। মৃত্যুর পর আমার দেহাবশেষ যেন এখানের কালো মাটি ও ঘোলা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। এটাই যেন হয় মহাবিশ্বে আমার বিলীন হয়ে যাওয়ার ঐ পুণ্যভূমি, মানবজীবনের ঐ মহাতীর্থ, যা বুকের ভেতর গোপনে লালন করে এসেছি এত কাল!'

ঘুটঘুটে কালো এই অন্ধকার রাতে অকস্মাৎ এ ধরনের একটা প্রস্তাব আসতে পারে সামন্তের কাছ থেকে তা কল্পনা করেনি গোবিন্দা। একেবারে নির্বাক হয়ে যায় সে। অন্ধকারে সামন্তের মুখ দেখা যায় না যে বুঝবে ওর মনের ভেতরটা। কত সচেতনভাবে এটা উত্থাপন করেছে সে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। রাজ্য ছোট হলেও সামন্ত সেন এখন এক অপরাজেয় রাজা। সে যদি এমনই ইচ্ছে করে তাহলে এটা পালন করতে হবে! গোবিন্দা কিছু বলছে না তাই সামন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলছ না যে গোবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর একটু ভেবে বলুন যুবরাজ! রাজধানী থেকে কম হলেও প্রায় এক হপ্তাকালের দূরত্ব, নৌপথে আসুন আর অশ্বগামী হয়েই আসুন। আপনার শব এত দূর বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে কীভাবে?'

'আমি যদি আর ফিরে না যাই?' ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সামন্ত। তারপর আকাশের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আবার, 'এখানেই যদি অপেক্ষা করি ঐ মুহূর্তটির জন্য, গোবি?'

জবাব দেয়ার জন্য মনে মনে একটু প্রস্তুতি নেয় গোবিন্দা। তারপর বলে, 'মৃত্যুর জন্য কারো প্রতীক্ষা করতে হয় না, যুবরাজ। জন্ম যেমন একটা প্রাকৃতিক নির্বাচন, অথবা ঘটনা, তেমনি মৃত্যুও জীবনের প্রতি প্রকৃতির এক বিশেষ অবস্থান, অথবা দুর্ঘটনা। এতে জীবাত্মা, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্তা অথবা পরমেশ্বরের কোনো হাত নেই! ভাবুন দেখি ঐ রাতের কথা। দুর্ভাগা ওই যুবকের কথা। সে কী তখন বর্শা হাতে নিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে ছিল?'

'দর্শনের কথা বললে, গোবি!'

কথা আর এগোয় না। দুজনেই চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। রাত এগিয়ে যেতে থাকে রাতের নিয়মে।

এবারের বসন্ত ঋতু এসেছে গ্রীষ্মের উত্তাপ ও দাবদাহ সঙ্গে নিয়ে। গাছপালার চকচকে সবুজ, রঙবেরঙের বাহারী ফুল ও পাখিদের বিচিত্র কলকাকলি না থাকলে এটাকে গ্রীষ্মই বলা যেত। নিচু জায়গার কাদামাটি শুকিয়ে ঘাস গজানোর আগেই মাটি ফেটে চৌচির হয়ে পড়েছে। শীতঘুম ভাঙার আগেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে সরিসৃপেরা। দিনের বেলা আকাশে সূর্য জ্বলে থাকে এমনভাবে যে সামনের বছরটা নিয়ে এক আতঙ্ক দেখা দেয় মানুষের মনে। প্রকৃতির এই নির্মমতা বৃদ্ধ সামন্তর জীর্ণ শরীর আর সামলাতে পারে না। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। গোবিন্দাও এখন বৃদ্ধ। প্রায়ই এটা ওটা লেগে থাকে। আগের মতো সারাক্ষণ সামন্তের পাশে থাকতে পারে না। দিব্যচোখে জীবনের পরিণতি দেখতে পায় বাংলায় সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন।

এরপর খুব বেশি দিন আর অপেক্ষা করতে হয়নি তাঁকে।

রাজধানীতে সামন্তের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে দেহাবশেষ ভাগীরথীর এখানে নিয়ে আসে গোবিন্দা। পিতার ইচ্ছানুসারে পবিত্র ঐ জলে পিতৃতর্পণ করে ঘরে ফিরে যায় নতুন রাজা হেমন্ত সেন।

২

যে-স্বপ্নবীজ সামন্ত সেন রোপণ করেছিল হেমন্তের অন্তরে তা পত্রপল্লবিত হতে শুরু করেছে। পিতৃব্যসম গোবিন্দার সুপরামর্শে ও রাজমহিষীর সন্তান-ছায়াতলে বেড়ে ওঠা হেমন্ত ইতোমধ্যে একজন দিগ্বিজয়ী বীরের সকল গুণাবলি অর্জন করেছে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। রাঢ়ভূমির উত্তরের রাজ্য গৌড় তখন জৌলুস হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু। জলে ডোবা একটা পতঙ্গের মতো লতাপাতার আশ্রয়ে কোনোভাবে টিকে আছে।

দুশো বছর আগে সম্রাট দেবপালের রাজ্য উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে সমুদ্র, পুবে চীনদেশের সীমানা, আর পশ্চিমে কনৌজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গৌড়ীয়দের এমন স্বর্ণযুগ অতীতে আর কখনো আসেনি, ভবিষ্যৎ এখনো কালের গর্ভে। মনে মনে আশ্চর্য হয় হেমন্ত, কীভাবে এত বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এই গৌড়ীয়রা! এদের তলিয়ে যাবার সময় এসেছে এখন। অন্য কোনো রাজ্যের এই তলিয়ে যেতে থাকা গৌড় সাম্রাজ্য পুরোপুরি অধিকার করে ফেলার আগেই এটা নিজেদের করায়ত্তে নেয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে হেমন্ত। দক্ষিণের চোলরাজারাও লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে এই বিশাল সাম্রাজ্যের দিকে। হেমন্তের ভাবনা এখন শুধু উত্তরদিকে রাজ্য সম্প্রসারণই নয়, দক্ষিণের আগ্রাসন রোধ করার জন্যও সেনাবাহিনী তৈরি করতে হবে। এর পেছনে রয়েছে রাজ্যের বিপুল উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ। বিগত বছরগুলোর কৃষি-উদ্বৃত্ত, তামাখনির উৎপাদন, কুটিরশিল্পীদের অতিসূক্ষ্ম ও মূল্যবান সব সামগ্রী উৎপাদন, প্রভৃতি রাজ-কোষাগারকে যথেষ্ট স্থিত করে তুলেছে। পরলোকগত পিতা সামন্ত সেন যখন ভাগীরথী নদীতীরের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন দাক্ষিণাত্যের সম্রাট রাজেন্দ্র চোল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়, শূররাজ্য, গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গাল দেশ, মহীপালের বরেন্দ্র একে একে পদানত করেন তিনি। যুদ্ধ করে মহীপাল যদিও রাজ্য পুনরুদ্ধার করে, চোলদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আগ্রাসনের ফলে আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত পালরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্যের ক্ষমতায় এখন বিগ্রহ পাল, তাঁর পিতার রাজধানী বিলাসপুরও ওদের হাতছাড়া হয়েছে। গঙ্গাতীরের কাঞ্চনপুর থেকে এখন প্রশাসন পরিচালনা করে কোনোভাবে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছে ওরা। গঙ্গার ওপারে চন্দ্ররাজের বঙ্গালও এক দুর্বল রাজ্যে পর্যবসিত হয়েছে। সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠার এই শ্রেষ্ঠ সময়। স্বর্গত পিতার ইচ্ছাপূরণ করার এমন সুযোগ হয়তো আর আসবে না এ জীবনে। পড়শী শূররাজ্যের পরাজিত সৈন্যদের অনেকে ভাগীরথী অতিক্রম করে অপর তীরে আশ্রয় নিয়েছে। পালরাজাদের পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী ভেঙে টুকরো টুকরো, নিজের সেনাদলের সঙ্গে এদের একত্রিত করে অজয় নদের উভয় তীর দখলে নিয়ে নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে হেমন্ত সেন। প্রতিবেশী ও পদানত রাজ্যগুলোর এটা মেনে না নেয়ার কোনো কারণ ও উপায় ছিল না।

রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্য সুরক্ষিত করা ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে হেমন্ত। সে জানে যে এক পুরুষে কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায় না এবং এক পুরুষে তা শেষ হয়েও যায় না। রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে যেতে হবে। যেমন তা করে রেখে গেছে পিতা সামন্ত সেন।

এরই মধ্যে রানি যশোদা দেবীর কোলে এসেছে শিশুপুত্র বিজয়। কপালে রাজটিকা সহ জন্ম নিয়েছে বিজয়। হেমন্তের জন্মের সময় সামন্তের কোনো রাজ্য ছিল না, সামন্তও ছিল না তখন স্বীকৃত কোনো রাজা। বাহুবলে রাজার স্বীকৃতি ছিনিয়ে এনেছে হেমন্ত। দক্ষিণ দিক থেকে চোলদের হটিয়ে দক্ষিণ রাঢ় করায়ত্ত করেছে, উত্তর রাঢ় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনেছে, ভাগীরথী অতিক্রম করে রাজ্য সম্প্রসারণ এখন ওর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

বিজয়কে একজন দক্ষ নৃপতি রূপে গড়ে তোলার সব ব্যবস্থা পাকা করে হেমন্ত। খেলার সাথি হিসেবে বিজয় পেয়েছে যশোদা দেবীর বোনের ছেলে কিরাণ ও গোবিন্দার পৌত্রী শুক্লাকে। এই তিনজনের কলহাস্যে রাজবাড়ি সারাক্ষণ মুখরিত থাকে। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, সদাচার, এসব শিক্ষা দেয়ার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে গুণী শিক্ষকদের আনা হয়েছে। নাচ ও গানে তালিম দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ গুরু ও পণ্ডিতের একটা দল এসে যোগ দিয়েছে রাজপ্রাসাদে। যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর জন্য বীর ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের নিয়ে একটা বিশাল দল তৈরি করেছে হেমন্ত। এভাবে রাজবাড়ির ভেতরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উপর্যুপরি সাফল্যে ধর্মকর্মের প্রতি হেমন্তের আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়। শিবমন্দির গড়া ও পূজা-অর্চনায় মেতে থাকে অনেকটা সময়। রাজ্যবিস্তারের জন্য জনগণের সমর্থন যে খুব জরুরি এটা বুঝতে পারে হেমন্ত।

রাঢ়ের সর্বত্র জনকল্যাণমূলক সেবাকার্য ছড়িয়ে দিতে থাকে সে। রাজ্যটা জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় দস্যুদের অত্যাচার মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ওদের কুকীর্তি ঠেকানো বেশ কষ্টকর। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পাওয়া কর রাজ্যের রাজস্ব আয়ের একটা বড় উৎস। নদী ও জলাশয় দিয়ে ঘেরা বাণিজ্য পথগুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা করে হেমন্ত। অজানা অনেক দেশ হতে ছোট বড় অসংখ্য বণিকের শত সহস্র বজরা এসে ভিড় করে ভাগীরথী নদীর স্রোত বেয়ে। এসবের কোনো নাম নিশানা নেই, হিসেবও নেই। রাঢ়ের সুগন্ধি মশলা ও খাদ্যশস্যের কদর যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শস্যের বিনিময়ে এখানকার বণিকেরা স্বর্ণখণ্ড ছাড়া অন্যকিছু নিতে চায় না। এসব স্বর্ণ নাকি আসে নৌপথে পূর্ব-দক্ষিণের কোনো দেশ থেকে। আরব বণিকেরা ওসব গুমোর কখনো ভাঙে না। প্রয়োজনও নেই ওদের, সেন রাজ্যের সমৃদ্ধিই বড় কথা। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও দেশের ভেতরে প্রস্তুত বস্ত্রালঙ্কারের বিনিময়ে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ জমে সামন্তদের কোষাগারে। এগুলোর বখরা পেয়ে রাজকোষ উপচে ওঠে।

অর্থ ব্যয় করা না হলে ওর কোনো মূল্য নেই। রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থে রাজারা বাড়ায় সৈন্যদল, কর্তৃত্বের প্রসার ঘটায়, রাজ্যের পরিধি বাড়ায়। রাজ্যজয় রাজাদের কোনো প্রয়োজন থেকে নয়। রাজরাজরাদের এক অনিয়ন্ত্রিত নেশা এটা। এই নেশার খেই মেটাতে গিয়ে বিশ্বের কোথাও না কোথাও প্রতিদিন যুদ্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণ সংহার হচ্ছে, সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। এর কোনো বিকল্প নেই। এটা না হলে পৃথিবী হয়তো শুধু মানুষে ছেয়ে যেত এক সময়। কেউ যুদ্ধ করতে না চাইলেও তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। যুদ্ধ না করে উপায় নেই। যুদ্ধ সে পছন্দ করুক বা না করুক ওটা বড় কথা নয়। মানুষের টিকে থাকার জন্যই যুদ্ধের প্রয়োজন। যুদ্ধবিদ্যা শেখার কোনো কোনো পর্যায়ে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে বিজয়। ভালো লাগে ওর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে শুক্লার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে, বনেবাদাড়ে হারিয়ে যেতে। দাদু গোবিন্দার কাছে ঠাকুরদা সামন্ত সেনের গল্প শুনতে।

যখন একটু বড় হয়েছে সে গোবিন্দার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ভাগীরথী নদীর তীরে ওর দাদুর আশ্রমটিতে ওকে নিয়ে যেতে। ওটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত এক আবাস। বুনো প্রাণীর উৎপাত থাকায় লোকালয়গুলো আরো উত্তরে সরে এসেছে। ওখানের বনজঙ্গল আরো ঘন হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখার জন্য বিজয়ের ইচ্ছার প্রতি সাগ্রহে সায় দিয়েছে হেমন্ত। নিজ-রাজ্যের প্রতিটা গলিঘুঁজি জানা থাকা ভালো। জায়গাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হয় এতে। উপরন্তু, প্রজাসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। যেখানেই যেতে চায় বিজয়, সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্যের বহর পাঠায় হেমন্ত। পুত্রের সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র অবহেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখায় না সে। ভবিষ্যত রাজা হিসেবেই না কেবল, দিগ্বিজয়ী এক রাজা হিসেবে দেখতে চায় সে বিজয়কে।

কতটুকু প্রমাণসিদ্ধ অথবা সত্য তা জানে না সে এখন, পিতা সামন্ত সেনের কাছে শুনেছে যে ওদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয়। ঐ হিসেবে ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকের চন্দ্ররাজাদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা বিশাল রাজ্যের কল্পনা সে করতেই পারে। উত্তরের পালরাজ্যে যদিও ক্ষয় ধরেছে, তবু ওদের মতো এত বিশাল ও কয়েকশ বছরের প্রাচীন রাজ্য নিকট অতীতে এ অঞ্চলে কেউ গড়ে তুলতে পারেনি। ওদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে যেতে চায় না সে। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গেও যুদ্ধবিগ্রহে জড়াতে চায় না। এমনকি খুব একটা পশ্চিমে যাওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। বরং পশ্চিমের প্রতিবেশী শূরদের সঙ্গে সন্ধি অথবা সামান্য বল প্রয়োগ করে পশ্চিম দিকটা সুরক্ষিত রাখতে পারলে নিজেদের কিছুটা নিরাপদ ভাবা যায়। দক্ষিণের চোলরাজাদের উত্তর দিকে আক্রমণের পথে একটা বাধা দাঁড় করানো যায়। ঐতিহাসিক কাল থেকে দক্ষিণের রাজাদের রাজ্যবিস্তারের চাপ উত্তর দিকটাকে সহ্য করতে হয়েছে। এটার কারণ পুরোপুরি ভৌগোলিক। দাক্ষিণাত্যের তিন দিকে সমুদ্র, একমাত্র উত্তরে রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব। যখন দক্ষিণের কারো রাজ্যজয়ের সামর্থ্য দেখা দিয়েছে তখনই ওরা উত্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। উত্তরদিকটা প্রচুর সম্পদে ভরপুরও বটে। উত্তরের কন্যাদের দেহসৌষ্ঠব ও গাত্রবর্ণ দক্ষিণের পুরুষদের আকর্ষণ করেছে পতঙ্গের মতো। এই বাস্তবতাটা বুঝতে পারে হেমন্ত সেন। উত্তরের আর্যাবর্ত বা উত্তরাবর্তের মানুষেরা যে শুধু উজ্জ্বল বর্ণের তাই না, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিভিন্ন কলাকৌশলও যথেষ্ট উন্নতমানের। এদের ভাষা সুললিত, সহজ ও শ্রুতিমধুর। রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরপক্ষের শক্তিমত্তা যেমন পরিমাপ করতে হয় তেমনি তাদের গুণাবলিরও বিশ্লেষণ করতে হয়। এসব বিষয়ে বিজয়কে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করে হেমন্ত।

এর মধ্যে একটা পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় রাজপরিবারে। বিজয়কে আগামী দিনের রাজা হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে এতটা মগ্ন ছিল হেমন্ত সেন যে ভাবেনি রাজাদের শরীরের ভেতর একটা মনও আছে। শুক্লার সঙ্গে বিজয়ের একটা মন দেয়া-নেয়ার বিষয় ঘটে গেছে। যশোদা দেবীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় রয়েছে এতে। এদিকে দূতিয়ালি করে শূররাজকন্যা অনুরাধার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ের কথা গোপনে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে হেমন্ত। দুটো কারণে এটা ঠিক করেছে সে। প্রথমত চোলরাজার আক্রমণে শূররাজা পরাজয় বরণ করেছে। পাশাপাশি দুটো রাজ্যের মধ্যে এখন হানাহানি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং হেমন্ত চেষ্টা চালালে ছোট এই শূররাজ্যটা দখল করে ফেলাও সম্ভব। যুদ্ধে না গিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যদি দুটো রাজ্য এক করা যায়

তাহলে কোনো পক্ষের শক্তি ক্ষয় হয় না। বরং দুপক্ষের মিলিত শক্তিতে উত্তরের পালরাজ্য করায়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে। পালরাজাদের অবস্থা এখন সঙ্গীন। গত সাত বছরের মধ্যে তিন তিনটি রাজার পতন হয়েছে। বিগ্রহপাল, মহীপাল, শূরপালের পর এখন রামপাল সিংহাসনে বসেছে। যদিও যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন তিনি কিন্তু সমগ্র রাজ্য ধরে রাখার ক্ষমতা হয়তো তাঁর নেই। পালরাজ্যের কিছু অংশ অন্তত সেনরাজ্যে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হতেও পারে। হেমন্তের এ ইচ্ছের কাছে যশোদা দেবী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেও শুক্লার পরিবার এটা মেনে নিতে পারেনি। হেমন্ত-পরিবারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে কর্ণাটে ফিরে যায় ওরা।

জীবনের শুরুতে এমন একটা বিষয় ভীষণ মুষড়ে তোলে বিজয়কে। দাদু গোবিন্দা অনেক চেষ্টা করে কিছুটা স্বাভাবিক করে তোলে ওকে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত বিজয়কে ভাগীরথীতে নৌবিহারে নিয়ে যায় সে। বোঝাতে চেষ্টা করে রাজরাজরাদের জীবনে ব্যক্তিগত কিছু নেই। প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয়। রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সবকিছুকে বিসর্জন দিতে হয়। অবশেষে বিষয়টা মেনে নেয় বিজয়।

অনেক ধুমধাম করে বিজয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান করে হেমন্ত। শুধু যে বন্ধুস্থানীয় সামন্তরাজাদের আমন্ত্রণ করেছে তাই না, প্রতিবেশী বিরূপভাবাপন্ন রাজ্যগুলোর অধিপতি ও অমাত্যদেরও নিমন্ত্রণ করেছে সে। এমন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করে যে প্রায় দুযুগ আগে পিতা সামন্ত সেন আয়োজিত ওর নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানটাও ম্লান হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে অসংখ্য বিদেশি বণিকও আমন্ত্রিত হয়ে আসে। রাজকীয় এই মহাযজ্ঞ দেখে ওরাও হতবাক। এত মণিমুক্তা, এত সোনাদানা, এত প্রাচুর্য ছোট্ট একটা রাজ্যের ভেতর কীভাবে থাকতে পারে তা ওদের কল্পনায় ধরা দেয় না।

বিজয়ের বিয়ের পর রাজ্যশাসনের অনেক বিষয় ওর কাঁধে চাপিয়ে দেয় হেমন্ত সেন। এখন ওর মন চায় কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন। সাধারণ মানুষের মতো বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় এখন ওর। কিন্তু ক্ষত্রিয় জীবনে যে অবসর বলে কিছু নেই! পিতা সামন্ত সেন শেষজীবনে তবু কিছুটা অবসর পেয়েছিলেন। আশ্রমে নিরুদ্বিগ্ন কিছু কাল কাটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু হেমন্তের প্রায় পুরোজীবন কাটে যুদ্ধক্ষেত্রে।

অবশেষে পিতা সামন্ত সেনের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সেনরাজ্য গড়ে তোলার বিরামহীন চেষ্টার সাফল্য দেখতে পায় সে। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম সেনরাজ্য, পুত্র বিজয় সেনের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারার কৃতিত্ব অর্জন করে হেমন্ত সেন। শূররাজ্য, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, ভাগীরথীর অপর তীর মিলিয়ে শক্তিশালী একটা রাজ্যের সূচনা করেন তিনি। মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে শেষ বয়সে পিতার মতো ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

সপ্তগ্রামের পুবে ভাগীরথীর ওপারটা দৃষ্টির ভেতর ধরা দেয় না। কর্ণসুবর্ণের আরো উজানে গঙ্গা নদী দুভাগ হয়ে সপ্তগ্রামের দিকে ভাগীরথী হয়ে চলে এসেছে এক ভাগ। আর অন্য ধারাটা পুবে গেছে পদ্মাবতী হয়ে। ওই পদ্মাবতী থেকে একটা শাখা আবার পশ্চিমে নেমে এসে ভাগীরথীতে মিশে দু'নদীর পুনর্মিলন ঘটিয়েছে। এজন্য পশ্চিম দিকটাকে মনে হয় অশেষ সমুদ্র। ঠাকুরদা সামন্ত সেনকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধরলে তিন পুরুষ হয়েছে ওদের রাজ্যপাটের। কোথাও একটা রাজধানী গড়ে তোলার বিষয় বিজয়ের মনের ভেতর আলোড়ন তোলে। সেক্ষেত্রে সপ্তগ্রামের কাছাকাছি ভাগীরথী তীরে হতে পারে ওদের রাজধানী। মনের ভেতর ছিল দক্ষিণবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরদার আশ্রম অঞ্চলটা। কিন্তু একটা শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানী হওয়ার মতো ভৌগোলিক অবস্থান ওটা না। বিশেষ করে রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য ওই জায়গাটা সুবিধাজনক না। তাছাড়া পুবের বর্মনদের রাজ্যটা নিজেদের করায়ত্তে না আনতে পারলে শক্তিশালী কোনো বড় রাজ্যের স্বপ্ন দেখা অর্থহীন। পুবের দেশটা একটা স্বর্ণখণ্ড। ফসলের প্রাচুর্য ও মানুষজনের শৈল্পিক দক্ষতা অতুলনীয়। যে-কোনো রাজ্যের জন্য এটা এক বিশাল সম্পদ। কোথাকার কোন বর্মনরা দখল করে রেখেছে এত সুন্দর একটা দেশ। উত্তরের পালরাজারা এখন দুর্বল হয়ে পড়লেও এক সময়ে ওদের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ আর্যাবর্ত জুড়ে ছিল। গৌড়ের আর কোনো রাজাদের এত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়নি। সেনরাজ্যের সম্প্রসারণ পশ্চিমে যতটা সহজ হবে, উত্তরে ততটা না। তা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রয়েছে উত্তর সাম্রাজ্যের দিকে। সেক্ষেত্রে রাঢ়ও নিরাপদ না। পুবের বারকমণ্ডল, ফল্গুগ্রাম, নাব্য, রোহিতগিরি, এসব ছোট ছোট রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা গেলে উত্তরের কামরূপ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার সম্ভব হতে পারে। পালরাজাদের সঙ্গে বরং সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। আর দক্ষিণের রাজাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে চলা।

ভাগীরথী ও পদ্মাবতী নদীর সঙ্গমস্থলে সমুদ্রের মতো বিস্তৃত জলপথে ভেসে চলেছে অসংখ্য পালতোলা নৌকা। ছোট বড় এসব নৌকার পালের বিচিত্র গড়ন ও রঙের বাহার এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কিছুদিনের জন্য মহারাজা এই বিস্তীর্ণ জলের রাজ্যে অবসর কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুদ্ধে যুদ্ধে পুরোপুরি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত তিনি। অস্ত্রের ঝনঝন আর ভালো লাগে না। কবি উমাপতিকে সঙ্গে নিয়ে ভেসে পড়েন পদ্মাবতীর সীমাহীন জলের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারায়।

একঝাঁক অতিকায় হাঁসের মতো নদীর বুকে ভাসে বিজয় সেনের নৌবহর। মাঝখানে রাজার বজরা। পাহারাদার নৌকাগুলো দূরে দূরে থেকে তিনটে ছোট থেকে বড় বৃত্ত তৈরি করেছে। এর কোনোটার ভেতর ঢোকার সাধ্য অন্য কোনো নৌকার নেই। নৌবহর যখন চারদিকের কোনো কূলের নিশানা আর দেখতে পায় না বিজয়ের মনে হয় যেন সত্যিই সমুদ্রে ভেসে চলেছে। নদী ছুঁয়ে আসা স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া প্রাণমন জুড়িয়ে দেয়। উমাপতিকে বলে, 'নতুন দু-একটা ছত্র শোনাও না উমা।'

কালিদাস থেকে দু'চরণ আবৃত্তি করার পর ওকে থামিয়ে দেয় বিজয়।

'তোমার কাছে কালিদাস শুনতে চাইনি উমা। বল তো আমিই সারাদিন তোমাকে শ্রীহর্ষ, ভারবি, কালিদাস, এদের কবিতা শোনাতে পারি। তোমার বুকের ভেতর কী আছে তা বের করে দেখাও, কবি।'

'মহারাজ, ওগুলো তো সব রাজ্যজয়োল্লাস আর রাজপ্রশস্তি, সভাগৃহে ওসব শোনায় ভালো, এই নৈসর্গিক নদীর বুকে...'

আবার থামিয়ে দেয় ওকে বিজয়। বলে, 'এই নদীর বুকে ঢেউ খেলে না? এখানের আকাশে পাখি ওড়ে না, মেঘ ভাসে না? সমীরণ বয়ে যায় না, রাতে শুক্লা একাদশীর চাঁদ ওঠে না...!' মুহূর্তের জন্য মনে মনে চমকে ওঠে বিজয়। শুক্লার নাম আজ এতদিন পর কণ্ঠে এল কী করে! সঙ্গে সঙ্গে পাথর দিয়ে চাপা দেয় মনের ওই প্রকোষ্ঠ। না, রাজার কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে না। রাজার প্রেম রাজ্যের সঙ্গে। রাজার পুষ্পকানন হলো যুদ্ধক্ষেত্র। রাজার ফুলমঞ্জরি হচ্ছে ঢাল-তলোয়ার আর রাজার ভালোবাসার পাত্র অসংখ্য। রাজ্যের সমগ্র প্রজা!

'কী হলো কবি, শব্দ খুঁজছ, না ছন্দ হারিয়ে ফেলেছ?' নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করে বিজয় সেন।

'মহারাজ, এই যে নিসর্গের ভেতর ভেসে রয়েছি এর চেয়ে বড় কবিতা আর কী আছে? শব্দ দিয়ে কী এটা রচনা করা সম্ভব?'

'তুমি এক কবিই বটে উমা! যাও, ওই নৌকাটায় গিয়ে ওদের সঙ্গে মাছ ধর।'

ফল্গুগ্রামের যেখান থেকে পদ্মাবতী দক্ষিণে নেমে এসে আত্রাই নদীতে মিশেছে সেখানে পৌঁছে বিস্ময়ের সীমা থাকে না বিজয়ের। নৌপথে আগে আর কখনো আসেনি এদিকে। পদ্মাবতীর উত্তাল প্রবাহের অনেক কাহিনি লোকমুখে শুনেছে সে। কিন্তু এটা যে এত প্রমত্তা তা চোখে দেখার আগে কল্পনা করতে পারেনি। পদ্মাবতীর তীব্র স্রোতে ভেসে দক্ষিণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌবহর। ফেরার যাত্রা কল্পনা করে একটু ভাবনায় পড়ে বিজয়। উত্তাল নদীর প্রবল এই স্রোত ঠেলে উজানে যেতে আবার কত দিন লেগে যাবে কে জানে। ওকে আশ্বস্ত করে নৌবহরের পরিচালক, 'বছরের এ সময়ে হাওয়া বয় দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পাল তুলে স্রোতের বিপরীতে এগোনো খুব কঠিন হবে না মহারাজ। জলের চেয়ে বায়ুর শক্তি বেশি!'

মনে মনে হাসে বিজয়। নৌচালকের কথায় আশ্বস্ত হয় সে। করতোয়া ও পদ্মাবতীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যাত্রাবিরতি নেয় ওরা।

পশ্চিমের সমতল মন কেড়ে নেয় ওর। বর্মনদের রাজধানী বিক্রমপুরের উপকণ্ঠে পৌঁছোয় ওরা। চারদিক থেকে নদী দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। ঘোড়সওয়ারদের পক্ষে এমন জায়গা জয় করা প্রায় অসম্ভব। পদাতিক ও নৌসেনাদের সমন্বয়ে হয়তো সম্ভব হতে পারে এটা। এরকম জায়গা রাজধানী হওয়ার জন্য উপযুক্ত বটে। সপ্তগ্রাম অঞ্চলটাকে বড় বেশি অরক্ষিত মনে হয় ওর। বিশেষ করে, দক্ষিণের দুর্বার রাজাদের বিপক্ষে শক্ত কোনো প্রতিরোধ বূহ্য গড়ে তোলা খুব কঠিন ওখানে। উত্তরের পালরাজারা এখন দুর্বল হয়ে পড়লেও আবার সবল হয়ে উঠবে না এমন কিছু বলা যায় না। পুবদিকের ভাগীরথী সীমানা কিছুটা নিরাপদ। কিন্তু কোনো শক্তিশালী রাজা উপযুক্ত নৌবাহিনী গড়ে তুলতে পারলে ওটাও আর থাকে না।

নিম্নবঙ্গের ভাটি এই অঞ্চলে বিজয়ের গোপন রেকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকে পুরো শরতকাল জুরে। হেমন্তের ফসল ওঠার আগে রাজধানীতে ফিরে আসে বিজয়। রাজ্যটাকে উদ্বৃত্তে ভাসিয়ে দিয়েছে এবারের ফসল। সামন্তরাজারা খুশিতে আটখানা। প্রজাদের মনেও দারুণ ফুর্তি। বিজয়ের শক্ত হাতের শাসনে দস্যু-তস্করদের উৎপাত কমেছে উল্লেখ করার মতো। সামন্তদের বাড়াবাড়িও অনেক কমেছে। নৌপথগুলোয় শক্তিশালী টহলের ব্যবস্থা করেছে বিজয়। দেশি ও বিদেশি বণিকেরা অনেকটা নির্ভয়ে বাণিজ্য করতে পারে এখন।

শীতের শুরুতে মহাধুমধাম করে বিজয়পুর নামে নতুন রাজধানী উদ্বোধন করে বিজয় সেন। সুপেয় জলের জন্য বিশাল দিঘি খনন করে যার একূল থেকে ওকূল দেখা যায় না। পোড়ামাটির ফলক দিয়ে এত উঁচু করে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেছে যে ওটার চূড়া বিন্ধ্যপর্বতের শিখর ছাড়িয়ে গেছে।

যুবা বয়সে শূরকন্যা বিলাস দেবীকে বিয়ে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া বিজয়ের জন্য কঠিন হয়েছিল। কিন্তু এই বিয়ের ফলে রাজ্যবিস্তার অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে শূররাজ্যটা রাঢ়ের সঙ্গে মিশে এখন এক রাজ্য হয়ে গেছে। রাজ্য পরিচালনায় বিলাস দেবী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয় বিজয়কে যা শূর রাজপরিবারের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পিতার অকালমৃত্যুতে কিশোর বয়সে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল বিজয়কে। ঐ অবস্থায় রাজমহিষীর সহায়তা না পেলে জীবন ও জগতের অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে যেতে পারত।

৪

খরস্রোতা করোতোয়া আর দুকূল প্লাবী কীর্তিনাশিনী পদ্মাবতী বাঘ ও বাঘিনীর মতো উন্মত্ততা নিয়ে যেখানে এসে মিশেছে সেখান থেকে অনেকটা ভাটিতে এসে আবার ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ওই মিলিত স্রোত চন্দ্রদ্বীপের মুখে এসে দুভাগ হয়ে একভাগ ইছামতি নাম নিয়ে নেমে গেছে দক্ষিণে, আর নদীর মূল স্রোত গিয়ে মিলিত হয়েছে গভীর গর্জনের তীব্র স্রোতবাহী মেঘনাদের সঙ্গে। এর অনেকটা উজানে, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রাজাবাস নির্মাণ করে বিজয় সেন। প্রাসাদ বা দুর্গ গড়ার ভাবনা বোধ হয় বাংলার রাজাদের ছিল না। নদীর মতো ভেসে বেড়াত রাজপরিবারগুলো। এত বড় সেনরাজবংশের কোনো একটা স্থায়ী রাজধানী, নগর, প্রাসাদ বা দুর্গ ঐ অর্থে ছিল না। ভেবে অবাক হতে হয় যে যেখানে দুর্গনগরই ছিল বিশ্বের অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর রক্ষাবূহ্য, সেখানে বাংলার রাজারা কেন ওভাবে কোনো দুর্গ নির্মাণ করেনি!

শৈশব ও কৈশোর উত্তাল করা বিজয়পুরের রঙিন দিনগুলোর ফেলে আসা প্রকৃতি রয়েছে বল্লালের পুরো হৃদয় জুড়ে। কিছুটা রুক্ষ ও কঠিন, রাঢ়ের ঐ চঞ্চল প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিবাংলার এই রোদনময় অঞ্চলের কোনো মিল নেই। প্রাকৃতিকভাবে এর একটা সুরক্ষা রয়েছে বটে কিন্তু এখান থেকে রাজ্য পরিচালনা করা মনে হয় কঠিন। বল্লালের অন্তরে যতটা না ক্ষত্রিয় প্রকৃতি, তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে কবিস্বভাব। কালিদাস, হলায়ুধ, জয়দেব, বেদ উপনিষদ, স্মৃতি ও শ্রুতি, পুরাণ, মেঘদূত, পবনদূত, গীতগোবিন্দ, এসব নিয়ে মেতে থাকতে মন চায় ওর। অবিরাম সৈন্য পরিচালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিমেয় রক্তারক্তি, পররাজ্য হরণ করে নিজরাজ্যের সীমানা বাড়ানো, সামন্তরাজাদের বশে রাখা, প্রজাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এসবের মধ্যে সারাক্ষণ আনন্দ খুঁজে পায় না বল্লাল। কখনো কখনো হঠাৎ করে মন উড়ু উড়ু হয়ে যায়। তখন তন্ত্রসাধনায় মেতে ওঠে। দানসাগর গ্রন্থের প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক রচনা হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অংশ অবিরত খেলা করছে মাথার ভেতর। এক ঘোরের ভেতর ডুবে রয়েছে সে। এমন এক সময়ে পিতার আদেশে মগধের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় না ওর।

কিন্তু সদগুরু অনিরুদ্ধ ওর কাছে এসে যখন বলেন, 'পিতাহী স্বর্গ, পিতাহী ধর্ম, পিতাহী পরম পূজ্য।' তখন আর করার কিছু থাকে না।

পিতৃদেবের আজ্ঞা পালনই পুত্রের ধর্ম। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে ফিরে যায় নিজ কুলজাত ক্ষত্রিয় রূপে। মারমূর্তি ধারণ করে মগধরাজ্যটি পিতার পদতলে এনে আবার গ্রন্থ রচনার নেশায় মেতে ওঠে।

শিরায় দ্রাবিড় রক্ত ধারণ করেও আর্যদের মহাগ্রন্থ বেদ এমনভাবে আপ্লুত করে বল্লালকে যে একজন বেদ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে সে। বেদের অসংখ্য শ্লোক ওর কণ্ঠস্থ। সে মনে করে, পৃথিবীর সকল স্মৃতি ও শ্রুতি মুছে গেলেও মানুষের ভেতর থেকে বেদবাণী কখনো বিলুপ্ত হবে না। সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলনে বল্লালের রচিত অনেক শ্লোক আছে যাতে ভক্তিরসের চমৎকার বিকাশ হয়েছে। মাথার ভেতর কবিতাভাবনা আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষত্রিয়রূপ ছেড়ে প্রকৃতরূপে ফিরে আসে বল্লাল। বিশ্বস্ত অনুচর হরিঘোষকে আদেশ দেয় নৌবহর সাজাতে। পিতার অনুমতি নেয়ার জন্য সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আর্জি পেশ করে। গ্রীষ্মের প্রথম বৃষ্টিপাতের দিনই নদীতে বজরা ভাসাতে চায় সে। বর্ষাঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজধানী থেকে দূরে থাকতে চায়। মগধ জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বল্লালের প্রতি এমনিতেই খুশি হয়ে রয়েছে বিজয় সেন। সানন্দে অনুমতি দেয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা ও পরে বর্মনরাজাদের রাজধানী বিক্রমপুরের দিকে নৌবহর ভাসানোর পরিকল্পনা করে বল্লাল সেন। সেক্ষেত্রে একটা ঠোকাঠুকি লেগে নৌবিহারের আনন্দ মাটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নৌসেনাপতিও এতে সায় দেয় না। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় শীতলক্ষ্যার পশ্চিমতীর ধরে নেমে গিয়ে আত্রাই ও করোতোয়ার মিলিত স্রোত বেয়ে ওই নদীর উত্তরতীর ধরে পুবে যাবে যতদূর যাওয়া যায়। ফেরার পথে যদি মেঘনাদের পুবতীর ধরে উজিয়ে পদ্মাবতীতে মিশে ওটার দক্ষিণ তীর ধরে আসা যায় তাহলে বিক্রমপুরের চারপাশ দেখা হয়ে যায়। সেনাপতি জবাব দেয় তাহলে ফেরার সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দুভাগে ভাগ হয়ে যাত্রা করা যায়। নৌবণিকের বেশে প্রথমে আত্রাই ও করোতোয়ার মিলিত স্রোত বেয়ে নদীর উত্তরতীর ধরে পুবে গিয়ে তারপর মেঘনাদের পুবতীর ধরে চন্দ্রদ্বীপের উত্তরপূর্ব কোনায় গিয়ে নৌবহরের সঙ্গে মিশে প্রথমে পদ্মাবতী ও পরে করোতোয়া নদীর স্রোত উজিয়ে ফিরে আসা যায়। প্রস্তাবটা মনে ধরে বল্লালের। বিক্রমপুরের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে ওর ভেতর। দু'দুটো রাজবংশ কেন এমন একটা অচেনা, অখ্যাত জায়গাকে রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করে সে।

এরকম এক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে বল্লালের নৌবহর নদীতে নামলেও যাত্রা শেষে দেখা যায় অনেকটাই ভিন্ন চিত্র। সমতটের নদীগুলোয় দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে নৌকা ভাসালেও তা ঠিক রাখা যায় না। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যাত্রাপথ পাল্টাতে হয় প্রায়ই। নদীর স্রোত ও বাতাসের হিসেব মিলিয়ে প্রতিদিন ভিন্ন যাত্রা শুরু করতে হয়। কোনোদিন পুবে, কোনোদিন দক্ষিণে। ফলে নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে হয় বল্লালদের। এতে অবশ্য তেমন কোনো অসুবিধে হয় না। বরং এক ধরনের অভিযানের আনন্দ পাওয়া যায়। বিবিধ সামগ্রীর নৌবণিকের বেশে কয়েকটা ঘাসি ও সওদাগরি নৌকা নিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নৌভ্রমণ বজায় রাখলেও দ্রুতগামী কিছু পাতাম নৌকাও রয়েছে ওদের সঙ্গে। ওগুলোয় রয়েছে সদাসতর্ক সৈন্যদল ও রসদ সামগ্রী। সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ওই পাতাম নৌকার বহর, যেন কোনো দল মূল বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।

সমতটের এই ভাটি অঞ্চলগুলো নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথার কারণ নেই ওদের। অনেক বছর থেকে এসব এলাকার মানুষ কোনো রকম যুদ্ধবিগ্রহ দেখেনি। ফলে নৌকার বহর দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ওদের নেই। তাছাড়া নদীগুলোয় শতশত নৌকা প্রতিদিনই ভেসে বেড়ায়। কে কার খোঁজ রাখে বা রাখতে পারে। জলে তো আর বাধা নেই কোনো দিক থেকে। যে-কোনো দিক থেকে যে-কেউ আসতে পারে এখানে। অনেকটা নিরুপদ্রব ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বল্লালের বাহিনী। এসব লোকালয়গুলোর নগর, গঞ্জ বা গ্রামের প্রবেশপথ বা তোরণ, প্রাচীর অথবা ঘেরা নেই যে কোথাও ঢোকার জন্য বা সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। যে-কেউ এখানে ঢুকতে পারে ও বেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। প্রকৃতপক্ষে এ লোকালয়গুলোর কোনো রক্ষাকর্তা নেই বা রক্ষীবাহিনীও নেই। নিজেরাই দেখাশোনা করে নিজেদের।

পূর্ণ বর্ষায় সমতটের রূপ একেবারে ভিন্ন। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে আকাশ থেকে। কখনো তা থেকে যায় কয়েক হপ্তা, নদীগুলো ফুলেফেঁপে আশপাশের স্থল ডুবিয়ে সমুদ্রের রূপ নেয়। মানুষ ও অন্য প্রাণীদের খাবারের অভাব দেখা দেয়। সার্বক্ষণিক ভেজা আবহাওয়া শরীরেও ক্লান্তি এনে দেয়। সূর্যালোক কম থাকায় মানুষের মন থাকে বিষাদগ্রস্ত।

তিন চার দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি থাকার পর হঠাৎ করে আকাশ এত ঝকঝকে হয়ে ওঠে আর তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে স্থলের সন্ধানে বেরোতে হয় ওদের। কিন্তু আশপাশের প্রায় সব লোকালয় জলমগ্ন, স্যাঁতসেঁতে, কাদায় ভর্তি, বিশ্রী এক অবস্থা। অনেকটা পুবে গিয়ে লালমাটির এক ভূখণ্ড পাওয়া যায়। ওখানের মানুষজন বেশ সচ্ছল ও অমায়িক বলে মনে হয়। বিশাল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধমন্দির রয়েছে ওখানে। নিজেদের বণিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে বল্লালের বাহিনী। ওদের বণিক পরিচয় বজায় রাখার জন্য কিছুটা কৌশলের ব্যবহার করতে হয়। প্রচুর কাঁঠাল জন্মে এখানে। পোড়ামাটির তৈজস ও অলঙ্কার বানায় এখানের মৃৎশিল্পীরা। কয়েকটা কুমোরপাড়া রয়েছে। নৌকাগুলোর সম্মুখভাগ কাঁঠাল ও মাটির হাঁড়িপাতিলে ভরে তুলে বল্লালের অনুচররা।

পুবের এই দেশটার সৌন্দর্য ওর কৈশোরের দিনগুলো মনে করিয়ে দেয়। মাটির রং এখানে ভিন্ন, লালচে। কিন্তু প্রকৃতি বিজয়পুরের মতো গাঢ় সবুজ। নিচু পাহাড় থেকে বয়ে আসা মিষ্টি বাতাস, বুনোফুলের গন্ধ, পোষাপ্রাণীগুলোর চকচকে শরীর, ওদের ছোটখাটো আকার, সবকিছু কেমন যেন ভালো লেগে যায় বল্লালের। এখানের গরুগুলো ওদিকের বড় ছাগল থেকে সামান্য বড়। দেখতে খুব সুন্দর। বেশির ভাগ এখানের মাটির মতো লাল রঙের। বিজয়পুরের মেঘহীন, শুকনো ওই দিনগুলোকে এখন অনেক দূরের মনে হয়। কবে ফেলে এসেছে সেই সব রঙিন দিন! জীবনের নিত্যকর্মের ভেতর এখন কোনো কিছুরই আর অবসর নেই। এমনকি এই যে প্রমোদবিহারে বেরিয়েছে, মাথার ভেতর সারাক্ষণ কাজ করে চলেছে ভবিষ্যতের ভাবনা। কী এক জীবন যে দিয়ে পাঠিয়েছে ভগবান!

এখানের পায়রাগুলো এত সুন্দর, অবাক হয়ে দেখে বল্লাল! এক ঝাঁক পায়রা আকাশে উড়ে বেড়ায়। ওদের পোষক ছেলেগুলো যখন হাততালি দেয় ওরা ডিগবাজি খেয়ে আকাশ থেকে নেমে আসতে থাকে। মাটির কাছাকাছি এসে আবার উড়ে যায় আকাশে। ছেলেরা তখন হাত তালি থামিয়ে দেয়। আবার যখন ওরা তালি দেয় একই ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রকৃতির এরকম অনেক শিশুসুলভ আনন্দের ভেতর ডুবে থাকে বল্লাল।

বিকেলের ঝিরঝিরে হাওয়ায় মধ্যনদীতে বজরা নিয়ে নাচগানের আসর বসায় সে। উমাপতির নতুন কবিতা শোনে। নতুন এক নর্তকী এসেছে কর্ণাট থেকে। ওর দক্ষিণী উচ্চারণে ভাটিদেশের গীত শোনায় সে:

সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅই
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ

শ্রোতারা সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। ওর কণ্ঠের অসাধারণ কারুকাজ বল্লালকে অভিভূত করে। সান্ধ্য এই অনুষ্ঠানের পর রাজনর্তকী হিসেবে রেখে দেয় ওকে। গানের ঐ ভাষাটাও খুব ভালো লাগে বল্লালের। এটার চর্চা ও ব্যবহারের জন্য আদেশ দেয় সে।

পরদিন সকালে ছোট ছোট গাছঘেরা সুনসান একটা বনাঞ্চল পেয়ে হাঁটতে বেরোয় বল্লালের দল। হঠাৎ একদল পরিচ্ছন্ন বেশভুষা মানুষের সাক্ষাৎ পায় ওরা। বল্লালদের দেখে ঐ লোকগুলো হয়তো ভেবেছে কোনো বিতাড়িত বা পরাজিত গোত্রের মানুষজন। ওদের একজন জিজ্ঞেস করে, 'মহাশয়রা কী দূরাগত?'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

'পলাতক, না পরাজিত কোনো দল?'

'এরকমটাই ভাবছেন কেন মহাশয়, জানতে পারি?'

'আপনাদের দেখে যে তেমনই সন্দেহ হয়।'

'পর্যটক অথবা ভ্রমণকারী কোনো দল হতে পারে না?'

'এদেশের মানুষেরা ভ্রমণ করে না। মহাশয়েরা কী জানেন যে পর্যটনের অধিকার শাস্ত্র আমাদের কতটুকু দিয়েছে, আপনারা কী শাস্ত্রানুসারী নন?'

'আজ্ঞে মহাশয়, আমরা শাস্ত্রানুসারী। কিন্তু আমাদের জ্ঞান সীমিত, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন আপনারা।'

বল্লালদের নরম সুরে কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে কুলীনদের ওই দল।

'মহাশয়দের আগমনের হেতু জানতে পারি?'

'নিছকই প্রমোদ ভ্রমণ।' একটু ভেবে আবার বলে বল্লাল, 'বিকেলে আমাদের বজরায় আসুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই।'

'মহাশয়রা কী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন?'

'সমুদ্রের ধারণা কী আছে আমাদের মহাশয়! জল কতটা বড় হলে একটা সমুদ্র হয়?'

'ওটা আমাদেরও জানা নেই। তবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলে শুদ্ধি অনুষ্ঠান করতে হবে আপনাদের।'

'ওটাই বলুন। তা শুদ্ধি হবে মহাশয়েরা, বিকেলে আসুন।'

'কোন ঘাটে মহাশয়দের নৌকা?'

'এখানে কী অনেক ঘাট আছে? আমাদের নৌকা মাঝনদীতে নোঙর করা।'

'ঘাট বলতে আরো কিছু বোঝায়, মহাশয়' একটু থেমে আবার বলে, 'তা ঘাট আছে বৈকি। ঠিক আছে, বিকেলে এখানে আসব আমরা।'

'আপনাদের এখানে দর্শনীয় কিছু আছে মহাশয়েরা? ঘুরেফিরে দেখতে পারি?'

'কুলিকামিনের দেশ, এখানে দেখার আর কী থাকবে!'

'বলেন কী মহাশয়, এ পর্যন্ত তো একজনও নিম্ন শ্রেণির মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম না। বরং আপনাদের মতো কুলীনদের সঙ্গে পরিচয় হলো।'

'ভগবান রক্ষা করেছেন আপনাদের যে সাক্ষাৎ পাননি।'

'কুলীনদের কী কোনো অসুবিধা হচ্ছে এখানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আহা মশায়, কৌলিন্য কী আর রক্ষা করা যাচ্ছে এখানে! আরেকটু এগিয়ে যান, খালের ধারে শত শত কৈবর্ত আর চাঁড়াল চাষার বস্তি পাবেন। সাধ মিটিয়ে সাক্ষাৎ পাবেন ওদের।'

'সমাজে ওদেরও তো প্রয়োজন রয়েছে মহাশয়। ওরা না থাকলে আপনাদের জন্য চাষবাস করে দেবে কে, মাছ ধরবে কে, আপনাদের আবর্জনা পরিষ্কার করবে কে, আপনাদের সেবা দেবে কারা?'

'ওদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কথা বলিনি মহাশয়। বলেছি ওদের বাড়াবাড়ির কথা। উচ্চনীচ ভেদাভেদ রক্ষা করে চলতে পারার কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য মহাশয়, কোনো একটা রাজবংশ আমাদের দেশে দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকতে পারছে না। ঠাকুরদাদের মুখে গল্প শুনেছি দেশটা এক সময় আমাদের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। তারপর পালেরা এসে ওদের তাড়িয়ে দিল। দক্ষিণ থেকে বর্মনরা এসে অনেক দিন ছিল। ভালোই ছিল। আমাদের মতো বৈষ্ণব ছিল ওরা। এখানকার মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে স্থানীয় হয়ে উঠেছিল। এখন আবার সেনেরা দখলে নিয়ে নিচ্ছে দেশটা। শুনেছি ওরা নাকি শিবের ভক্ত। এই সব পালাবদলে গোত্রগুলোও সংবদ্ধ হতে পারছে না। সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদটা একেবারে উঠে গেছে।'

'খুব কী কষ্ট হচ্ছে মহাশয়দের?'

'দেখুন হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান সমান করে সৃষ্টি করেননি বিধাতা। আমাদের মানুষেরাও তেমন। জগতসংসারের সবকিছুও তেমন।'

'মানুষেরা আঙ্গুল নয় মহাশয়। নীচুজাতের মানুষেরা কী উঁচুজাতের মানুষদের কোনো ক্ষতি করেছে?'

'ক্ষতি করার ক্ষমতা কী ওদের আছে?'

'তাহলে?'

'মহাশয়েরা দেখি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না! আপনাদের দীর্ঘ ও বলশালী শরীর দেখে তো মনে হয় ক্ষত্রিয়।'

'এখানের জলহাওয়া মনে হয় সহজে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে। ঠিক আছে মহাশয়েরা, বিকেলে আপনাদের নিয়ে যেতে আমাদের লোক আসবে এখানে। দিনের তাপমাত্রা এত বেড়েছে যে মস্তিষ্ক শীতল রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'ঠিক আছে মহাশয়েরা, ঐ কথাই রইল। ইচ্ছে হলে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে দেখবেন নদীর কূল ঘেঁষে একটা বিষ্ণুমন্দির আছে, বটতলায়। নদীর হাওয়া খেতে খেতে ওখানে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

কথাগুলো বলে চোখে একটা ইঙ্গিত দেয় ওদের। বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না বল্লালদের। এখানে তাহলে বৈষ্ণবও রয়েছে। বল্লালদের ধারণা হয়েছিল এখানে বৌদ্ধদের প্রাধান্য। সকালে বেশ কজন ভান্তের একটা দল দেখেছে নদীতে স্নান করতে। ব্রাহ্মণের এই দলটা যে কৈবর্ত ও চাষার কথা বলল ওরা

বোধ হয় বৌদ্ধ হবে। নাহলে এত বড় একটা ভান্তের দল টিকে থাকবে কী খেয়ে! এ দেশের একটা ভালো দিক হলো বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা মিলেমিশে থাকে। পশ্চিমের দেশগুলোয় বাস করা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মতো সারাক্ষণ খেয়োখেয়িতে লেগে নেই!

দুপুরের দিকে আকাশ কালো করে আবার মেঘ ভেসে আসে। বাতাস খুব বেশি শুকনো থাকায় ওগুলোকে ঠেলে আরো উঁচুতে পাঠিয়ে দেয়। ভেসে ভেসে ওরা চলে যায় অন্য কোনো অজানা দেশে। এখানের মাটি থেকে যায় শুকনো। বৃষ্টিধোঁয়া গাছের পাতায় রং এত গাঢ় সবুজ যে রোদের ঝিলিক পেয়ে চকচক করে ওগুলো। কোনো কোনো গাছের কচি পাতার রং হালকা সবুজ। অনেকটা আইভি লতা অথবা টিয়েপাখির পালকের রং।

বল্লালের পাঠানো অনুচরেরা কুলীনদের ঐ দলটাকে নিয়ে নৌকায় আসে। ভালোভাবে সেজেগুজে, কপালে চন্দনতিলক এঁকে, চুলে সিঁথি কেটে বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে এসেছে ওরা। বড় রকম একটা আমোদের আশা ওদের ভেতর। বজরায় উঠার পর ভয়ের চিহ্ন দেখা দেয় ওদের চোখেমুখে। ভেতরের এত জাকালো পরিবেশ, সুন্দরী গায়িকা ও নাচিয়েদের সমাবেশ, খাবার দাবারের সুগন্ধ প্রভৃতি যে রাজকীয় আয়োজন ফুটিয়ে তুলেছে তাতে এই সাধারণ গ্রামীণ মানুষগুলোর ভয় পাওয়ারই কথা। বল্লালদের ওরা ভেবে নিয়েছিল ভাগ্যান্বেষী কোনো ক্ষত্রিয়দল হিসেবে। বেদে নৌকার বহর যেমন জীবিকার সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় তেমনি এদেশে কিছু ক্ষত্রিয় আছে যারা সব সময় থাকে সুযোগের সন্ধানে। যাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় তাদের জন্য যুদ্ধ করে। তবে যুদ্ধটা করে ওরা পেশাদারিত্ব নিয়ে, প্রাণপণে। নিজেদের ক্ষত্রিয় চরিত্রের স্খলন ঘটায় না সেখানে। পেশায় কোনো ফাঁকি নেই ওদের। যখন যুদ্ধকর্ম থাকে না, তখন হয়তো ঘুরে বেড়ায় অথবা অন্য কোনোকিছুতে দিন যাপন করে। বিশাল একটা ঘাসি নৌকায় বল্লালের ভাসমান প্রাসাদ। ওটার সামনে খোলা জায়গায় বসেছে আসর। পেছনের রাজকীয় কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে বল্লাল। কুলীনদের ঐ দল কাঁচুমাচু হয়ে গালিচার এক কোনায় বসে আছে। কিছুটা কৌতুক বোধ করে বল্লাল। জিজ্ঞেস করে, 'মহাশয়দের দুপুরের আহারাদি ও দিবানিদ্রা ভালো হয়েছে তো?'

'আজ্ঞে মাননীয় মহাশয়।'

বল্লাল লক্ষ্য করে মাননীয় শব্দটা এবার ওরা জুড়ে দিয়েছে মহাশয়ের সামনে। ওর অনুচরদের নিষেধ করা ছিল যেন ওদের পরিচয় প্রকাশ না করে। নাহলে হয়তো প্রভু সম্বোধন শুরু করে দিত।

'খুব ভালো। মহাশয়েরা কী কাব্যকলা পছন্দ করেন?'

কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না ওদের ভেতর।

'ঠিক আছে গুরু, কবিরাজ উমাপতি, শোনান কিছু কবিতা তাহলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমাপতি শুরু করে:

নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া

ব্রাহ্মণের দল একেবারে চুপসে বসে থাকে। শুরুতেই ওদের নিয়ে খোঁচাখুঁচি, এর পরে না আবার কী আছে, ভগবান জানে!

বল্লাল জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী আপনার রচনা, উমাপতি?'

'না যুবরাজ, এটা সমাজে প্রচলিত একটা চর্যা। এসবের কোনো একক রচয়িতা হয়তো নেই। থাকলেও এরা সমাজের আড়ালে সমাজের ভেতর মিশে থাকতে পছন্দ করে। এদের রচনাগুলো সমাজেরই রচনা। এরকম হাজার হাজার চর্যা ও দোহাকোষ রয়েছে।'

'ভাষাটা অনেক সহজ ও শ্রুতিমধুর মনে হয়, কবিরাজ!'

'আজ্ঞে যুবরাজ।'

'আরেকটা শোনাবেন?'

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা
তা দেখি কাহ্ন বিমনা ভৈলা
কাহ্ন কহির গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস

'ছন্দটা মাটির কাছাকাছি মানুষের। ভাষাটা সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী। সংস্কৃতের খট্টাং খট্টাং আর প্রাকৃতের প্যাঁচ ছেড়ে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। এ ভাষাটা মনে হয় অনেক আধুনিক। প্রাণ আছে এটায়। আপনাদের কাব্যচর্চা এটাতেই চালিয়ে গেলে হয় না, উমাপতি?'

'চেষ্টা করব যুবরাজ।'

'ঠিক আছে। এবার তুমি কবিতা শোনাও আদিত্য।'

বামুনদের দল নড়েচড়ে বসে। হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে কোথায় এসে উঠেছে। ওদের একটু হালকা ও চাঙ্গা করে তুলতে চায় বল্লাল। কাব্যরস যে ওদের উজ্জীবিত করতে পারবে না এটা বোঝে সে। নাচিয়েদের ইঙ্গিত দেয় আসরে আসার জন্য। বীণায় ঝংকার ওঠে, তবলা বোল ছড়ায়, আর ধীরে ধীরে নর্তকীদের চরণ নেচে ওঠে। সহজ হয়ে উঠার জন্য অতিথিদের বলে বল্লাল সেন, 'মহাশয়েরা সহজ হয়ে বসুন। এটা কোনো রাজদরবার নয়। ক্ষণিক আনন্দের জন্য একটা আবহ তৈরি করা আর কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের ভুলে থাকা, এর চেয়ে বেশি কিছু না।'

ভৃত্যদের আদেশ দেয়া হয় পানীয় সরবরাহের জন্য। কিছুক্ষণ পান করে ও নাচগানের আবেশে মুগ্ধ হয়ে সত্যিই চাঙ্গা হয়ে ওঠে ওরা। নদীর যেখানে নৌকাগুলো নোঙ্গর করা হয়েছে, সেখান থেকে কূলের চিহ্ন প্রায় চোখে পড়ে না। নীল আকাশের নিচে সবুজ এক ফিতের মতো মনে হয় নদীতীরের

স্থলভাগ। শীতল জল ছুঁয়ে আসা ঝিরঝিরে বাতাস শরীর ও মন, দুটোকেই চাঙ্গা করে তোলে। প্রকৃতির এসব অপর্যাপ্ত অনুদান ও অসামান্য উপহারের জন্যই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা ভুলে থাকা যায়। বল্লাল চুপিচুপি অনুচরদের আদেশ দেয় ওদের পরিচয় জানার জন্য ও এখানের সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য। ওদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠে ওর অনুচরেরা।

'মহাশয়দের পরিচয় এখনো জানা হয়নি আমাদের।'

'আমাদের আর কী পরিচয় মহাশয়। এলাকাটাই অধপাতে যেতে বসেছে। জাত-কুল-পরিচয় রাখার উপায় কী আর আছে?'

'মহাশয়েরা কী কোনো প্রকার দুঃশাসনের ভেতরে রয়েছেন?'

'শাসন-দুঃশাসন বুঝি না। জাতকুল রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'এখানে ব্রাহ্মণ পরিবার আছি আমরা মাত্র ক'ঘর। বাদবাকি সব চাষা ও কৈবর্তের বাস। আমাদের মধ্যে এখন আবার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আর স্থানীয় ব্রাহ্মণ বিবাদে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'মহাশয়েরা কী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ?'

'না মহাশয়, রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা তো আমাদের ব্রাহ্মণই মনে করে না।'

বিষয়টা জানা থাকায় আগ্রহী হয়ে ওঠে বল্লাল। জিজ্ঞেস করে, 'বিবাদটা কী নিয়ে?'

'শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে।'

'বিষয়গুলো কিছুটা সহজ করে নিলেই হয়।'

'আমরা তো তাই চাই। কিন্তু ওই রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা একচুল এদিক সেদিক হতে দেবে না। এসব কৈবর্ত চাষারা কী এত সব বোঝে? ওদের জন্য কিছুটা শিথিল হতে হবে না?'

'শিথিল বা কঠিন, কিছুই বোঝে না ওরা। আপনারা যা চাপিয়ে দেন তাই বুঝতে বাধ্য হয়।'

'রাঢ়ী বামুনরা বলে সেনরাজারা ওদের এনেছে দক্ষিণ দেশ থেকে। ওরাই আসল ব্রাহ্মণ। এখন ক্রিয়াকর্মে স্থানীয়রা প্রথমেই যায় ওদের কাছে। এখানে মানুষই বা কটা? আমাদেরও তো কিছু করে খেতে হয় মহাশয়। মাগছাওয়াল আমাদেরও তো আছে।'

'তা তো আছেই, মহাশয়েরা।'

বল্লাল বলে, 'সমস্যাটা তো আপনাদের মধ্যে, ঐ কৈবর্ত চাষারা কী দোষ করল?'

'ঐ রাঢ়ী বামুনদের দেখলে ওরা সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে আর আমাদের দেখলে মুখ ঘুরিয়ে থাকে যেন দেখেইনি। কোনো ক্রিয়াকর্মে ওদের না পেলে আসে আমাদের কাছে। তাও সব নিচের দিকের কাজগুলো নিয়ে।'

'নিচের দিকের কাজ? ওটা আবার কী?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হেসে ওঠে সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝলেন না মশায়, এই ধরুন শ্মশানক্রিয়া, তর্পনাদি, অমুক তমুক. . . । বিবাহাদি, অন্নপ্রাসন, এসবে আমাদের ডাকে না।'

'তাই তো। খুব অন্যায়।'

বিষয়টা একটু অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য ওদেরকে একজন জিজ্ঞেস করে, 'তা, জল চলে এমন কত ঘরের বাস আছে এখানে? ওদের সঙ্গে মিলেমিশে আপনাদের ওই সব ক্রিয়াদির পাশাপাশি কিছু কাজকর্ম করলেও তো ঐ যে বললেন আপনাদের মাগছাওয়াল, ওদের ব্যবস্থা হয়।'

একটু ছোকরা গোছের এক বামুন বলে, 'মশায়, জল না চললেও অন্য অনেককিছু চলে কাকাদের।'

ওদের মধ্যে বয়স্ক একজন গলা ঝেরে একটু নড়ে বসে।

রসিকতার গন্ধ পেয়ে বল্লালের সঙ্গীদের একজন বলে, 'অন্য কিছুটা আবার কী?'

'ঐ যে আপনাদের কে যেন কী একটা বাক্যি না কাব্যি শোনাচ্ছিলেন না, ডোমনি না ডোম্বি যেন কী?'

'হ্যাঁ, কী করেছে ডোমনি'?

'করেনি, করেনি মশায়। করায়।'

বল্লালের সঙ্গীসাথিরা বেশ বুঝতে পারে যে ভালো নেশায় ধরেছে ওদের। ওটাকে আরেকটু উসকে দেয়ার জন্য আরেকপ্রস্থ পানীয়ের আদেশ দেয় বল্লাল। পানপাত্র হাতে নিয়ে ওদের একজন বলে, 'মহাশয়েরা এই অমৃতসুধা যে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না। এখানের ডোমনিরা কী যে ধেনো বানায়, নাকের কাছে নেয়া মাত্র ভকভক করে বমি চলে আসে। নাকমুখ চেপে দুএক পাত্র চালানোর পর কিছুটা সয়ে ওঠে। রাতটা যাহোক পার করা যায় ওদিয়ে। কিন্তু পরদিন সকালে শরীরে কী যে ব্যথা হয়। ও হো হো!' এমনভাবে শেষ করে সে যেন এখনো শরীরে ব্যথা অনুভব করছে।

'তা বামুনীরা টিপেটুপে দেয় না?'

'আরে মশায়, বামুনীরা তো রাত থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে ঝাঁটা হাতে নিয়ে। শেষরাতে ওরা একটু ঘুমোলে চুপিচুপি ঘরে ঢোকা যায়।'

'তা বামুনীদের রাত কাটে কী করে? ঝাঁটা দিয়ে তো আর সব কাজ হয় না।'

হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই।

'ওদের জন্য শীতলীকরণ মন্ত্র রেখে আসে বামুনেরা।' মন্তব্য করে একজন।

আরেকবার হেসে ওদের অন্য একজন জিজ্ঞেস করে, 'আর বামুনদের শীতলীকরণ হয় কীভাবে?'

আগেরজন মন্তব্য করে, 'ধেনোতেই সব কাজ হয়ে যায়।'

গলা একটু চড়িয়ে বামুনদের একজন প্রতিবাদ করে, 'আরে না না মশায়। অন্য দেশের মাগেরা যদি ষোলো কলা জানে, আমাদের বামুনীরা জানে আঠারো কলা, আর ওই ডোমনিরা জানে কুড়ি কলা।'

ভালো নেশা ধরেছে ওদের। বেশ মজা পায় বল্লালের লোকেরা। ওদের একজন বলে, 'দুএকটা কলা ঝারুন দেখি মশায়েরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মাঝবয়েসী এক বামুন বলে, 'যাই বলুন ওদের মাগীগুলো কিন্তু খাসা।'

'খাসা বলতে? দারুণ খাসা।'

'কী যে বলি আর মশায়, গায়ে এমন বোঁটকা গন্ধ ওদের, কাছে ঘেঁষার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ করে এমন এক ধাক্কা মারে যে বর্শার ফলার মতো নাকের ফুটো দিয়ে ওটা একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে পৌঁছে। তারপর আবার ওই ধেনোর মতো একটু একটু করে সয়ে যায়। আর ওদের ওই কুড়িকলারসে যখন একবার মজে যাবেন তখন সব গন্ধ ছাপিয়ে আসল গন্ধে সব ভেসে যায়।'

'তা মশায়রা এসব ছোঁয়াছুঁয়িতে জাতটাত যায় না?'

জিভ কাটে ওদের একজন।

'যাবে না আবার? কিন্তু মন্ত্রশুদ্ধিটা আবার আমাদের হাতেই কিনা। প্রভাতে গঙ্গা স্নানে ...'

'তা মশায় বামুনীদের জাতশুদ্ধিটা?'

'ছিঃ ছিঃ! ও ভগবান, বামুনীরা সতী সাধ্বী। ওদের নিয়ে কথা ওঠানো ঠিক না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বামুনীরা রাত থাকতেই গঙ্গাস্নান করে শরীরের গন্ধটা মুছে ফেলেন। থাক ওদের কথা। তেনারা আমাদের প্রণম্য।'

বল্লাল বলে, 'তাহলে অন্যান্য বিষয়, অথবা জাতপাতের বিষয়টা এভাবে শুদ্ধিবিশুদ্ধি দিয়ে চালিয়ে দেয়া যায় না মহাশয়রা?'

'হায় ভগবান, কীসের সঙ্গে কী?'

ওদের একজন চর্যার একটা চরণ গেয়ে ওঠে:

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল
সদ্‌গুরুবোহেঁ জিতেল ভববল
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর
উআরিউএসেঁ কা ণিঅড় জিনউর

বল্লালের লোকজন বেশ মজা পায় ওদের উসকে দিয়ে। আরেকপ্রস্থ পানীয় দেয়ার অনুমতি চাইলে ওদের নিষেধ করে বল্লাল। তাহলে আর তীর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে না ওদের। ওদের পানীয়ের ব্যাখ্যাটা এখন দেয় সে, 'মহাশয়েরা পানীয়ের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন, এটা বানানো হয় পদ্মাবতী ও ভাগীরথী নদীর উভয় তীরে জন্মানো সুমিষ্ট আখ থেকে। তাই এই পানীয়টা এত উৎফুল্ল করে তুলে মানুষদের।'

'তা তো বটেই। মিষ্ট জিনিস থেকে বানানো পানীয় উৎকৃষ্ট তো হবেই। তা মশায় ঐ সৌভাগ্য তো আমাদের প্রতিদিন হবে না। আমাদের জন্য ঐ ডোমনিদের ধেনোই সম্বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন আবার বলে, 'তা ডোমনি মাগীগুলো কিন্তু খাসা।'

'খাসা বলতে খাসা।'

বিষয়টা আবার ওদিকে চলে যাচ্ছে দেখে বল্লাল জিজ্ঞেস করে, 'তা মশায়রা যে এই জাতটাত সমস্যায় ভুগছেন, এটার সমাধান কী হতে পারে?'

'আমাদের জন্য একটা নিয়ম থাকা চাই। শাস্ত্র জানা মানুষদের কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা থাকা চাই। তা নাহলে সমাজে কুলীনদের আর মর্যাদা কোথায়?'

'কুলীনদের জন্য তো প্রথা আছে। সেসব মেনে চলে সবাই। তাছাড়া শতশত একর নিষ্কর ভূমি দান করা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের। এসব জমির আদি মালিক তো ওইসব চাষা কৈবর্তরাই। যে জমি রাজারা দান করে সেসব কোনোদিন চোখে দেখেছে ওইসব রাজামশায়রা? সমাজে আপনাদের জন্য একটা কৌলিন্যপ্রথা এমনিতেই রয়েছে!'

'ওসব নামেই আছে, কাজে আসে না কিছু।'

'ঠিক আছে, রাজার কাছে আবেদন জানাবো আমরা একটা কেজো কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের জন্য।'

'খুব ভালো হয় মহাশয়। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।'

'আজ্ঞে, মহাশয়েরা। ব্রাহ্মণবাক্য তো আর বৃথা যায় না! নিশ্চয় তিনি আমাদের মঙ্গল করবেন। তবে মঙ্গলটা বেশি প্রয়োজন বোধ হয় আপনাদের।'

পানীয়ের প্রতিক্রিয়া এখন পূর্ণ মাত্রায় ওদের উপর প্রভাব ফেলেছে। কিছুটা আবোলতাবোল বলা শুরু করে ওরা। ধরাধরি করে ছোট্ট একটা কোষা নৌকায় তুলে ওদেরকে তীরে নিয়ে আসে বল্লালের অনুচরেরা। ওরা ঘাটে নামার পর ওদের প্রণাম সেরে বলে, 'এবার বাড়ি যান মহাশয়েরা। আপনাদের জাত নিয়ে বামুনীরা অপেক্ষায় রয়েছে।'

খুব একচোট হেসে নেয় ওরা। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে দ্রুতগামী নৌকা বেয়ে মূল বহরে ফিরে আসতে দুঘণ্টার উপর লেগে যায়।

ওই কুলীনদের বিদেয় করে খুব অল্প সময়ের জন্য ঘুমোয় বল্লাল। আকাশে ভোরের আলোর চিহ্ন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা পাতাম নৌকা নিয়ে ডাঙায় উঠে আসে সে। লোকালয়টা আরেকবার হেঁটে দেখার ইচ্ছে রয়েছে ওর মনে। একটা শ্মশানের কাছে এসে থেমে যায় সে। চিতা সাজাচ্ছে একদল ডোম। ওদের গৃহিণীদের নিয়ে এত কথা শুনিয়ে গেল ওই পরগাছা বামুনেরা! একটু পরে সূর্যের চেয়েও বেশি ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আকাশ লাল করে জ্বলে উঠে চিতার আগুন। মনে মনে বল্লাল উচ্চারণ করে:

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি।

(অসত্য হতে আমাকে সৎস্বরূপে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে নিয়ে যাও আলোতে, এবং মৃত্যু হতে আমাকে নিয়ে যাও অমৃতে।)

মাঝে মাঝে বল্লালের মনে হয় মৃতের জন্য এই যে প্রার্থনা, জীবিতের জন্যও তো এটা সমভাবে যাঞ্চা করা যেতে পারে। এর চেয়ে বড় অথবা এর চেয়েও মহৎ আকাঙ্ক্ষা মানুষের আর কী থাকতে পারে? এটা তো কোনো একটা ধর্মের মানুষের প্রার্থনার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। সকল মানুষেরই প্রার্থনা হতে পারে এটা। পরম ভক্তিতে কপালে হাত ছোঁয়ায় বল্লাল:

ওঁ শিবায় নম।

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসতে হয়েছিল বল্লালকে। কীভাবে যে কেটে গেছে জীবনের এতগুলো বছর! রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে মন এগিয়ে যায় না ওর। কী অর্থ এসবে? তারপরও যুদ্ধেযুদ্ধেই কেটে গেছে জীবনের পুরোটা সময়। ক্ষত্রিয় জীবনই হয়তো মানুষের জন্য এক অভিশাপ। পরক্ষণেই মনে হয়, না, শুধু ক্ষত্রিয় জীবনই না, সব মানুষের জীবনই একটা অভিশাপ। স্মরণ করে সে বুদ্ধের বাণী। জন্মজন্মান্তরে প্রতিনিয়ত পাপের ফল ভোগ করে মানুষ। একটা পাপহীন জীবনই কেবল মানুষকে দিতে পারে মহানির্বাণ! হায় ভগবান, মানুষের কী পাপহীন জীবন হয়? তাহলে সেও তো ভগবান হয়ে যাবে! কী ভ্রান্ত এ জীবন, এ জগৎ!

অস্ত্রচালনা, আর কাব্যসাধনার মতো পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের দুটো কাজ করতে গিয়ে বারবার বিভ্রান্ত হয়েছে বল্লাল। এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়ে আবার বাঁধা পড়েছে আরো বড় কোনো ভ্রান্তির জালে। ভ্রান্তি না বলে এসবকে অবিমৃষ্যকারিতা বলা যায় অথবা এক ধরনের প্রতারণাও এগুলো। তন্ত্রমন্ত্র সাধকেরা বল্লালকে মগ্ন রেখেছে মিথ্যের মায়া ফাঁদে। আবার জ্যোতিষেরা টেনে নিয়ে গেছে আরেক ভ্রান্ত মরীচিকার পেছনে। প্রতিনিয়ত জীবনের এসব যন্ত্রণা ও ধোঁকাবাজি আর সহ্য করতে পারে না বল্লাল। সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে কখনো কখনো। শেষপর্যন্ত রাজ্য ও সংসার পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে দিয়ে অবসর নেয় অমিতবিক্রম মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন। ধর্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য এসব নিয়ে মেতে থাকে কিছুদিন। রাজাবাসসমূহের পাশে বল্লালপুরী নামে নিজস্ব আবাসন গড়ে তোলে একটা। কবি সাহিত্যিক ও বিদ্যাচর্চাকারীদের নিয়ে দিনরাত কাটায় সেখানে। নতুন আরেকটা গ্রন্থ অদ্ভুতসাগর রচনায় হাত দেয়। শিবের পূজা-অর্চনা ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নিধনে মনপ্রাণ ঢেলে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে তীর ও ধনুক নিয়ে গঙ্গার বিস্তীর্ণ তীরে এসে উপস্থিত হয় লক্ষণ সেন। ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন যতটা না মনের তাগিদ তার চেয়ে অনেক বেশি ওর খেলার আনন্দ। নদীর সব চেয়ে কম প্রশস্ত অংশের অপর তীর পর্যন্ত শর পাঠাতে অনেক বছর লেগেছে লক্ষণের। এখন প্রায় সবকটাই ওপারে গিয়ে পৌঁছোয়। তীর ছোড়া শেষ করে সাঁতরে নদীর ওপারে যায় ওগুলো গুনে দেখার জন্য। এ যেন ঐ যুগের চাঁদমারি। কোনো কোনো দিন সবকটা তীর নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছোয়। ঐ দিনটাকে একটা ভালোদিন হিসেবে বেছে নেয় লক্ষণ। তেমন এক দিন নয় আজ। গতরাত ছিল পনেরো লং সনের শরত পূর্ণিমার। কবি অনিরুদ্ধ ও রাজ্যের সেরা সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত গঙ্গায় নৌবিহারে প্রমত্ত পানভোজন ও নৃত্যগীত উপভোগে কাটিয়েছে লক্ষণ। শরীরে এখনো অবসাদ। ধনুর্বাণে মন বসাতে পারছে না কিছুতে। কয়েকটা তীর এমনকি মধ্য নদী অতিক্রম করতে পারেনি। পুবের আকাশের লাল রং কেটে গিয়ে এখন ঝকঝকে নীল উঁকি দিয়েছে। সূর্যের আলোয় নিরক্ষীয় উজ্জ্বলতা। ভৃত্যের হাতে তীর ধনুক গছিয়ে নদীর তীর বেয়ে নিচে নেমে যায় স্নানের জন্য। সাঁতরে বরং শরীরের ক্লান্তি দূর করে নেয়া যাবে। শরতের নদী এখনো খরস্রোতা। জল অনেকাংশে ঘোলা। মধ্য নদীতে কিছুটা পরিষ্কার। সাঁতরে মাঝনদীতে এসে জলে ভেসে কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার জন্য চিত হয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় সে। স্রোতের টানে কখন আবার তীরের কাছাকাছি এসে পড়েছে খেয়াল করেনি। মাথা তুলতেই দেখে নদীর ঢালুতে এক জোড়া মিথুনরত নরনারী। সাতসকালে এমন একটা দৃশ্য ভাবতে পারেনি লক্ষণ। ওদের বিঘ্ন না ঘটিয়ে ডুবসাঁতারে অনেক দূরে চলে যায় সে। হয়তো কোনো প্রোষিতভর্তৃকা অথবা অক্ষমপতির নাচার কুলনারী রাতের অতৃপ্তি পুষিয়ে নিতে পারঙ্গম যুবকের শরণাপন্ন হয়েছে। বিষয়টা মুছে ফেলে মন থেকে। এরকম হতেই পারে।

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এসে দিনটাকে গুমোট জলহাওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। জলের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা ঝোপের আড়ালে ওই যুবকযুবতি আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পেরে চুপচাপ পেরিয়ে যায় ও জায়গাটা। হয়তো ওদের কোনো ভৃত্যকুলেরই হবে ওরা। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সূর্যের আলোয় নদীটাকে এখন চকচকে দেখায়। নদীর ওপার দিয়ে একসারি হাজারমনি নৌকা গুন টেনে চলেছে উজান বেয়ে। গৌড়ের রাজধানী পর্যন্ত স্রোত উজিয়ে যেতে হবে ওদের। অনুকূল বাতাস পেলে কোনো কোনো দিন পাল তুলবে, নয়তো গুন টেনে অথবা দাঁড় বেয়ে যাবে। দাদুর কাছে গল্প শুনেছে এক সময় শত শত নৌকার বহর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভেসে বেড়াত এই নদীর বুকে। সুদূর কোন দেশে রোমসাম্রাজ্য পতনের পর ভারতবর্ষেরও ব্যবসায় ভাটা পড়েছে। এখন ঐসব দূরদেশী ব্যবসায়ী আর এখানে আসে না। গঞ্জগুলোর সেদিন নেই। সারা দুনিয়ার মানুষ রোমের রাজাবাদশাহদের ইতিহাস জানে। বাঙালিদের সাম্রাজ্যের খবর কেউ রাখে না। পালরাজাদের এখন ভাটার কাল। ওদেরই এক রাজা দেবপালের রাজত্ব দুনিয়ার এদিকটায় বিশাল ডানা মেলেছিল যার দুপাখা এতটাই বিস্তৃত ছিল যে পশ্চিম দিকে তা পঞ্চনদীর পাঞ্জাব ছাড়িয়ে আফগান সীমান্তের কনৌজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল আর পুবে চীন দেশের সীমানা ছুঁয়েছিল। ওদের এখন পরতিকাল। ঐ রাজ্যের দিকে হাত বাড়ানোর লোভ আপাতত নেই সেনদের। কিন্তু রাজ্যের নিয়মই হচ্ছে নিজে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হলেও অন্যের রাজ্যে আক্রমণ চালাতে হবে। টিকে থাকার এটাই রীতি। নয়তো শুধু টিকে থাকার জন্য এই জনপদের মানুষগুলোর ঘরের বাইরে পা ফেলারও দরকার ছিল না। পদ্মাবতীর উজানে যত আখ জন্মায় তা দিয়ে পৃথিবীর সবার মিষ্টিমুখ করানো যায়। বাংলার তাঁতিরা কার্পাস থেকে যে মসলিন বোনে তা রোমের সম্রাটদেরও চাহিদা মেটাতে পারে। এখানের ঘিয়ের স্বাদ যারা না পেয়েছে তাদের তা বোঝানোই অসম্ভব। সুগন্ধি চাল, মশলা, নদীতে মাছের প্রাচুর্য, কী নেই এখানে!

স্নান সেরে বল্লালপুরীর লক্ষণভবনে এসে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে দুপুরের খাবারের জন্য আসন নেয় লক্ষণ। বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন সামন্তকর্তাদের সে ডেকে পাঠিয়েছে আজকের ভোজসভায়। পিতার আদেশে আসন্ন শীত মৌসুমে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে ওকে। এসময়ে এটার ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু পিতার আদেশের পরিপন্থী কোনোকিছু উচ্চারণ করতে পারে না সে। ভোজসভায় এখন সঙ্গে রয়েছে ওর বাল্য-কৈশোরের বন্ধুরা। এদের কয়েকজনের আবার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা রয়েছে। লক্ষণের অধীনে যে সেনাপতিকে নিযুক্ত করেছে বল্লাল সেন, তার বয়স ওর প্রায় দ্বিগুণ। বল্লালের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছে সে। ছোটখাটো কিছু যুদ্ধ জয় করে ইতোমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বীরযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছে লক্ষণ। কিন্তু এবার যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে পালদের বিপক্ষে। প্রায় তিনশো' বছরের রাজত্ব ওদের। এত বিশাল রাজত্ব গৌড়ীয়দের কোনো কালে ছিল না, যদিও ওরা এখন ক্ষয়িষ্ণু। দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটদের ও পশ্চিমের প্রতিহাররাজদের সঙ্গে ত্রিমুখী সংঘাতে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষ। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সবাই। পালরাজাদের হয়তো পরাজিত করা যাবে। কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরিণাম ভিন্নরকম হতে পারে। পশ্চিম থেকে আসা দুর্ধর্ষ তুর্কিরা যুদ্ধের কোনো নিয়মনীতি মানে না। যেভাবে ওরা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলো গ্রাস করছে, জনপদ ছারখার করে, মন্দির উপাসনালয় ভেঙেচুরে হাজার হাজার লোকালয় মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তা যে-কোনো বর্বর আক্রমণকারী দস্যুতস্করকেও হার মানায়। সেনরাজ্যের উত্তরদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আর দক্ষিণে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত সমুদ্র। পুবে রয়েছে দুর্গম পাহাড় ও পর্বতের সারি। শক্তিশালী কোনো রাজ্য নেই ওদিকে । একমাত্র পশ্চিমদিকটা সামলাতে হয় ওদের। পশ্চিমের পালরাজ্য যদি শক্তিশালী থাকে তাহলে সহজেই তুর্কি বর্বরদের সামলাতে পারবে ওরা। সেক্ষেত্রে সেনরাজ্যটা নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেনরাজ্য গড়ে উঠেছে বর্মনরাজদের হটিয়ে। পালদের সঙ্গে বিবাদে যাওয়া মনে হয় ঠিক হচ্ছে না এখন।

খেতে বসে অন্যদিকে মন দেয়া উচিত হচ্ছে না ভেবে সেনাকর্তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে লক্ষণ। মুখোমুখি দুসারি আসন পাতা হয়েছে। সারি দুটোর এক প্রান্তে, মাঝখানে লক্ষণের আসন। ডানে ও বায়ে, দুদিকেই কথা বলা যায় মাথা না ঘুরিয়ে। ভৃত্যেরা খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেলে ভোজপর্ব শুরুর আহ্বান জানায় লক্ষণ। যুবরাজের প্রশস্তি গেয়ে ঝকঝকে কাঁসার থালায় হাত রাখে সবাই। দক্ষিণ বাংলায় জন্মানো সুগন্ধি ধান হতে তুষ-ছাড়ানো সরু লালচালের ভাত, সোনারং ঘিয়ের সুবাস, রুপোর ছোট ছোট বাটিতে সাজানো বিভিন্ন রকম শাকসবজি, ছোট মৌরলা মাছের ঝোল থেকে শুরু করে বোয়াল, চিতল, রুই প্রভৃতি মাছের তরকারি, মুড়িঘণ্ট, অম্বল এসবের অঢেল সমারোহ যে-কারো চোখ জুড়িয়ে দেয়ার মতো। ওদের সঙ্গে এখন অতিথি হিসেবে আছে উত্তররাঢ় থেকে আসা আত্মীয়কুলের দুজন রাজপুরুষ। কারুকাজ করা বিচিত্র আকারের কাঁসা ও রুপোর তৈজসপত্রের ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য, খাবারঘরের জাঁকজমক ও খাবারদাবার ও পানীয়ের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য অতিথিদের অভিভূত করে। রুক্ষ উত্তরবাংলায় এত বিচিত্র খাদ্য ও পানীয়ের সমাবেশ কখনো দেখেনি ওরা। ওদের একজনের থালায় মৃগেল মাছের বেশ বড় একটা মুড়ো। যেভাবে ওটা খাওয়া শুরু করেছে সে, মনে হয় এখন পৃথিবীর সেরা খাবারটা রয়েছে ওর

পাতে। খাবারের প্রতি ওর এমন অখণ্ড মনোযোগ দেখে একটু অবাক হয় লক্ষণ।

পালরাজ্যের বিশদ খবরাখবর সংগ্রহ করে এনেছে ওরা। একান্তই গোপনীয় নয় যেসব সংবাদ, সেগুলো নিয়ে পরামর্শ করার ইচ্ছে এখন লক্ষণের। পিতার আদেশে পালরাজ্য আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে লক্ষণ। কিন্তু এটার যথাযোগ্য কারণ ও যুদ্ধের জন্য পালরাজাদের আহ্বান জানানোর জন্য দূতিয়ালি কার্যক্রম ঠিকঠিকভাবে করতে চায় সে। ক্ষত্রিয় জীবনের শুরু থেকেই নিজেকে কালিমাহীন রাখতে চায়। তুর্কি-তস্করদের মতো শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে পররাজ্য গ্রাস করার ইচ্ছে ওর নেই।

পালরাজারা নাকি দীর্ঘদিন থেকে গৌড়ীয় চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওদের কাছে স্থানীয় ভাষা জানা একজন বাংলাভাষী দূত পাঠাতে চায় সে। নিজেদের দক্ষিণী ভাষা বলতে গেলে জানেই না লক্ষণ। চলনে বলনে, খাদ্যাভ্যাসে, আচার আচরণে সেনেরা পুরোপুরি বাঙালি হয়ে উঠেছে। ওরা যে দক্ষিণদেশীয় সামন্ত এটা এখন অনেকে জানেও না। ভারতবর্ষের রাজ রাজরাদের দূতিয়ালির ভাষা অবশ্য সংস্কৃত। সুহৃদ কবি ধোয়ীর সংস্কৃতটা আবার খুব উঁচুমানের। ওর সংস্কৃত কবিতা লক্ষণকে আবেগাপ্লুত করে। নিজেও কবিতা রচনা করে সে। পিতা বল্লাল সেনের দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের একজন ভক্ত সে। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটা এখনো শেষ করতে পারেনি বল্লাল সেন। রাজ্য পরিচালনা আর কাব্যচর্চা একসঙ্গে চালানো সত্যিই কঠিন। পালরাজাদের কাছে যুদ্ধের ঘোষণা জানানোর জন্য উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করতে পারে ধোয়ী। আরো বেশ কয়েকজন উঁচুমানের সভাকবি রয়েছে বল্লালের কবিসভায়। এদের মধ্যে উমাপাতি ধর, অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, জয়দেব, ধোয়ী এর যে কাউকে পত্র লেখার ভার দেয়া যেতে পারে। লক্ষণের পছন্দ জয়দেব। সে যা লিখেছে তার সারমর্ম হলো: পালরাজ্য আক্রমণের কোনো অভিলাষ সেনরাজাদের নেই। কিন্তু পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে সীমান্তবর্তী সামন্তরা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে সেনরাজ্যের সামন্তদের মধ্যেও ওদের কুপ্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এদের দমনের জন্য সেনরাজার সেনাদলের পালরাজ্যে অভিযান চালানো জরুরি হয়ে পড়েছে। কোনো বিকল্প না থাকায় বর্তমান তেত্রিশ লং সনের আশ্বিনী পূর্ণিমার তৃতীয় রাতের শেষে প্রদোষকালে সেনরাজার সেনাদল পালরাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি যুবরাজ লক্ষণ সেন ধনুর্বাণ হস্তে শত্রুদমনের জন্য রথারোহী হয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। শত্রুদমন ও রাজ্যে শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছেন যুবরাজ। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের নির্দেশে এই দূতপত্র পালরাজের নিকট প্রেরণ করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশংসাসূচক শব্দ ঝরে পড়ে লক্ষণের ঠোঁট থেকে। 'বাহ্, উপযুক্ত কারণ দেখিয়েছ জয়দেব। শব্দবাহুল্য নেই, কোনো কাব্য করোনি, যা বলার সবই বলেছ। আশা করি যুদ্ধশেষে উপযুক্ত উপঢৌকন পাবে তুমি।'

'উপঢৌকনের জন্য কবির কলম নয় যুবরাজ। আপনার পরিতৃপ্তি আমার অন্তরের বাসনা।

'ঠিক আছে জয়। যুদ্ধশেষে ত্রিবেণীতে নৌবিহার হবে। পুরো পূর্ণিমাতিথী ধরে চলবে কাব্যচর্চা। পানভোজন, নৃত্য গীত, ক্রীড়া-কৌতুক-কেলি, আমোদ-আয়াশ, যা খুশি, যত খুশি তোমার।'

'ঠিক আছে যুবরাজ।'

সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ হলে আসে সোমরস নেয়ার পালা। খাবারঘর ছেড়ে জলসাঘরে এসে তাকিয়ায় গা এলিয়ে দেয় লক্ষণ ও তার সভাসদেরা। প্রকৃতিও যেন এতে সায় দিয়ে দিন শেষ না হতেই মেঘমালা পাঠিয়ে আকাশ অন্ধকার করে তোলে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে একটু পরে। দক্ষিণ ভারতীয় নর্তকীদের কোমল চরণে বেজে ওঠে নূপুর। নিক্কণে ঝংকৃত হয়ে ওঠে জলসাঘর। তবলার বিচিত্র বোল অপার্থিব জগতে নিয়ে যায় নেশাগ্রস্ত মানুষগুলোকে। গভীর রাতে স্খলিত চরণে ঘরে ফিরে যায় সবাই। লক্ষণের সঙ্গে থেকে যায় মেঘনা নদীতীরবর্তী গ্রামের এক চারণকবি আরণ্য। নেশার ঘোর কেটে গেলে ওর সঙ্গে সহজ আলাপে মেতে ওঠে লক্ষণ। আরণ্যের আচরণে একধরনের উদাস ভাব রয়েছে। কবিতা রচনা করে সন্ধ্যাভাষায়। কত দিন বলেছে ওকে লক্ষণ যে সহজ সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতে। ওর কবিতার সৌন্দর্য ও ভাব লক্ষণকে মোহিত করে। সংস্কৃতে ওসব রূপান্তর করলে জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন, এদের কবিতার চেয়ে অনেক ভালো কবিতা হিসেবে জায়গা করে নেবে ওগুলো। ও শুধু বলে, 'আসে না যুবরাজ!' না এলে আর কী করা! ওর ঐ সন্ধ্যাভাষায় রচিত কবিতাই শোনে লক্ষণ। আগামী যুদ্ধযাত্রা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে লক্ষণ যে আরণ্যের অনুমান অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক মিলে যায়! কার্যকারণ বিবেচনা করে, অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলে সে। পালদের বিরুদ্ধে অভিযানে ওর সায় নেই। লক্ষণ জিজ্ঞেস করে, 'তোমার এমনটা ভাবার কারণ কী আরণ্য? সেনরাজ্য গত প্রায় একশো' বছর ধরে রাঢ় ও বঙ্গের মাটিতে শেকড় ছড়িয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। এখন এটার বিস্তৃতি নিশ্চয় দরকার।'

'এটার বিস্তৃতি কিংবা সম্প্রসারণের বিপক্ষে নই আমি যুবরাজ। কিন্তু এটার প্রতিক্রিয়া কী হবে একবার ভেবে দেখুন। কিছু মনে করবেন না, দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছেন আপনারা, যদিও এই মাটিকে এখন নিজের করে নিয়েছেন, কিন্তু পালরাজারাও এখন এই বাংলামাটির সন্তান। ভারতবর্ষের উত্তর অংশে

পুরো আর্যাবর্ত ছিল ওদের অধীন। এখন এই রাজ্যটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, আপনাদের দক্ষিণদেশীয়দের বারবার আক্রমণে ...

ওকে বাধা দিয়ে বলে লক্ষণ, 'শুধু দক্ষিণদেশীয়দেরই দেখছ কেন, পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহাররাজদের সঙ্গেও তো ওদের সবসময় যুদ্ধ করতে হয়েছে।'

'হ্যাঁ হয়েছে। এই ত্রিমুখী যুদ্ধের ফলে লাভ হয়েছে কার? বরং সবারই ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে বিধর্মী তুর্কি-আফগান-ইরানিরা আর্যাবর্ত ছারখার করে দিচ্ছে। নগরের পর নগর, শত শত লোকালয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছে ওরা। আর্যাবর্তের সকল সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা এদেশে এসেছিলেন, কিছু মনে করবেন না মহারাজ, দক্ষিণে সুবিধা করতে না পেরে। এদেশকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে লুটতরাজ আর ধর্মান্তরিতকরণের জন্য নিশ্চয় না। পালরাজ্যটা তো বৌদ্ধদের। প্রজাদের ধর্ম উৎখাত করে হিন্দুধর্ম নেয়ার জন্য বাধ্য করেননি আপনারা। বৌদ্ধমন্দির ভেঙে ওখানে হিন্দুমন্দির গড়ে তুলেননি। অথচ চেয়ে দেখুন, ওরা শুধু লুটতরাজ করেই ক্ষান্ত থাকছে না, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছাড় দিচ্ছে শুধু ধর্মান্তর গ্রহণ করলে। এভাবে হাজার হাজার বছরের সভ্যতা, কৃষ্টি, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পালরাজাদের আক্রমণ না করে বরং ওদের সঙ্গে সন্ধি করে, ওদের সাহায্য করে একটা সংঘশক্তি গড়ে তুলে বিধর্মীদের ঠেকানোর চেষ্টা করা উচিত। একই ভুল কিন্তু পালেরাও করেছে। গহরবাল রাজ্য আক্রমণ করে ওদের দুর্বল করে ফেলেছে। এই সুযোগে বিধর্মীরা পুবদিকে ধেয়ে আসতে পেরেছে। ওদের ফেরানোর ক্ষমতা সেনদের আছে? আমার অপরাধ ও ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন যুবরাজ।'

'তোমার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারছি আমি, আরণ্য। মোটেও অমূলক নয় এটা। খুবই যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ। আমাকেও ভাবনায় ফেলেছে এটা।'

'জানেন তো, যুবরাজ, আর্যাবর্ত যাদের হাতে তারাই ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারে। গৌড়ীয় পালরাজাদের শাসনে আর্যাবর্ত একটা শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠতে পারে। এই গৌড়ীয়দের দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে যাওয়া। এই ত্রিমুখী সংঘর্ষে যদি পালরাজারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পুরো ভারতবর্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটাই আমার ভয়ের কারণ যুবরাজ। গৌড়ীয়দের পরাজয় হবে পুরো ভারতবর্ষেরই পরাজয়।'

'তোমার এ দুশ্চিন্তাটা ভেবে দেখার মতো, আরণ্য। কিন্তু পালদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করার সুযোগ কোথায়?'

'সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। সুযোগ কখনো অপেক্ষায় থাকে না। যুদ্ধের সুযোগ থাকলে আলোচনারও সুযোগ থাকে। ভারতবর্ষের বড় তিনটা রাজ্যের ত্রিমুখী সংঘাতে ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে দেশটা। এটা নতুন নয়। শত শত বছর ধরে এরকমই হয়ে আসছে। এতকাল ছিল নিজেদের কর্তৃত্বের সংগ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ এখন নিজেদের অস্তিত্ব অন্যদের হাতে বিলিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছে। ক্ষমা করবেন যুবরাজ, ভিন্ন এদুটো পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্যটা বুঝতে হবে আপনাদের, মানে রাজাদের। আমরা তো নগণ্য প্রজা মাত্র। আমার মতো একজনের ভাবনা কেন, আমাদের লক্ষজনের ভাবনারও কোনো মূল্য নেই রাজাদের কাছে। পৃথিবী পাল্টে দেয় একদুজন মানুষ। লক্ষকোটি মানুষ শুধু অনুসরণ করে ওদের।' একটু থেমে বলে, 'এ প্রসঙ্গটা থাক, যুবরাজ।'

'তুমি বল আরণ্য, আমি শুনছি।'

একটু ভাবে আরণ্য, আর এগোবে কিনা। তারপর বলে, 'রাজারা সবাই চাইছে আধিপত্য, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি, আর সুযোগটা নিচ্ছে বাইরের তস্করেরা। ত্রিমুখী এই হানাহানির সঙ্গে সেনেরা যোগ দিলে এখন লড়াইটার রূপ হবে চতুর্মুখী। বিধর্মীদের জন্য এভাবে নিজেরাই এদেশের প্রবেশপথ তৈরি করে দিচ্ছি। ওদের ইতিহাসটা একটু দেখুন যুবরাজ। তেমন শক্তিশালী কেউ না ওরা যে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের রাজাদের পরাজিত করতে পারে। মধ্য এশিয়ার খানদের হাতে মারখাওয়া পলাতক ও ভাগ্যান্বেষী, পুরোপুরি চরিত্রহীন, লোভী ও নিয়মনীতিবর্জিত একদল ভবঘুরে যোদ্ধা। ঐ অর্থে ওদের কোনো দেশ নেই, জাতীয়তা নেই, যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে চলেছে শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে। এদের বরং সংঘবদ্ধ ডাকাতের দল বলা যেতে পারে।'

আরণ্যের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে লক্ষণ সেন, 'সত্যিই ভাবিয়ে তুললে আরণ্য।'

'বিষয়টা ভাবনারই যুবরাজ।' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় আরণ্য।

রাতের প্রকৃতি রহস্যময় হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। জলসাঘরের কৃত্রিম আলো ছেড়ে বেরিয়ে আসে দুজনে। হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরে এসে দাঁড়ায়। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে কোনো এক অচেনা আবেশে জড়িয়ে ধরে ওদের। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে খুব কোমল একটা বাঁশির সুর। একটু অবাক হয় লক্ষণ!

'এত রাতে বাঁশি বাজায় কে?' জিজ্ঞেস করে লক্ষণ।

'জানি না যুবরাজ।'

'কে শোনে ওর বাঁশি এখন এই এত রাতে!' কণ্ঠে ওর বিস্ময়।

'নিজের জন্যই হয়তো বাজায়, অথবা সে জানে যে কেউ না কেউ জেগে আছে শুধু ওর ঐ বাঁশি শোনার জন্য।'

'সত্যি আরণ্য?' বিশ্বাস হতে চায় না লক্ষণের।

'তাও জানি না, যুবরাজ।'

'তাহলে বললে যে?'

'মনে এল। হয়তো কল্পনা করে বললাম।'

'কত কিছু কল্পনা করে মানুষ!'

'শুধু প্রকৃতটাই না!' রহস্যটা জমিয়ে তোলে আরণ্য।

'যেমন?' জিজ্ঞেস করে লক্ষণ।

'পার্থক্যটা দেখুন, যুবরাজ, এই একটু আগে জলসাঘরে গানবাজনা করছিল যারা, ওদের সম্পর্কে কী কোনো আগ্রহ জন্মেছিল আপনার ভেতর?'

'না তো!'

'অথচ এই অজানা অচেনা এক বাঁশিওয়ালা এখন আপনার মনে ঠাঁই নিয়েছে।'

'সত্যি, বড় বিচিত্র এই মানুষ। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার দার্শনিক ইঙ্গিতটা, আরণ্য।'

'অপরাধ নেবেন না প্রভু। সামান্য এক বাউল আমি।'

'ঠিক আছে বাউলকবি, এখন একটা কবিতা শোনাও।'

'আমার কবিতা তো আমজনতার মুখের ভাষায় গড়ে ওঠা যুবরাজ। এসবকে কবিতা বলাও মনে হয় ঠিক না। এসবের বেশিরভাগই আমার না। গ্রামগঞ্জের চারণ কবিদের মুখে মুখে রচনা। যে দু-চারটা ভালো লাগে শিখে নেই। মাঝে মাঝে গুনগুন করি।'

'ওসবেরই দু-একটা শোনাও। তোমার সঙ্গে নিরিবিলি মিশি ওসব শোনার জন্যই আরণ্য।'

'হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের মনে কী আছে জানতে হলে এসব শোনা ভালো। আপনার সভাসদরা রাজপ্রশস্তি রচনা করে অনুদান, উপঢৌকন এসব পাওয়ার জন্য।

'এত ছোট করে ওদের দেখার কারণ নেই, আরণ্য। কাব্যপ্রতিভা কজনের আছে, বল।'

'অপরাধ নেবেন না যুবরাজ। ওদের ছোট করার জন্য বলিনি। নিশ্চয় ওরা মহৎ কবি। ওদের বিষয় ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

'আমি চাই তোমার কথাও ইতিহাসে লেখা থাক।'

'আমজনতার কথা, চারণকবির রচনা কখনো ইতিহাস হয় না, ওসব লোকমুখেই থেকে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার নতুন নতুন গাথা রচিত হয়।'

'যা হোক, এখন কিছু শোনাও আরণ্য।'

'শোনাই তাহলে, গত হপ্তায় উজানের কোনো গ্রাম থেকে এক গায়ক এসেছিল। কয়েকরাত ওর গান শুনেছি। দুটো চরণ সারাক্ষণ মনের ভেতর বেজে চলেছে

ও তোর যমুনার জল গো সই দেখতে কালো
ওই নদী কূলের নারী আমার দেখতে গো ভালো।

'বাহ্, বাহ্।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওসব গানের যে একটাই রূপ, তা কিন্তু না যুবরাজ। ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন গায়কের কণ্ঠে এসব ভিন্ন রূপ নেয়। ওটার আরেকটা রকম শুনুন:

ওই যমুনার জল গো আমার দেখতে কালো

সখি তোর রূপ দেখে আমার লাগে গো ভালো।

'ভালো তো! ঐ গায়কদের কাউকে নিয়ে আসো না কাল রাতে। ওদের গান শুনি।' আরণ্যকে প্রস্তাব দেয় লক্ষণ।

'দরবারের গায়ক না ওরা যুবরাজ। রাজদরবারে ধরে আনলে একটা শব্দও বেরোবে না ওদের গলা দিয়ে। ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকবে।'

'তাহলে?'

'মাটিলগ্ন মানুষ ওরা। মাটিতে বসে গান গায়। একতারা কী দোতারা বাজিয়ে নেচে গেয়ে বেড়ায়। যুবরাজ যদি খুব ইচ্ছে করেন, আগামী পূর্ণিমায় শীতলক্ষ্যা নদীতীরের অশ্বত্থঘাটে বৈষ্ণবকীর্তন হবে। করতাল মন্দিরা বাজিয়ে খুব ভাবের গান বাজনা করে ওরা। শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

'যাব কীভাবে ওখানে?'

'ছোট কোশা নৌকায় চড়তে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে একেবারে অশ্বত্থতলায় নৌকা ভেড়ানো যাবে। অনেক নৌকা থাকবে ওখানে। মানুষেরা প্রায় সবাই ডাঙ্গায় উঠে যাবে ওদের গান বাজনা শোনার জন্য। নৌকায় বসেই ওদের গান শুনতে পারবেন আপনি।

'ভালো ভেবেছ তো আরণ্য। তাই হবে। আর কারো জানার দরকার নেই। শুধু তুমি আর আমি। নৌকা বাইতে পারবে তো?'

'পারব যুবরাজ। নদীর একটু উজানে গিয়ে অপেক্ষা করব আমরা যেন স্রোতের টানে নিঃশব্দে ঘাটে এসে ভিড়তে পারি।'

ওই পূর্ণিমা রাতে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের লীলাকীর্তন ও নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে অশ্বত্থতলা। গভীর রাত পর্যন্ত গান বাজনার ভেতর মোহিত হয়ে থাকে লক্ষণ সেন। বিষ্ণুভক্তিমূলক ঐ কীর্তন এতটাই মুগ্ধ করে ওকে যে আরণ্যের মাধ্যমে ঐ দলটাকে বল্লালপুরীতে থেকে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে লক্ষণ। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকে। ধীরে ধীরে ওদের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে নিজেও বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী হয়ে ওঠে। বল্লালপুরীতে বিষ্ণুমূর্তি ও মন্দির গড়ার জন্য আদেশ দেয়। নিজেও বিষ্ণুর পুজারি হয়ে ওঠে লক্ষণ সেন।

৬

ফল্গুগ্রামের যেখানে এসে পদ্মাবতী দুভাগ হয়েছে তার দক্ষিণে পৌঁছে গড়াই নদী ধরে ভাটি বরাবর নেমে আসে লক্ষণ সেনের রণপোতবহর। বর্ষাঋতু এবার অনেক এগিয়ে এসে রণযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণের এ অঞ্চলটা সমুদ্র পর্যন্ত সবুজ অরণ্য ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম, লোকালয়। মানুষগুলো নিতান্তই দরিদ্র। প্রচুর ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হয় এখানে। কিন্তু সবই সামন্তপ্রভুদের ভোগে যায়। চাষবাস করে খেটে খাওয়া মানুষেরা, মাঝিমাল্লারা, কৈবর্তচাষারা। ছোট থেকে বড় সব সামন্তপ্রভুদের অধীনে একধরনের দাস হিসেবে কাজ করে এরা সবাই। এই সব সামন্তপ্রভু প্রায় সবাই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ দুষ্প্রাপ্য। রাঢ়ের এই সামন্তগোষ্ঠী যে-কোনো রাজরাজরাদের জন্য এক দুধার করাত। এদের ছাড়া রাজত্ব চলে না। রাজকোষের অর্থ জোগানদার এরাই। আবার এদের অত্যাচার থেকে রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের রক্ষা করতে হয় রাজাদের। ফলে কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে, আবার কখনো চাবকিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এদের। ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের একই দশা। ভেতর থেকে ঘুণপোকার মতো শক্তি খেয়ে ফেলায় রাজশক্তির অনেকটা নষ্ট হয়। যে-জন্য বাইরের শত্রুর সঙ্গে কুলিয়ে উঠা কষ্টকর হয়। দক্ষিণের কয়েকজন সামন্তপ্রভু এত বেশি বেড়েছে যে নিজেদেরই ওরা রাজা ভেবে বসে আছে। এদের অত্যাচারে নৌবাণিজ্য হুমকির মুখে পড়েছে। সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ নৌবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এখান থেকে রাজ্যের আয়ও প্রচুর। হাটবাজারগুলোর নিরাপত্তা ও পণ্যসামগ্রীর চলাচল অবাধ করা না গেলে রাজ্যের অর্থাগম হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে মধ্যরাত থেকে। গাছপালা ও ঝোপঝাড়গুলো আছড়ে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে ঝড়োবাতাস। ছৈয়ের ফাঁকফোকর দিয়ে নৌকার ভিতরে ঢুকে পড়ে পৌষমাসের ঠাণ্ডাপানির মতো শীতল বৃষ্টির ছাঁট। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবহাওয়ায় মাঝিমাল্লাদের সর্দিকাশি লেগে যায়। গড়াই নদীর বাঁকে নোঙ্গর ফেলেছে লক্ষণের দল। একটা খাঁড়ির মতো জায়গা বিচ্ছিন্নভাবে জলের স্রোত থেকে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনটে মাত্র নৌকা এখন রয়েছে ওদের সঙ্গে। নদীর ওপারে গোপন রাখা হয়েছে পুরো নৌবহর। প্রয়োজন হলে ডাকা হবে ওদের। বৃষ্টির ভেতর কখন দশ বারোটা নৌকা এসে ঘিরে ধরেছে ওদের বুঝতে পারেনি লক্ষণের সেনাদল। মনে মনে ভাবে লক্ষণ, ভালোই হলো, নিজেরাই এখন টোঁপ হয়ে উঠেছে। আদেশ দেয়ামাত্র সঙ্গী নৌকা দুটো থেকে নৌসেনারা বেরিয়ে এসে ডাকাতদলটাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। ওদের বেঁধে সব কটা নৌকা সহ নদীর ওপারের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেয়। বৃষ্টি থামার জন্য দুদিন অপেক্ষা করতে হয় ওদের। এখানের সামন্ত জমিদার দুর্জয় সেনের কাছে দূত পাঠানো হলে নিজেই ছুটে আসে সে। বিশাল বপু ও ইয়া মোটা গোঁফে ওকে দেখে সাধারণ মানুষদের এমনিতেই ভয় পাওয়ার কথা। এই সামন্ত পরিবারটা লক্ষণদের জ্ঞাতি-কুটুম, আদর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখে না। দুর্জয় সেনের মতো অত্যাচারী সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই কুটুমদের কিছুটা শক্তিক্ষয় করা ছাড়া লক্ষণের উপায় নেই। এদের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রায় সবাইকে ঢালসড়কি বল্লম-টেঁটা প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্রসহ লক্ষণের সেনাদল এসে নিয়ে যায়। উত্তরসীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এদের প্রয়োজন জানিয়ে কাজটা করে লক্ষণ। এরকম আরেকটা স্থানীয় সেনাদল গড়ে তুলতে কমপক্ষে আরো পাঁচসাত বছর লেগে যাবে দুর্জয়ের। ওখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় যুদ্ধের প্রয়োজন দেখিয়ে কোষাগার থেকে ধনরত্নও সব উঠিয়ে নিয়ে যায় লক্ষণ।

দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় সব সামন্তরাজ্যে এ ধরনের বিভিন্ন কুটুমসেবা শেষ করতে বর্ষা মৌসুম পেরিয়ে যায়। প্রায় সবকটা নদীতে তখন বান ডেকেছে। প্রবল স্রোতের বিপরীতে উজিয়ে বল্লালপুরী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে কিনা ভেবে কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে লক্ষণ। অনুকূল বাতাস দেখে পাল তুলে, আবার কখনো দাঁড় টেনে শেষ পর্যন্ত বল্লালপুরী পৌঁছে ওরা। সফল একটা সামরিক অভিযান শেষে প্রচুর ধনরত্ন ও অস্ত্রসম্ভার নিয়ে বিজয়ীর বেশে বল্লাল সেনকে প্রণাম করে লক্ষণ সেন। ওখান থেকে ফিরে আসার সময় দীর্ঘ বিশ্রামের অনুমতি চেয়ে নেয়। ডাকাতের যে দলগুলো বেঁধে নিয়ে এসেছে ওদের বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করে প্রকৃত পেশাদার কয়েকশো জোয়ানকে ওদের সেনাদলের জন্য উত্তরে পাঠিয়ে দেয়। বাকিদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে ভৃত্য হিসেবে রেখে দেয়ার জন্য আদেশ দেয়। সেনাদলের জন্য বাছাই করা জোয়ানদের একজনের মধ্যে ভবিষ্যতে আগুন ঝরানো যোদ্ধা হয়ে উঠার সব লক্ষণ দেখা যায়। ওর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার জন্য সেনাপতির কাছে গোপন আদেশ পাঠায় লক্ষণ। এরপর পুরো বর্ষাকাল কবিতা, সংগীত ও নৃত্য উপভোগ করে কাটিয়ে দেয় সে।

শরৎ এসে যাওয়ায় নদীর স্রোত ধীর হয়েছে অনেকটা। জলধারা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। নদীর উভয় তীর জুড়ে কাশফুলের সীমাহীন বিস্তার। এবার মাছ শিকারে বেরোবে লক্ষণ। এ মৌসুমটায় অলস সময় কাটাতে ভালো লাগে ওর। রাতগুলো থাকে ঝকঝকে আকাশে উজ্জ্বল তারায় সাজানো। সন্ধ্যা হতে না হতে লোকালয়ের পথগুলো নটিনীদের নূপুর ও নিক্কণে চঞ্চল হয়ে ওঠে। নাচঘর মাতিয়ে তোলার জন্য এদের বিভিন্ন কলাবিদ্যা ও পারদর্শিতা অতুলনীয়। ওদের সঙ্গে যোগ দেয় মন্দিরের সেবাদাসীরা ও সভানটিনীরা। পুরুষদের সবরকম বাসনা মেটানোর কোনো ঘাটতি নেই সেনরাজ্যে।

বঙ্গনারীর কোমল অঙ্গের সুখ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এদের কোমল লবঙ্গলতা বাহুবন্ধনে যারা একবার বাঁধা পড়েছে তাদের পক্ষে এদেশ ছেড়ে যাওয়া অনেকটা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উত্তরদক্ষিণ কিংবা পূর্বপশ্চিম যেদিক থেকেই পুরুষেরা এখানে এসেছে আর ছেড়ে যায়নি এদেশটা। এদের শরীরকলা ও সম্ভোগে আত্মলীন করে ফেলার ক্ষমতা এত প্রবল, এত বেশি অকৃত্রিম এদের অন্তরের ভালোবাসা যে এ মোহ কাটানো কঠিন হৃদয় পুরুষের পক্ষেও সম্ভব হয় না। এবারের পুরো শরৎ কুমারকেলিতে কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে রাখে লক্ষণ।

সেনরাজ্যের পূর্ব সীমান্তের গভীর স্রোতস্বিনী মেঘনা নদী প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষা দিয়েছে এই দেশটাকে। সেনদের নৌসেনা এ অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মেঘনার ভাটিতে এসে পশ্চিম তীরের বিস্তীর্ণ চন্দ্রদ্বীপ উপকূলে বজরা ভিড়ায় লক্ষণ। অসংখ্য শাখানদী ও খালবিলে ভরা এলাকাটা এক প্রাকৃতিক দুর্গ বিশেষ। নদীনালার তীর ঘেঁষে পানি পর্যন্ত ঝুলে আছে গাছপালার বিস্তার। এদের যে-কোনো একটা খাল অথবা ছোটখাটো খাঁরির ভেতর লুকিয়ে রাখা যায় আস্ত একটা নৌবহর। জলপথগুলো জালের মতো চারদিকে এমনভাবে ছড়ানো যে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া এখানে নৌচালনা একরকম অসম্ভব। নৌবহরের প্রতিটা নৌকায় কম করে হলেও একজন স্থানীয় মাল্লা আছে। বৈঠা বাইতে গিয়ে বা দাঁড় টানতে গিয়ে আপন মনে গান গেয়ে ওঠে ওরা। ভাটি বাংলার এমন আমুদে মানুষজন উত্তরবাংলায় কিংবা রাঢ়ে খুব বেশি দেখা যায় না। এদের খুব ভালো লাগে লক্ষণের।

মেঘনার বুকে এখন শতশত জেলে নৌকা মাছ ধরে চলেছে। মাছ ধরা শেষ হলে নদীর দুতীরের ছোটবড় গঞ্জগুলোয় বিক্রি করতে নিয়ে যাবে ওরা। এরকম একটা গঞ্জ থেকে কিছুটা দূরে নৌকা ভিড়িয়ে পায়ে চলা পথ ধরে একটা হাটের দিকে এগিয়ে যায় লক্ষণের দল। সঙ্গীসাথিদের সাবধান করে দিয়েছে নিজেদের পরিচয় না দেয়ার জন্য। দরকারও নেই এর। স্থানীয় সামন্তরা এরকম হাটবাজারে নিজেরাই বাজার করতে আসে। হয়তো কোনো প্রতিবেশী সামন্ত হিসেবে ধরে নেবে লক্ষণকে। কোনো অসুবিধে নেই এতে। হাটের এক প্রান্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় তাঁবু খাটিয়ে কোনো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সার্কাসটার্কাস হবে হয়তো। পাশেই চলছে দাঁড়িয়াবাঁধা খেলা। খুব হৈহুল্লোড় ওখানে। হাটের এক কোনায় তেলেভাজার একসারি দোকান। বাদাম ও তিল তেলের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে। পদ্ম পাতায় বানানো ঠোঙায় ওসব কিনে গরম গরম খেয়ে নেয় ক্রেতারা। ঘরে নেয়ার জন্য বাঁশের ছোট চাঙারিতে কেউ কেউ জিলিপি কিনে নেয়। ধূলিধূসরিত হাটের ভেতর দিয়ে এসব দেখে দেখে হাট পেরিয়ে যায় ওরা। হাটের পাশে ছোট্ট একটা তাঁবুর ভেতর ঝলমলে পোশাক পরা ভিন্ন চেহারার এক লোক দেখে একটু থামে লক্ষণ। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে এরা কারা? ওদের দেখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে এক বুড়ো।

'এ তাঁবুটাকে খুব বেশি নগণ্য মনে না হলে ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক প্রভু।'

ওদের বেশভূষা দেখে স্থানীয় কোনো সামন্ত ভেবে কিছুটা ভয় পেয়েছে লোকটা। এ অবস্থায় ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কোমল চোখে তাকায় লক্ষণ। ভাবভঙ্গিতে নির্ভয় ভাব ফুটিয়ে তোলে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকতেই মাথা তোলে বিচিত্র রঙের পোশাক পরা এক লোক। একটু কাঁপা গলায় বলে, 'প্রণাম মহাশয়।' ওকে দেখে মনে হয় বেশ অসুস্থ। 'প্রণাম। শুয়ে থাকুন মহাশয়। ওঠার দরকার নেই। কী হয়েছে আপনার? আপনি কে?'

তাঁবুর এক প্রান্তে একটা খাঁটিয়ায় শুয়ে আছে লোকটা। রেশমে তৈরি লালরঙের একটা বস্ত্র ঝুলছে কটিদেশ থেকে। ওটার সঙ্গে লাগানো উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা জামা রয়েছে শরীর জড়িয়ে। বিচিত্র রঙের চকচকে পাথরের মালা ওর গলায়। মুখ ও গায়ের রং ফ্যাকাশে। থুতনিতে একগোছা কালো দাড়ি। ঠোঁটের দুপ্রান্তে বেড়ালের মতো দুগাছি হালকা গোঁফ। মুখের চামড়ায় বয়সের আঁকিবুঁকি অথবা দীর্ঘ অসুস্থতার লক্ষণ। ওর রক্তশূন্য মুখ ও বুকের উপর আড়াআড়ি ভাজ করে রাখা হাত দুটো দেখে মৃত্যুপথযাত্রী মনে হয় ওকে। অথচ ভেতরে ভেতরে যে সে অনেক সবল রয়েছে তা বোঝা যায় ওর চকচকে চোখ দুটো দেখে। এদেশের ভাষা বোঝে না সে। সঙ্গে রয়েছে বহুভাষা জানা দোভাষী আর কয়েকজন দেহরক্ষী। ডাকাতদলের কবলে পড়ে ওর সঙ্গীদের দুজনকে হারাতে হয়েছে গত হপ্তায়। নিজেও আহত হয়েছে। দোভাষীর মাধ্যমে জানায়, 'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব আগে দেই, মহাশয়। দেয়ার মতো তেমন কোনো পরিচয় আমার নেই। আমার পিতা ইউনান প্রদেশের এক বীরযোদ্ধা। পিতার অবাধ্য হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। প্রভু বুদ্ধের সত্যরাজ্য খুঁজে ফিরি। অথচ চারদিকেই দেখি মিথ্যার অসীম সাম্রাজ্য। সামান্য এক পরিব্রাজক আমি, মহাশয়।'

'এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব পেতে পারি মহাশয়?'

'নিশ্চয় মহাত্মা।' একটু থেমে বলে, 'জানি না এ অঞ্চলটা কোন সামন্ত বা রাজার অধীন, এখানে সাধারণ মানুষজনের জীবন নিরাপদ নয়, এটা জানা ছিল

না। আমার সামান্য পাথেয়ের লোভে একদল ডাকাত আমার দুজন সাথি ভিক্ষুকে হত্যা করেছে। আমাকেও আহত করেছে!'

'আপনি এদেশে অতিথি। আপনার প্রতি এরূপ আচরণের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী মহাশয়।'

'না না, ওভাবে দেখবেন না বিষয়টা। আপনার তো কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এখানে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে লক্ষণ। এটা যে নিজেদেরই ব্যর্থতা, এবং এ অপরাধের শাস্তি যে তারও প্রাপ্য, তা বুঝতে পেরে কুণ্ঠিত হয়।

'যদি আজ্ঞা করেন, মহাশয়ের ক্ষতি কিছুটা লাঘব করার অনুমতি দিন। দুজন ভালো দেহরক্ষী ও কিছু মুদ্রা...'

লক্ষণের কথা শেষ হতে দেয় না সে, 'না না, মহাশয়, বিচলিত হবেন না, প্রয়োজনে আমরা চেয়ে নেব, শুধু প্রার্থনা করুন যেন শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠি।'

'ঠিক আছে মহাশয়। যাবেন কোথায় এখন? আমাদের গন্তব্য হয়তো অভিন্নও হতে পারে।'

'আমার নাম সাং চুয়া, যেখানে যাচ্ছেন ওখানে পৌঁছে যদি এ নামের কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পান, বুঝবেন ওটাই আমি। এ নামের আর কেউ আমার আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না।'

'ঠিক আছে মহাশয়। আপনার আপত্তি থাকলে আপনার গন্তব্য জানার প্রয়োজন আমার নেই। আপনার যাত্রা শুভ হোক। যদি কখনো প্রয়োজন হয় এ অধমকে স্মরণ করবেন।'

এ কথা বলে কটিদেশ থেকে কারুকার্য খচিত একটা রেশমী থলে খুলে ছোট্ট একখণ্ড তুলোট বস্ত্র হাতে নেয়। তাঁবুতে জ্বালানো পিদিমের উপর একটা মোহর ধরে ভুষোকালিতে ওটার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বস্ত্রখণ্ডটার উপর চেপে ধরে। সাবধানে ভাঁজ করে ওটাকে পেঁচিয়ে গোল করে চিকন বাঁশের একটা ফাঁপা চোঙের ভেতর ঢুকিয়ে ওর হাতে দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'দিনগুলো বোধ হয় ভালো যাবে না। চোরডাকাতে ছেয়ে গেছে দেশ। এদের শায়েস্তা না করে প্রমোদবিহার সাজে না আমাদের।'

'তা সত্যি যুবরাজ। কিন্তু এসব কেন করে ওরা তা বুঝতে হবে আমাদের। মানুষ চুরিডাকাতি করে অভাব থেকে। সামন্তরা যেভাবে মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছে তাতে ওদের একটা অংশ যদি চোরডাকাত হয়ে যায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং সামন্তদের দমন করা উচিত যুবরাজ।'

'সামন্ত না থাকলে রাজার অস্তিত্ব থাকে আরণ্য?'

'তা খুব সত্যি। কিন্তু সামন্তদের লোভটাকে বশে রাখার চেষ্টা করতে হবে তো।'

'এটা প্রকৃতির নিয়ম, আরণ্য। ছোট সামন্ত চায় বড় সামন্ত হতে, বড় সামন্ত চায় ছোট রাজা হতে, ছোট রাজা চায় বড় রাজা হতে, বড় রাজা... এভাবেই এগিয়ে চলে। মানুষের চাওয়ার তো শেষ নেই। সে যত বড়ই হোক না কেন। এই চক্রে কিছু মানুষ ভালো থাকে, আর কিছু মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু মানুষ না যুবরাজ। অনেকের বিলুপ্তির পরিণামে খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ দাঁড়িয়ে থাকে।'

'তোমার কথা সত্যি। কিন্তু এটার বিকল্প কী বল তো আরণ্য!'

দুদিন পর আবার দেখা হয় সাং চুয়ার দলটার সঙ্গে। দেখে বোঝা যায় যে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। লক্ষণের পাঠানো বৈদ্য তাহলে সুচিকিৎসাই করেছে। আরণ্য বলে, 'এখন মনে হচ্ছে আমাদের গন্তব্যটা একই দিকে।'

'হয়তো একই দিকে, কিন্তু এক নাও হতে পারে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'যে রাজামশায় আমাকে মোহর ছাপ দিয়েছেন, তিনি কী ফিরে গেছেন?'

'না যাননি, তবে তিনি রাজামশায় নন।'

'কে তাহলে?'

'তিনি যুবরাজ।'

'তার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে কী?'

'জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

নৌকার ভেতর তখন বিশ্রাম নিচ্ছিল লক্ষণ। আরণ্যকে দেখে কাছে ডেকে আনে।

'ওই সাং চুয়ার সঙ্গে আবার দেখা হলো যুবরাজ। আপনার সঙ্গে আরেকবার দেখা করতে চায়।'

'কেন বল তো?'

'তা জানিনে। তবে ও বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

'তাহলে আমাদের বৈদ্যদের হাত বেশ পাকা, কী বল?'

'নিশ্চয় যুবরাজ।'

'ঠিক আছে। সন্ধ্যার পর জলসার সময় আসতে বল ওকে।'

'বলব যুবরাজ।'

পদ্মাবতীর একটা শাখা বল্লালপুরীর ভাটিতে এসে চন্দ্রদ্বীপকে পুবে রেখে দক্ষিণে নেমে গেছে। নদীর ঐ অংশটায় বিস্তার বোঝা যায় না। এখানে কোনটা যে মূল স্রোত তা বোঝার উপায় নেই। শতশত বালুচর নদীর বুক জুড়ে। চারদিকে ধু ধু বালি ও ছোট ছেট জলাশয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করে রেখেছে। পুব ও পশ্চিম দিগন্তে নীল আকাশের নিচে সবুজ একফালি গাছপালার চিহ্ন বুঝিয়ে দেয় যে ঐ দিক দুটোয় রয়েছে স্থল। উত্তরে ও দক্ষিণে শুধু জল আর জল, মাঝে মাঝে বালুচর। বিধাতার স্বর্গোদ্যানের কোনো অংশ হয়তো হবে এটা। স্থলচর কোনো প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় না এখানে। চরের উপর কোথাও কোথাও অলসভাবে রোদ পোহায় ঘড়িয়ালের দল। গাঙচিল, রঙবেরঙের বক, কাঁদাখোঁচা, হট্টিটি প্রভৃতি পাখির ঝাঁক, পানিতে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য প্রজাতির হাঁস, স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলে মাছের ঝাঁকও স্পষ্ট দেখা যায়। শান্ত জলের উপর হঠাৎ একঝাঁক ছোট মাছ লাফিয়ে জলের উপরিতলে

আলোড়ন তুলে আবার মিলিয়ে যায়। নদীতীরের কাছাকাছি উঁচু ডাঙ্গায় কোথাও গজিয়েছে সবুজ দূর্বাঘাস। সামান্য জল সাঁতরে গরুমহিষের দল এসে চড়ে বেড়ায় ওখানে। এ তো খাঁটি সোনার এক দেশ। এখানে মানুষ দরিদ্র থাকে কেন? কোনোভাবে এটা বুঝতে পারে না লক্ষণ সেন!

বিকেলের দিকে সোনালি সূর্যের আলোয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা দেয় বিস্তীর্ণ বালুচরে। চিকচিকে বালুচর ও মাঝেমাঝে সোনালি জলের বিস্তার এক স্বর্গীয় আবহ এনে দিয়েছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে যায়, সূর্য ডোবা পর্যন্ত প্রকৃতির এই আশ্চর্য সৌন্দর্যের ভেতর ডুবে থাকে লক্ষণ। সন্ধ্যার পর বজরায় জ্বলে ওঠে রঙিন আলোর মালা। সেই সঙ্গে নটিনীদের নূপুরের ছন্দে ঝংকৃত হয়ে ওঠে চারদিক।

সাং চুয়া ও তার দোভাষীকে নিয়ে লক্ষণের নৌকায় আসে ভৃত্য। প্রাচ্যদেশীয় রীতিতে প্রণাম জানিয়ে জলসার একধারে আসন পাতে সাং চুয়া। গানবাজনার ফাঁকে ফাঁকে ওর কথা শোনে লক্ষণ।

'পৃথিবীর উত্তাল সমুদ্রগুলোর উপর ভেসে থাকা স্থলগুলোয় ঘুরে বেড়াই আমি। হেঁটে চলি গ্রামেগঞ্জে, নগরেপ্রান্তরে, খুঁজে বেড়াই মহামুনি বুদ্ধের পুণ্যভূমি, যেখানে মানুষের নির্বাণ লাভের পথে কোনো অন্তরায় নেই।'

'ওই স্থলের সন্ধান কখনো পাবে না তুমি, সাং চুয়া। এখন বল, পানীয়ে কোনো আপত্তি আছে তোমার?'

'না, যুবরাজ।'

ভৃত্যেরা সোমরসের পেয়ালা সাজিয়ে দেয় ওর সামনে। কয়েক চুমুক নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নাচিয়েদের দ্রুতলয়ের নাচ দেখে মুগ্ধ চোখে। রুপোর থালায় করে বিশাল চিতল মাছের পেটি যখন ওর সামনে পরিবেশন করা হয় ও বুঝতে পারে না এটা কী। সুগন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার উপর। ওর অবস্থা দেখে ওকে সাবধান করে দেয় লক্ষণ।

'দেখো, ভেতরে কিন্তু শক্ত কাঁটা আছে।'

'ভাজা মাছের এমন সুগন্ধ আগে কখনো পাইনি যুবরাজ। ধ্যানি মানুষেরা কেন বেশিক্ষণ ধ্যানগ্রস্ত থাকতে পারে না এখানে তা বুঝতে পারছি এখন।'

'আরো কিছুদিন থাক এদেশে। বুঝতে পারবে আরো অনেক কিছু।'

'তাই মনে হচ্ছে এবার।'

'চীন দেশ থেকে আগেও অনেক পরিব্রাজক এসেছে এখানে, একটা বিষয়ে অবাক হয়েছি, ওরা কেউই এখানে থেকে যায়নি, সবাই ফিরে গেছে।'

'ভাগ্য ভালো আমাদের যুবরাজ, রাজপুরুষেরা আসেনি কখনো। পরিব্রাজকেরা ফিরে গেছে, কারণ দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়ানোই ওদের কাজ। ওরা হয়তো এদেশ থেকে চলে গেছে অন্য কোনো দেশে, তারপর আবার আর কোনো দেশে, কোনো দেশের মাটিই ওদের টেনে বাঁধতে পারেনি। আমিই তো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রায় দু-যুগ ধরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে দেখে তো এত বয়সী মনে হয় না।'

'চীনাদের বয়স বোঝা যায় কেবল বুড়ো হলে।'

'তুমি তাহলে বুড়ো হওনি এখনো।'

'না যুবরাজ।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'সেদিন আপনার পরিচয় জানা না থাকায় সাহস করে বলতে পারিনি যাচ্ছি কোথায়। আজ বলি, গন্তব্য আমার নালন্দা, জগতের পুণ্যবান ও জ্ঞানীগুণী মানুষের সবচেয়ে বড় সমাবেশ নাকি ওখানে। আমার পিতৃপুরুষেরা কংফুসি দেবের অনুসারী। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে বুদ্ধদেবের অনুসারী হয়েছি।'

'এটা এমন আর বিচিত্র কী। আমার পিতা মহাদেব শিবের পূজারী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতা অর্ধনারীশ্বর। তাঁর উপাসনালয়ে সদাশিব ও অর্ধনারীশ্বর, উভয়ের প্রতিমা আছে। আর আমি এখন বিষ্ণু উপাসক।'

'তা হয়তো ঠিক, এটা এমন আর কী। নালন্দা যাওয়ার আগে আমি পুণ্ড্রনগরে যাব। শুনেছি ওই নগরটা নাকি চীনদেশের অনেক নগর থেকেও বেশি সমৃদ্ধ। সব জ্ঞানীগুণী ও বীরযোদ্ধাদের বাস ওখানে। নগরের জাঁকজমক নাকি দূরদেশ রোমের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। ঐসব দেশের বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য ঐ নগরীতে সারা বছর যাতায়াত করে। খাদ্য, পানীয় ও নগরকন্যাদের সুখসেবা সারা পৃথিবীতে নাকি অতুলনীয়।'

একে তো লোকটা বুদ্ধের অনুসারী, তায় আবার পুণ্ড্রনগরের গুণকীর্তন করে চলেছে সেনরাজ্যে বসে। একটু নড়েচড়ে বসে লক্ষণ, বিষয়টা বুঝতে পেরে আরণ্য বলে, 'মহাশয় এখন সেনরাজ্যে বসে কথা বলছেন এবং সেনদের আশ্রয়ে আছেন, পালরাজ্যে এখনো পৌঁছেননি। বল্লালপুরীর নাম শুনেছেন কখনো?'

ওর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় লক্ষণ। বোঝার চেষ্টা করে, দূরদেশের মানুষের কানেও পৌঁছে গেছে পুণ্ড্রের ইতিহাস অথচ বল্লালপুরীর নামও শোনেনি! বাস্তবতাটা বোঝার চেষ্টা করে সে। একটা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বল্লালপুরীকে গড়ে তুলতে পেরেছে কী ওরা! বর্মনরা কীভাবে ছিল জানে না, ওদের হাত থেকে যখন বিক্রমপুর অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়েছিল তখন কী ছিল ওখানে! একটা রাজ্যের রাজধানী নামের যোগ্য কী ওটা! নেহায়েত একটা বড়সড় গ্রাম বৈ তো নয়। না আছে রাজার প্রাসাদ বা দুর্গ, না আছে অমাত্যদের সুরম্য কোনো ভবন, বাঁধানো রাস্তাঘাট, ধনাঢ্য শ্রেণির অট্টালিকার সারি, বড় কোনো মন্দির বা উপাসনালয়, এরকম কোনো কিছুই তো নেই। বিশাল এক দিঘি খনন করেছে পিতাজি, এটা কী কোনো রাজকীর্তি! ছোটখাটো কোনো সামন্তও এরকম অনেক দিঘি খনন করাতে পারে। পিতাজির অনুমতি নিয়ে এবারের শীতেই একটা বিষ্ণুমন্দির গড়ার কাজ শুরু করে দেবে সে।

৭

পিতামহ গৌড়েশ্বর, বিজয় সেনের শাসনামলে মিথিলা অভিযানে পাঠানো হয়েছিল বল্লাল সেনকে। মিথিলা বিজয়াভিযানে গুরুতর আহত হয়েছিলেন বল্লাল। চারদিকে রটে গিয়েছিল যে বল্লালের অন্তর্ধান হয়েছে। শিশু লক্ষণ সেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছিল তখন। লক্ষণ সংবৎ নামে নতুন একটা সন ঐ বছর চালু হয়ে যায়। যুবাবয়সে ওটা নিয়ে কৌতুক বোধ করে লক্ষণ। সেনদের রাজ্য গড়ে উঠার শুরু রাঢ় থেকে। এখন বঙ্গ, বরেন্দ্র, মিথিলা, বাগড়ি সহ পাঁচ ভাগে রাজ্যটাকে ভাগ করে বঙ্গ দেশের শাসনভার বল্লাল দিয়েছে যুবরাজ লক্ষণের হাতে। রুক্ষ প্রকৃতির দেশ মিথিলা হতে জল ও জঙ্গল ঘেরা কাদামাটির বঙ্গদেশ সর্বাংশে ভিন্ন। লক্ষণের মনে মনে ইচ্ছে ওই লং সনটা বরং বঙ্গদেশে লক্ষণের অভিষেকের বছর হতে চালু করা হোক। কিন্তু পিতার কাছে এমন প্রস্তাব রাখা সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে এই রাজ্যভার বোঝা হয়ে দেখা দেয় লক্ষণের কাছে। তখন মন চায় কাব্যদেবীর আরাধনা করতে। শারীরিকভাবে এখন কিছুটা ক্লান্ত সে। বল্লালপুরীর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া মানুষকে অলস করে দেয়ার জন্য খুব উপযোগী। এবারের শীতকালে আর কোনো অভিযানে না যাওয়ার জন্য মনস্থির করে। নৌবহর নিয়ে উজিয়ে যেতে যেতে লালরং জলের বানর নদীতে গিয়ে ওঠে। আরো উজিয়ে নিচু টিলা ও ঘন জঙ্গলময় এক বনে গিয়ে তাঁবু ফেলে ওরা। সঙ্গে রয়েছে বঙ্গের পঞ্চরত্ন: কবি উমাপতি, ধোয়ী, জয়দেব, শরণ ও গোবর্ধন।

জয়দেবের অসাধারণ রচনা গীতগোবিন্দ এক অলৌকিক জগতে নিয়ে যায় মানুষের অন্তর। কালিদাসের মেঘদূতের অনুসরণ করে পবনদূত রচনা করেছে ধোয়ী। এখানে ধোয়ী দেখিয়েছে দিগ্বিজয় করতে গিয়ে মলয় পর্বতে আরোহণ করে লক্ষণ। কুবলয়বতী এ রাজার রূপলাবণ্য ও পৌরুষে মুগ্ধ হয়ে পবনদূতকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথনির্দেশ দিয়ে সেখানে পাঠায় এক গন্ধর্বকন্যা। সুহ্ম রাজ্যের সুললিত বর্ণনা আছে পবনদূতে। গৌড়ের প্রশংসা করতে গিয়ে এই কাব্য রচনা করেছে সে। ওখানে মহাদেবের ঐ নগররাজ্যটা শ্বেত অট্টালিকায় ঘেরা ও শুভ্র কৈলাস পর্বতের মতো মনোরম রূপে চিত্রিত হয়েছে। গঙ্গানদীর তীরে বিরাজ করে দৃষ্টিনন্দন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, মহাদেবের অধিষ্ঠান থেকে সামান্য দূর দিয়ে বয়ে যায় পবিত্র গঙ্গা, প্রভৃতি। এই কাব্যগ্রন্থ ধোয়ীর এক শ্রেষ্ঠ রচনা।

চারদিকে নদীনালা, জল ও জঙ্গলঘেরা বল্লালপুরী ছেড়ে উত্তরের এই গড় এলাকা কিছুটা ভিন্নতা এনে দেয় লক্ষণের ভেতর। কিছু অসুবিধেও রয়েছে এখানে। ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা মালভূমিতে ভালুক ও বুনো শূকরের উপদ্রব রয়েছে। সন্ধ্যার পর তাঁবুর চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে পাহারা দিতে হয়। এক প্রজাতির বাঘ ও বুনো হাতির উৎপাত রয়েছে। প্রচুর বানর আছে এখানে। আশপাশে লোকালয় গড়ে না উঠায় খাদ্যশস্যের জোগান নেই। পানীয়জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। নারকেলকুঞ্জ নেই। খাবারদাবার, পানীয়জল সবই বাইরে থেকে আনতে হয়। ফলমূলের মধ্যে আনারস ও কলার প্রাচুর্য রয়েছে। কাঁঠালের মৌসুমে অঢেল কাঁঠাল পাওয়া যায়। বানর নদীতে মাছ নেই তেমন। জঙ্গলে বনমোরগ ও পাখি রয়েছে। ওদের ভেতর আমিষভোজীর সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। আরো উত্তরে কামরূপের সীমানায় হাতি ধরার খেদা আছে। ওখানে পৌঁছে লক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয় যে একটা হস্তীবাহিনী গড়ে তুলবে। পরের বছর গড় এলাকা পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ও এর শাখা নদীর আওতায় এসে আবার চোখ জুড়ানো সবুজ সমতল এক উপত্যকা পেয়ে যায়।

ঐ সবুজের রাজ্য পেরিয়ে আবার বিস্তীর্ণ জলের রাজ্যে এসে পড়ে লক্ষণের দল। চারদিকে শুধু পানি আর পানি! সেনাপতি আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কোন রাজার রাজ্য?'

'মনে হয় না এটা কোনো রাজার রাজ্য যুবরাজ।'

'কোনো না কোনো রাজার অধীন রাজ্যের বাইরে একখণ্ড স্বাধীন ভূমি কী এই পৃথিবীতে কোথাও আছে আরণ্য?'

'তা হয়তো নেই যুবরাজ। কিন্তু এটা দীর্ঘদিন কারো অধীনে থাকে না। এই যেমন এখন আপনি এখানে, ধরে নেই এটা আপনার অধীন। আগামী বছর যদি উত্তর থেকে কামরূপের রাজা নেমে আসেন জলকেলির উদ্দেশ্যে তাহলে তখন আবার তার অধীন। অথবা মেঘনার পুবের বা উত্তরের কোনো ছোটখাটো রাজা যদি বেড়াতে আসেন, তাহলে তার। মানুষেরা এটাকে ভাটির দেশ বলে।'

'আমরা তো উজানে এলাম হে!'

'আমাদের হয়তো উজান। কিন্তু কামরূপরাজ্যের দিক থেকে দেখুন, ভাটিতে।'

'কামরূপ রাজ্যের সীমা কোন পর্যন্ত?'

'যে পযন্ত ঐ রাজার হাত এসে পৌঁছোয়।'

'মাঝে মাঝে বড় হেঁয়ালি কর তুমি, আরণ্য!'

'এখানের প্রকৃতিও হেঁয়ালিতে পূর্ণ যুবরাজ। বাঁদিক দিয়ে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র ও পুবদিক থেকে আসা সুরমা নদীর উপরের দিকে বিশাল এক প্রাকৃতিক হ্রদ তৈরি হয়েছে। বর্ষা মৌসুম শুরু হলে উত্তরের পাহাড় থেকে সমুদ্রের মতো গর্জন করে পানি নেমে আসে এই ভাটির দেশে। পুরো বর্ষাকাল জুড়ে জল জমে থাকে এখানে। শীতের শুরুতে জল কমতে থাকে। এখানের মানুষেরা চাষবাস শুরু করে তখন। মাছ ধরে, পরিযায়ী পাখি শিকার করে, জীবনের অন্যসব প্রয়োজনীয় কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।'

'তাহলে তো আগামী শীত ঋতুটা এখানে কাটাতে হয়।'

'নৌচলাচলের জন্য সময়টা তখন সুবিধার না, যুবরাজ।'

'সুবিধা একটা বের কর।'

'শরতের শুরুতে যাত্রা করে হেমন্তের শেষে ফিরে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করা যেতে পারে।'

'ওরকম একটা ব্যবস্থাই কর আরণ্য। লক্ষ্য রেখ, কামরূপরাজ্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি যেন না লাগে আবার।'

'না, সেভাবেই আয়োজন করব যুবরাজ।'

কামরূপরাজ্য থেকে পাহাড়ি পথ ধরে প্রথমে পশ্চিমে নেমে এসেছে ব্রহ্মপুত্র। তারপর দক্ষিণে এসে সমতল গ্রাস করে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা আবার পুবে বয়ে গেছে। তারপর দক্ষিণে নেমে মিশেছে মেঘনাদের সঙ্গে। আরো অনেক দক্ষিণে থেকে পুবের পাহাড়সারি বেয়ে একই রকমভাবে প্রথমে পুবে নেমে এসে মেঘনাদ দুভাগ হয়ে দক্ষিণে নেমে আবার মিশেছে একসঙ্গে। তারপর আরো দক্ষিণে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশে প্রবল স্রোতস্বিনী কীর্তিনাশা নাম নিয়েছে। এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল থেকে পরের বছর উত্তর দিকে এগিয়ে চলে লক্ষণের নৌসেনাদল। প্রথমে কিছুটা পশ্চিমে গিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী ধরে সোজা উত্তরে এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পৌঁছে। ব্রহ্মপুত্র যেখানে পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে চলেছে সেখানে এসে নদী অতিক্রম করে লক্ষণ ও তার সেনাদল। নৌবহরের সঙ্গে নদীর উভয় তীর ধরে এগিয়ে চলেছে পাইক ও তীরন্দাজ দল। এটা কোনো যুদ্ধাভিযান নয়। এখানের সামন্তপতিদের বশে রাখার জন্য একটা মহড়া ও কৌশল। পালরাজ্যকে যেমন এসব ছোট বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্তরা ঘুণপোকার মতো খেয়ে দুর্বল করে দিয়েছে, সেনদেরও তাই করতে চলেছে। এই ঘুণপোকারা যদি পালরাজাদের দুর্বল না করে তুলত তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন বাঙালির শাসনতলে এসে যেত নিশ্চয়। ওই যোগ্যতা ও মেধা গৌড়ীয়দের ছিল। কিন্তু এরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে লক্ষণ সেন। যে বছর কোনো যুদ্ধাভিযান থাকে না ঐ বছর কোনো না কোনো অঞ্চলে সেনদের সামরিক শক্তিমত্তা প্রদর্শনে বেরোয় লক্ষণ সেন। ওদের হস্তীবাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। যেসব এলাকা দিয়ে হাতি চলাচল করতে পারে সেসব দিক দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে এগিয়ে যায় লক্ষণ সেন।

ব্রহ্মপুত্রের ছোট এক শাখানদী পেরিয়ে এক দিগন্তবিস্তৃত সবুজ সমতলে নেমে আসে লক্ষণের সেনাদল। চারদিকে সবুজ শস্যক্ষেত, বনজঙ্গল ও খানাখন্দে ভরা। এখানে মানুষজন বাস করে বলেও মনে হয় না। দূরে দূরে লোকালয়। রাস্তাঘাট নেই যে বড় একটা সেনাদল এগিয়ে যেতে পারে। এমন এক জায়গায় যে-কোনো বাহিনী বছরের পর বছর অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। পথে যেতে যেতে কিছু মানুষজন চোখে পড়ে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে ওদের। লোকগুলো বেঁটে-খাটো, নাকের গড়ন কিছুটা চ্যাপ্টা। গায়ের রং লক্ষণদের মতো কালো নয়, অনেকটা বাদামী। পুরুষদের অনেকের হাতে তীরধনুক, খাটো কাপড় পরনে মেয়েরা, কারো কারো বুকে বাঁধা একখণ্ড কাপড়, অনেকে অনাবৃত।

'এরাই কী ভোটচিনা, আরণ্য?'

'আজ্ঞে যুবরাজ।'

'এরা কী কামরূপ রাজ্যের অধীন?'

'বলেছি না যুবরাজ, যখন যার।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। এখন তাহলে আমাদের প্রজা। ভালো। এখানের খাজনা ওঠায় কারা?'

'ছোট বা বড় কোনো সামন্ত নেই এখানে। মানুষগুলো অনেকটা আদিম স্তরের। মাছ ধরে, পাখি শিকার করে পুড়িয়ে খায়। সামান্য শস্য ফলায়, ফলমূল খেয়ে জীবন কাটায়। ওদের কোনো উদ্বৃত্ত নেই যে খাজনা দেবে। ঐ অর্থে কোনো সামন্ত পরিবারও গড়ে উঠেনি ওদের ভেতর।'

'ওদের সমাজটা চলে কীভাবে?'

'আদি কৌমসমাজের মতো একটা ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।'

'সমতাভিত্তিক?'

'হ্যাঁ, তাই। তাছাড়া ওদের চাহিদাও খুব কম।'

'ওটাই মূলকথা।'

পথে এগিয়ে যেতে যেতে কিছুটা নিচু অঞ্চল এসে যায়। ব্রহ্মপুত্রের কোনো একটা শাখা নদী সামনে পড়ে। নদীটার গভীরতা নেই, হেঁটে পেরিয়ে যায় মানুষজন কিন্তু ওটার বিস্তার অনেক। সামনে এবং ডানে ও বাঁয়ে অসংখ্য বালুচর ধুধু করে। এখানটা এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় লক্ষণের সেনাদল। পশ্চিম দিকে সরে যায় কিছুটা। এক সকালে দূরের এক বালুচরে দেখে দুদল মানুষের হৈহুল্লোড়। লক্ষণের সেনাদল গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসে। চরের কাছাকাছি দুগ্রামের মানুষ মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়েছে। দুগ্রামের মানুষই ঐ চরের দখল দাবি করছে। মারামারি করে এখন যারা দখল করতে পারে তাদেরই হবে এই চর। দূর থেকে দেখতে পায় প্রায় সবার হাতে লাঠি, বল্লম, রাম দা। দলের পেছনে গলাবাজি করার জন্য মেয়েরা রয়েছে। দুদলই রণহুঙ্কার দিয়ে চলেছে। যে-কোনো সময় বল্লম ছোড়াছুড়ি শুরু হতে পারে। দ্রুত একদল সৈন্য ওদের মাঝে পাঠিয়ে দেয় লক্ষণ। মারামারি না করে এই চরটাকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্য দুটো চর যেন দুদলে দখল করে নেয়। রাজার পাইকপেয়াদা দেখে ভয় পেয়ে চর ছেড়ে চলে যায় সবাই।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'নদীর বুকজুড়ে এত চর থাকতে ওটা নিয়েই কেন মারামারি করতে যায় ওরা?'

'দুদলেরই ঘরের কাছে বলে অধিকারটা ফলাতে চায়, খুব সোজা হিসেব।'

'ঠিক, রাজরাজরাদের বেলায়ও কথাটা একই রকম সত্যি। এটা মাথায় আসেনি কেন আমার?'

'ঘরের কোনাটাকে নিরাপদ রাখতেই ব্যস্ত আমরা। এটা ভারতবর্ষের মানুষের একটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। যুবরাজ কী ভেবে দেখেছেন যে ইয়োরোপীয়রা যখন জীবনবাজি রেখে সংক্ষুব্ধ সমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্ত খুঁজে বের করার চেষ্টায় আছে তখন আমাদের ধর্মজীবী তান্ত্রিকেরা সমুদ্র অতিক্রম আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। মধ্য এশিয়ার ঘোড়সওয়ারীরা যখন পুবে পশ্চিমে প্রায় পুরো পৃথিবী করায়ত্তে নিয়ে নিচ্ছে তখন আমরা ঘরের কোনায় বালুচর নিয়ে লড়াই করে প্রাণ দিচ্ছি! দূরপ্রাচ্যের তুর্কিরা যখন ভারতবর্ষ গ্রাস করে নিচ্ছে তখনও আমরা নিজেরা মারামারি করে ওদের জন্য পথ তৈরি করে দিচ্ছি।'

'বিষয়টা সত্যিই ভাবনার আরণ্য। এ নিয়ে একদিন বসতে হবে তোমার সঙ্গে।'

হাতির পিঠে চড়ে দুহপ্তার পথ পেরিয়ে যেখানে এসে তাঁবু ফেলে লক্ষণরাজ তা দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে যায়। উত্তরদিকে গাঢ় সবুজ পাহাড়ের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়। ওগুলোর অমসৃণ চূড়া উঁচু হতে হতে আকাশ ছুঁয়েছে। পাহাড়ের শরীর ছুঁয়ে সাদা মেঘেরা উঠে যায় আরো উঁচুতে। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে দূরে দেখা যায় পাহাড়সারির গাঢ় নীল চূড়া উপরের হালকা নীল আকাশ ছুঁয়েছে। স্বর্গীয় এক দৃশ্য। আসার পথে দু-একটা ভোটচিনা গোত্রের দেখা পেয়েছিল ওরা। ওদের সংখ্যা আরো বেশি এখানে। খোঁজ নিয়ে লক্ষণ জানতে পারে যে চীনদেশের তিব্বত সীমান্ত থেকে ওরা এদেশে এসেছে। কামরূপরাজার অধীনে একরকম স্বাধীন গোত্র হিসেবে, নিচু পাহাড়ে, নয়তো পাহাড়ের পাদদেশের উঁচু ভূমিতে বাস করে ওরা। স্থানীয় অধিবাসীরা গাড়ো নামে ডাকে ওদের। এরা নাকি খুব নিরীহ প্রকৃতির। এদের কোনো কোনো গোত্র হরিণ ও শূকর শিকারে দক্ষ। জঙ্গল থেকে হরিণ ও প্রচুর পাখি শিকার করে লক্ষণের বিশাল সেনাদলের জন্য উপহার পাঠায় গোত্রপতিরা। প্রচুর ফলমূল, আনারস, কলা ও শাকসবজি পাঠায়। লক্ষণের সেনাদল থেকে ওদের জন্যও বস্ত্র ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী পাঠানো হয়। ওসব পেয়ে ওরা খুশিতে নাচগানের আয়োজন করে ওদের সৌজন্যে। মহুয়া থেকে একধরনের নেশাজাতীয় পানীয় বানায় ওরা। খুশি মনে লক্ষণের সেনাদল সেসব গ্রহণ করে। একটা হপ্তা বেশ আনন্দে কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরে আসে লক্ষণের সেনাবাহিনী।

পরের হপ্তায় দেখা দেয় অনাহুত এক বিপর্যয়। কামরূপরাজ্য থেকে বেশ বড় এক সেনাদল এসে মুখোমুখি হয় সেনদের। কোনো সমরাভিযানে বেরোয়নি লক্ষণেরা। যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি নেই ওদের। কোনো সম্ভাবনাও মাথায় আসেনি। দিনের পর দিন নির্বিঘ্নে সামনে এগিয়ে গেছে। অগ্রবর্তী দল থেকেও কোনো সতর্ক বার্তা আসেনি। লক্ষণ ভেবে পায় না যে ঘরে ফেরার পথে এখন কেন এই সঙ্কট? আলোচনা করার জন্য ওদের দূতকে শিবিরে ডেকে পাঠায় লক্ষণ। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে লক্ষণ যে কামরূপের রাজা মনে করেছে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীর অতিক্রম করে পালসেনারা এসেছে ওদের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য। দক্ষিণ থেকে সেনেরা কোনো ঘোষণা না দিয়ে এত উত্তরে উঠে আসবে তা ভাবতে পারেনি কামরূপের রাজা। রাজার সঙ্গে কথা না বলে এখন কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না কামরূপের দূত। অগত্যা আরো একহপ্তা পাশাপাশি শিবিরে অবস্থান করে লক্ষণের সেনাদল ও কামরূপবাহিনী।

হপ্তাশেষে যখন রাজদূত ফিরে আসে তখন কামরূপরাজার নরমগরম বাণী শোনায় সে। কামরূপরাজা আশা করে না যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলো বিনা উস্কানিতে একে অপরের সীমান্ত অতিক্রম করে। সেনরা যেহেতু ফিরে যাচ্ছে তাই কামরূপরাজার কোনো আপত্তি নেই এখন। সবশেষে শোনায়, এভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন ভবিষ্যতে আর না করার পরামর্শ দেয়া গেল।

কামরূপের রাজার সঙ্গে কোনোরূপ সংঘর্ষে যাওয়ার সামান্য ইচ্ছাও এখন নেই লক্ষণের। পিতার নির্দেশ রয়েছে আগামী শীত মৌসুমের শুরুতে গৌড় অভিযানে বেরোতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সৈন্যদের চাঙ্গা করার জন্য এই মহড়ায় বেরিয়েছে লক্ষণ। তাই খোঁচাটা হজম করে নেয়। কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে ওই রাজদূতকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের মহারাজের সীমানাটা কোনখান থেকে শুরু, মাননীয় রাজদূত?'

কামরূপের রাজার দূতও দারুণ চৌকস। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'যেখানে মহামান্যের রাজ্যের সীমানা শেষ।'

'আমাদের রাজ্যের সীমানার তো শেষ নেই মহাশয়।'

'তাহলে আমাদের সীমানারও যে শুরু নেই মহামান্য।'

লক্ষণ বুঝতে পারে যে এর সঙ্গে কথায় কুলিয়ে উঠা কঠিন হবে। তাই রাজসিক কৌতুকে হেসে উঠে পরিবেশটা হালকা করে দেয়। আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় ওকে। সে তা গ্রহণ করলে প্রচুর উপহারসামগ্রী দিয়ে ওকে খুশি করে। কামরূপরাজার জন্য সোনাদানা ও হীরেজহরতের বড় একটা চালান পাঠানো হয় সেনদের একটা চৌকস দলের সঙ্গে। এভাবে সঙ্কটটা থেকে পরিত্রাণ পায় সেন সেনারা।

বল্লালপুরীতে ফিরে এসে একটা দীর্ঘ বিশ্রাম নেয় লক্ষণ। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে আর নরম মাটির হলেও জন্মের পর থেকে এখানের আবহাওয়ায় লালিত সে। প্রাকৃতিকভাবে এটার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। এখানের আকাশ ও বাতাস যতটা নিজের ও নিরাপদ মনে হয় অন্য কোথাও তেমনটা ভাবতে পারে না।

প্রাসাদে বসে বিভিন্ন রাজ্যের সব খবরাখবর সংগ্রহ করে লক্ষণ। পশ্চিমদিক থেকে দুর্ধর্ষ এক জাতির লোকজন শত সহস্র দলে এসে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকটা দখল করে নিচ্ছে। এরা নাকি একেশ্বরবাদী। এদের ধর্মের নাম শান্তি। অথচ এদের আক্রমণে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ বিনাদোষে প্রাণ হারাচ্ছে। যুদ্ধের কোনো রীতিনীতি নেই ওদের। অতর্কিতে ও অপ্রথাসিদ্ধ পথে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে লুটপাট করাই ওদের একমাত্র কাজ। এরা নাকি আফগান-তুর্কি। সবাই শ্মশ্রুধারী আর প্রচণ্ড নারীলোভী। এসব দস্যুর দল মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে নিজেদের দেশ রক্ষা করতে না পেরে ভারতবর্ষের রাজাদের নিজেদের ভেতর খেয়োখেয়ির কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সবকিছু দখল করে নিচ্ছে। শুধু যে দেশ দখল করে নিচ্ছে, তাই না, ওদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে যারা বেঁচে যায় তাদের ধর্মান্তরিত করে নিজেদের ভৃত্য ও সেনাদলে নিয়ে নিচ্ছে। দরিদ্র ও মুমূর্ষু জনগণের হাতে বিকল্প না থাকায় ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মান্তর মেনে নিয়ে জীবন ও জীবিকা রক্ষা করছে। এদের অনেকে আবার হিন্দু উগ্রবাদীদের হাতে পূর্বে অত্যাচারিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছে। অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের বাসভূমিতে ধর্মান্তরিত হয়ে টিকে থাকার সুযোগও নিচ্ছে অনেকে।

মাথার ভেতর এক ধরনের দুশ্চিন্তা জেঁকে বসায় আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ সেন, 'কোন দেশের লোক ওরা? জাতি কী?'

'ওদের কোনো জাত নেই। নির্দিষ্ট কোনো দেশও নেই। দস্যুর দল। বেশিরভাগই তুর্কি। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের অনেক উপজাতির সঙ্গে মিশে গেছে ওরা। ওই সব উপজাতির কোনো বিশেষ পরিচিতি না থাকায় ধর্মান্তরিত হয়ে ওদের সঙ্গে মিলেমিশে লুটপাটে অংশ নিচ্ছে।'

'শুনেছি মহাভারতেও নাকি একেশ্বরবাদী এক অবতারের কথা আছে যিনি ভারতবর্ষে অভিযান পাঠাবেন পশ্চিম থেকে।'

'পৌরাণিক গ্রন্থগুলোয় তো কত কথাই আছে, মহারাজ।'

'ওসবে আস্থা নেই তোমার?'

'আমার আস্থা থাকা বা না থাকায় ওসব গ্রন্থের কিংবা ওসবে বিশ্বাসীদের কিছুই আসে যায় না।' একটু থামে আরণ্য। কিছুটা ইতস্তত করে আবার বলে, 'আপনার পিতা, মহারাজাধিরাজ মহাশয় যেভাবে তন্ত্রমন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়েছেন, আমার বরং ভয় হচ্ছে যে এই তান্ত্রিকেরাই দেশটাকে ডোবাবে একদিন।'

'কী বল আরণ্য! তুমি কী জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস কর না? তন্ত্রে বিশ্বাস কর না! পিতাজি যত যুদ্ধাভিযান করেছেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্ভুল গণনা রয়েছে সেখানে। এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি তিনি। এসবই তো শাস্ত্রমতো হয়েছে।'

'মার্জনা করবেন মহারাজ। অভয় দেন তো বলি, এসবই হয়েছে মহারাজাধিরাজের বাহুবলে, শক্তিমত্তায়। জ্যোতিষের গণনার ফলে নয়।'

'অবাক করছ আরণ্য। শাস্ত্রে অবিশ্বাস কবে থেকে তোমার!'

'শাস্ত্রে কখনোই বিশ্বাস ছিল না আমার, মহারাজ। তন্ত্রমন্ত্র মানুষের যৌক্তিকতা লুপ্ত করে দেয়।'

'তুমি তো হিন্দুজাতির বিশ্বাসের উপর আঘাত হানছ, আরণ্য!'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, কারো বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করছি না আমি। শুধু আমার ব্যক্তিগত অবিশ্বাস প্রকাশ করছি। তাও আপনার মতো উদারচিত্ত ও একজন সাহসী মানুষের কাছে, যাঁকে বিশ্বাস করা যায়। আমার এই অবিশ্বাসের

কথা আজই প্রথম ও শেষবার উচ্চারণ করলাম। আপনার দেয়া যে-কোনো শাস্তি গ্রহণ করব আমি।'

'না আরণ্য। কোনো শাস্তি তোমাকে দেব না আমি। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, একথা আর কাউকে শুনিয়ো না। তাহলে ঐ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অধপতিত বলে তোমার নরকবাসের ব্যবস্থা করবে।'

'না মহারাজ, আর কারো কাছে এমন সাহস করব না। কিন্তু সত্যিই চিন্তিত আমি, কোনো জাতি যখন প্রকৃতাবস্থা থেকে সরে গিয়ে অপ্রকৃত ও অলৌকিক সব বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তার পতন অনিবার্য। আর এসব তন্ত্রমন্ত্র, জাদুটোনা কোনো ধর্মের মোড়কে আসুক বা না আসুক, মানুষের অন্তর্শক্তিকে ধ্বংস করে দেবেই। মানুষের ভেতর প্রকৃত শক্তি ও আস্থার জায়গাটা পুরোপুরি বিনাশ করে দেয় এটা। নিজের শক্তির বাইরে অপার্থিব শক্তির উপর বিশ্বাস করে নিজেকে অবমূল্যায়িত করে। মানুষের এই অপবিশ্বাস পুঁজি করে গোত্রনেতারা ওদের সংঘবদ্ধ করে ওদের ধ্বংসের মাধ্যমে নিজেদের জয় ছিনিয়ে নেয়। ভ্রান্ত-বিশ্বাসীরা অকাতরে প্রাণ দিয়ে ভণ্ডদের জয়ী করে। এটা ভয়ানক মহারাজ। যে-কোনো জাতির জন্য এটা ভয়ানক। মানুষের নৈতিকশক্তি ও মনুষ্যত্বের জন্য চূড়ান্ত অকল্যাণকর। সাধারণ মানুষকে শৃঙ্খলায় রাখা অথবা অন্যসব লালসা থেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এটার আপাত কোনো সদর্থক দিক হয়তো দেখানো যেতে পারে।'

'সজ্ঞানে বলছ এসব, আরণ্য?' অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'ধর্মযুদ্ধগুলো কী ন্যায়ের পক্ষে লড়াই নয়!'

কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে জবাব দেয় আরণ্য, 'পৃথিবীতে কোনো ধর্মযুদ্ধ নেই মহারাজ। পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, মহাভারতের ঐসব কাহিনি মানুষের কী কল্যাণে এসেছে? ঐসব ধর্মযুদ্ধে শতশত প্রাণসংহার ঘটেছে। তা থেকে মানবজাতির প্রাপ্তি কী ঘটেছে মহারাজ!'

'আরণ্য, তুমি কবি। যে কোনো বিচারের ঊর্ধ্বে তুমি। এসব আলোচনা আপাতত থাক। হালকা কোনো কিছুর ব্যবস্থা কর।' চিন্তিতভাবে বলে লক্ষণ।

'কবিসভা ডাকি, মহারাজ?'

'তাই ডাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

মাথার ভেতর থেকে রাজ্যশাসনের এই জটিল যন্ত্রণা কিছুদিনের জন্য হলেও কীভাবে দূর করা যায় ভেবে পায় না লক্ষণ। এই দুর্বল সময়টার সুযোগ নেয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগোষ্ঠী। বাল্যসখা বরুণ এসে জিজ্ঞেস করে, 'মহারাজ কী কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত?'

'হ্যাঁ, বরুণ।' চোখ না তুলে জবাব দেয় লক্ষণ।

'কোনো সহায়তায় আসতে পারি মহারাজ?'

'কী রকম?' ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ।

'একটু বিস্তারিত বলি। মানুষের মন যখন জাগতিক ক্রিয়াকর্ম, সমস্যা বা উৎকণ্ঠায় জর্জরিত হয়ে ওঠে তখন তাকে শীতল করতে হয়। প্রচলিত কোনো পদ্ধতিতে সেসব প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। আরো জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে মানুষ। এসব থেকে উত্তরণের জন্য দেবতাদের নির্দেশিত পথ হলো তন্ত্রসাধনা।'

'তন্ত্রসাধনা?'

'আজ্ঞে, প্রভু।'

'এই তন্ত্রসাধনার নির্দেশ কী কোনো দেবতা দিয়েছিল, না তোমরাই আবিষ্কার করেছ, বরুণ?'

একটু ধাক্কা খায় বরুণ। তাৎক্ষণিকভাবে ভেবে পায় না কী বলবে সে। এই ফাঁকে লক্ষণের মনে পড়ে তন্ত্রসাধনার এক রাত্রির কথা। বিষয়টা জানার জন্য যৌবনের শুরুর দিকে একরাত্রির জন্য এক ভণ্ড তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হয়েছিল লক্ষণ। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল সে ওকে। রাতের প্রথম প্রহর থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে নিজেকে শিবরূপে কল্পনা করে সারাক্ষণ থাকতে হয়েছিল উচ্ছ্রিত অবস্থায়। নগ্নিকাদের সঙ্গে সাধনকাজে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল প্রায় সারাক্ষণ! এই যদি হয় তন্ত্রসাধনা, লক্ষণের আর প্রয়োজন নেই ওটার।

পরিমিত ও সুখী যৌনজীবনে তৃপ্ত সে। অযাচারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা ওতে সুখ পেতে চাইলে ওরাই থাকুক ওখানে। লক্ষণ বলে, 'তোমাদের তন্ত্রসাধনা বিষয়ে কিছুটা জানি বরুণ। ওটায় আপাতত কোনো আকর্ষণ নেই আমার।'

'তা নিশ্চয় জেনে থাকবেন মহারাজ। কুলগতভাবে মহারাজরা ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়, এই রাজযোটক ভূভারতে দ্বিতীয়টা আর নেই।'

'প্রশংসাবাক্যের জন্য মন এখন আকুল নয় আমার, বরুণ।'

'মহারাজ, তন্ত্রের জগতটা বড় জটিল। ওখানে যে সবকিছু শরীরের, তা নয়। যদিও নরনারীর শারীরিক মিলনই হচ্ছে তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তি।'

'ওটাই যদি মূল হয়, শাখাপ্রশাখা তো ওটাকে ভিত্তি করেই। পার্থক্য কী আর থাকবে?'

'আছে মহারাজ, বিভিন্নতা আছে, বৈচিত্র্য আছে।'

চোখেমুখে হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলে লক্ষণ বলে, 'ওগুলোর সবই বোধ হয় ওই কর্মটার বিভিন্ন পদ্ধতি আর আসনের।'

'একটু ব্যাখ্যা করি, মহারাজ?'

'কর বরুণ, কর।'

'তন্ত্রসাধনার যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তার মধ্যে মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, বর্ণ রেখাত্মক যন্ত্র এসব হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।'

'মুদ্রা আর আসনের পার্থক্যটা কী হে?'

'এজন্য তো তন্ত্রসাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। এই মুদ্রাগুলো ফুটিয়ে তুলে নারী, আর আসন পাতেও ওরাই। প্রভু যদি অনুমতি দিন তাহলে আগামী পরশু শুক্লা পঞ্চমী, একটা উপাসনার আয়োজন করি।'

'ওটার চিন্তা এখন থাক বরুণ। আসনগুলো তোমার রপ্ত হয়েছে তো ভালোভাবে?'

'মহারাজ, সাধনা ছাড়া এসব তন্ত্রের গূঢ় রহস্য বোঝা কঠিন। তাই কটাক্ষ করা খুব সহজ। দেহের ভেতরের সুপ্তকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করা হচ্ছে উপাসকের উদ্দেশ্য।'

'ঠিক আছে বরুণ, বুঝতে পারছি তোমার সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি এখন পুরোপুরি জাগ্রত। কিন্তু বরুণ, আমার এখন প্রয়োজন বাহুশক্তি, পশ্চিম থেকে বিধর্মীরা ধেয়ে আসছে। ভারতবর্ষে এখন শক্তিশালী কোনো রাজা আর নেই যে ওদের রুখতে পারে। ছোট ছোট রাজা একে একে পরাজিত হচ্ছে, ও হতে চলেছে। এমনকি অনেক শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগুলোও মুছে যেতে বসেছে। দেবদেবীর মন্দির ভেঙেচুরে সব বিলীন করে দেয়া হচ্ছে। তোমাদের হয়তো এখন ঐ সুপ্তকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করা প্রয়োজন, আমার না বরুণ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মহারাজ, শিব ও শক্তির সামান্য এক উপাসক আমি। আমার সামান্য জ্ঞান ও চিন্তায় যা শ্রেয় মনে করি তাই ব্যাখ্যা করি। এর বাইরে আমার কোনো ক্ষমতা যে নেই!'

বাল্যসখা বরুণ। মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে যাক, এটা চায় না লক্ষণ। তাই বলে, 'ঠিক আছে বরুণ। তোমার শক্তি-উপাসনার দুটো বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট আমার কাছে। ন্যাস ও বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, ও দুটো কী?'

'ন্যাস হচ্ছে যোগসাধনার একটা অঙ্গ। মুদ্রা ও আসনের পর আসে এটা। একে অপরের নিকট প্রদত্ত অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রহণ ও বর্জন অর্থাৎ সঞ্চালন। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় উভয়ে উভয়ের প্রতি পূর্ণভাবে ন্যাস্ত হওয়া তন্ত্রসাধনার একটা মূল লক্ষ্য।'

'বুঝেছি বরুণ। যন্ত্রটা কী?'

'দেবতার প্রতীক রূপে বর্ণরেখা আঁকা।'

'আরেকটু বোঝাবে?'

'উদাহরণ দিয়ে বলি, মহারাজ। ইন্দ্রের স্ফীত উদরের জন্য ইন্দ্রানী একটা রমণভঙ্গি তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজের জন্য, যেটাকে ঐন্দ্রানিক রতিভঙ্গি বলি আমরা। এখন আপনার মনের সুপ্ত ইচ্ছা যদি ওরকম হয়, রেখাঙ্কনটা সেভাবে করতে পারেন।'

'থাক বরুণ, আমার উদর অতটা বড় না। তাছাড়া, রেখাঙ্কন না করেও আমার মনের ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারি আমি।'

'তন্ত্রসাধনার জন্য পঞ্চ-মকারের ব্যবহার করতে হয় মহারাজ। মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন।'

'আপাতত প্রথম তিনটা ব্যবহার কর এখন বরুণ। তাহলে অর্ধেকের বেশি জয়ী হয়ে গেলে।'

'মহারাজের অন্তর জয়ের অভীপ্সা অধীনের উদ্দেশ্য নয়। তন্ত্রসাধনা শুধু তান্ত্রিকের জন্য। অন্যের জন্য না, নিজের জন্য। ভেবে দেখুন, এই পাঁচটার কোনোটাই কী অন্যের জন্য করে দেয়া সম্ভব?'

'তা বলতে চাইও নি বরুণ।'

'শুধু যে শরীরের শক্তি জাগ্রত করা তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য, তা না। অন্য উদ্দেশ্য সাধনও এটার দ্বারা সম্ভব।'

'যেমন?'

'মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষঠকর্ম...'

'বশীকরণ?

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'পশ্চিমা ওই দুর্বৃত্তদের বশীকরণের কোনো তন্ত্র জানা আছে তোমার?'

'একক বা নির্দিষ্ট কোনোকিছুর জন্য এসব তন্ত্রের সৃষ্টি হয়নি মহারাজ। প্রকৃত সাধকের পক্ষে যে-কোনো কিছু বা যে-কাউকে বশীকরণ সম্ভব।'

'তুমি কী প্রকৃত সাধক বরুণ?'

'এভাবে কেউ বলতে পারে না মহারাজ। একজন সাধক শুধু সাধনা করে যেতে পারে। সে কেবল উপাসক।'

'অস্ত্রটার ধ্বংসকারী ক্ষমতা আছে কিনা তা না বুঝে ওই অস্ত্রের ব্যবহার কীভাবে করা যায় বরুণ?'

'ধ্বংসকারী ক্ষমতা নির্ভর করে ওটার ব্যবহারকারীর উপর।'

'আমি তো ব্যবহারকারী বিষয়েই প্রশ্ন করেছিলাম তোমাকে। এড়িয়ে গেলে বরুণ।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ। নিজের উপর এতটা আস্থা হয়তো নেই আমার।'

'তাহলে এসব তন্ত্রসাধনা করছ কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বরুণ। মাথা চুলকে বলে, 'মহারাজ, একটা কুমারীতন্ত্রের আয়োজন করি? এটা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা না হলে বোঝা একটু কঠিন।'

'ভেবে দেখি বরুণ।'

বরুণকে বিদেয় করে ভাবনার অতলে ডুবে যায় লক্ষণ। পুরো ভারতবর্ষ যখন ডুবতে বসেছে তখন সমাজের এই সব উচ্ছিষ্ট তান্ত্রিক-উপাসকেরা মৈথুন, কুলপূজা আর বশীকরণমন্ত্র নিয়ে ডুবে রয়েছে। আর এই সুপ্রাচীন ও অনন্য ভারতীয় সমাজ এদেরই হাতে তুলে দিয়ে রেখেছে সমাজের চালিকাশক্তিটা! এদের ইচ্ছা, এদের পৌরহিত্যে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, জয়যাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, তর্পণাদি প্রভৃতি শুভ-অশুভ সকল আনুষ্ঠানিকতার নিয়ন্ত্রণ! পশ্চিমের সংঘশক্তিগুলো উন্নততর অস্ত্র ও সমরকৌশল নিয়ে একের পর এক গ্রাস করে চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ। আর এরা নারীর দেহমুদ্রা ও আসন নিয়ে ব্যস্ত! যে কৃষককুল শস্য ও ফলমূল উৎপাদন করে, যে মৎস্যজীবী আমিষের সরবরাহ বজায় রেখে চলেছে, যে শ্রমজীবী সম্প্রদায় সমাজের চাকাটা সচল রেখেছে, ওদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে এরা। পরজীবী এই গোষ্ঠীটার বিপক্ষে কিছু বলার অধিকার নেই লক্ষণের। ভেবে দেখে পিতা বল্লালের বিষয়টা। অপরাজেয় এই বীরযোদ্ধা এখন পুরোপুরি মেতে রয়েছে এসব তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে। ক্ষত্রিয়ের কাজ রাজ্য পরিচালনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। কাব্য করা, আর তন্ত্রমন্ত্রের বিলাসিতা কখনো ক্ষত্রিয়ের কাজ হতে পারে না। যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করা হয়, তাহলেও না। এসব উঞ্ছজীবী কুব্জপৃষ্ঠ তান্ত্রিকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল্লালের মতো অসম সাহসী এক বীর ক্ষত্রিয়কেও কীভাবে বশীভূত করে ফেলেছে বরুণের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা বুঝে নিয়েছে লক্ষণ।

সেনরাজ্যটা গড়ে উঠেছে শত বছরে, কয়েক পুরুষে। এখন এটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করাই সেনরাজাদের ধর্ম হওয়া উচিত। অন্য কিছু ভাবাও অন্যায়। বীরত্ব প্রদর্শনে সেনরাজারা যে সাহসিকতার নিদর্শন রেখেছে তাতে ভারতীয় কোনো রাজাকেই আর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না লক্ষণ। এখন একমাত্র প্রতিপক্ষ পশ্চিমের আগ্রাসী আফগান-তুর্কিরা। শত্রুকে চিনতে পারা সমরবিজ্ঞানের এক বিশেষ দিক। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এক দশমাংশ আরবযোদ্ধার সঙ্গে পরাজিত হয়েছিল পারস্যের মহাপরাক্রমশালী সাসারীয় সম্রাট। লক্ষণ জানে এই শত্রু কারা? কিন্তু এদের চরিত্র নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদের ধর্ম, ভাষা, আচার আচরণ, যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র, সবই অন্য রকম। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে লক্ষণ। এ সময়ে কিছুটা মানসিক শান্তি দিতে পারত আরণ্য। কিন্তু পারিবারিক একটা দুর্ঘটনায় সেও দূরে সরে গেছে। ওর চেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত সহচর লক্ষণের কেউ নেই আর।

প্রাসাদভবনের ভেতরে সব চেয়ে বড় ঘরটার মেঝেয় পাতা রয়েছে লাল ও সবুজ রেশমী সুতোয় বোনা অপূর্ব এক গালিচা। ঘরের একদিকে রয়েছে বিশাল পালঙ্ক, অন্যদিকে তাকিয়া। কিছুটা অন্যমনস্ক লক্ষণ ওখানে এসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে। সামরিক যে অভিযানের প্রস্তুতি চলছে মাথার ভেতর তার কোনো কুলকিনারা করতে পারছে না। উত্তেজনাপূর্ণ এই সময়ে মস্তিষ্ক শীতল রাখা প্রয়োজন। মগধের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে তুর্কিরা। কম করে হলেও ওখানে এখন পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী থাকা দরকার, সার্বক্ষণিকভাবে। কী যে এক কৌশল অবলম্বন করে এই তুর্কিরা! ওদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সৈন্যদেরও অবলীলায় পরাস্ত করে ফেলে। শত শত বিভাজনের ভেতরও এক ধরনের আঞ্চলিক ঐক্য ছিল কয়েকভাবে বিভক্ত ভারতবর্ষে। এখন সেটাও বিলুপ্ত হতে চলেছে। তুর্কিদের কাছে ছোট বড় রাজ্যগুলোই যে শুধু পরাজয় বরণ করে চলেছে তাই না, অনেকে এদের সহায়ক শক্তি হিসেবেও কাজ করছে অবশিষ্ট স্বাধীন রাজ্যগুলোকে উৎখাত করার জন্য। তুর্কিদের কৌশলও অভিনব। পরাজিতদের মধ্য থেকে উচ্চ পদে আমলা নিয়োগ দেয় ওরা। রাজ্যগুলোকে পরাস্ত করার পর আবার ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে নিজেদের শাসন সুসংহত করে। এই দুর্যোগের সময় ভারতবর্ষের কোনো রাজার পক্ষে এককভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সত্যি কঠিন। অথচ এই রাজাদের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। গৌড় সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে গঢ়ীদ্বারে নিয়মিত সৈন্য রাখার জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন। সামন্তরাজাদের উপর চাপ দিলে ওরা নিজেরাই এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসবে। বুঝতেও চাইবে না যে

ওরা ওটা ধরে রাখতে পারবে কিনা! আর এই জটিল সময়ে ওইসব তান্ত্রিক অন্নদাসেরা পিতাজি বল্লাল সেনের মাথাটা পুরোপুরি খেয়ে বসে আছে!

কপালের দুপাশের রগ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হলে আপাত ক্রোধের বশে হাততালি দিয়ে পরিচারিকা ডাকে লক্ষণ সেন। কিছুটা পানীয় এখন না হলেই নয়। আশ্চর্য, ধারেকাছে কেউ নেই! দ্বিতীয়বার হাততালি দেয়ার আগেই ভেতরে ঢোকে রাজমহিষী। লক্ষণের চোখ দুটো থেকে যেন রক্ত বেরিয়ে আসছে। প্রথমে আঁতকে উঠলেও চকিতে সামলে নেয় তন্দ্রাদেবী। রাজাদের ঘরনী হওয়া যে কী তা ভালোভাবে জানে সে। চোখে ময়ূরপুচ্ছের আলোড়ন তুলে বলে, 'মহারাজ, আজ এই দাসী আপনার সেবায় সন্ধ্যা থেকেই প্রস্তুত রয়েছে।'

'কী বিষয় তন্দ্রাদেবী?'

'তেমন কিছুই না মহারাজ।'

অপরূপ সাজে সেজেছে আজ তন্দ্রাদেবী। যৌবনের প্রথম দিনগুলোর মতো। আনত চোখে লজ্জার বিনম্র ছায়া। কাছে এগিয়ে এসে নিচু স্বরে বলে, 'যদি অপরাধ না নেন প্রভু, মনে করিয়ে দেব কী যে আজকের এই দিনটার জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকি।'

মুহূর্তের ভেতর সবকিছু উধাও হয়ে যায় লক্ষণের মস্তিষ্ক থেকে। হায় ভগবান, আজ ওদের বিবাহ তিথী! কীভাবে ভুলে গেল এটা! হায় রাজ্যশাসন, জগতসংসার! কী জীবন বরাদ্দ করেছ হে প্রভু! প্রিয়জনদের হাসি আনন্দ, দুঃখ বিষাদের সামান্য অংশীও হতে পারে না সে! উঠে দাঁড়িয়ে একান্ত অন্তরঙ্গতায় আলিঙ্গন করে তন্দ্রাদেবীকে।

'এখনো ঠিক তেমনই আছ তুমি তন্দ্রা। বাতাসে ভেসে থাকা তুলোর মতো কোমল আর পূর্ণিমার চাঁদের মতো পুষ্ট! আমাকে ক্ষমা কর তন্দ্রা। খুব বেশি অবিচার করেছি তোমার সঙ্গে। কী করব বল, মদনদেবের আশীর্বাদ নেই তো আমার উপর। হাতে কৃপাণ দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছে এ ধরাধামে। কাছে যে আসে, প্রকৃতির নিয়মেই ধরাশায়ী হয়। একান্তই নিজের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নাও এটা।' আলিঙ্গন ঢিলে করে ওকে সামনে ধরে বলে, 'আজ আমি তোমার দাস, তন্দ্রাদেবী। আদেশ দাও কী সেবা করতে পারি।'

লক্ষণের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে ওকে। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলে, 'মহারাজ, প্রভু আমার, আর কোনো দুঃখ নেই। এ জীবনের সব পেয়ে গেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক পলকের জন্য বেরিয়ে যায় তন্দ্রাদেবী। কারুকাজ করা কুলুঙ্গির পর্দার দুলে উঠা থেমে যাওয়ার আগেই আবার ফিরে আসে ওখানে। বিশাল এক রুপোর থালায় সাজানো ফলমূল, মিষ্টান্ন ও পানীয়ের পাত্র। নীল চীনামাটির পেয়ালায় সোনালি সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে পেয়ালা এগিয়ে ধরে লক্ষণের সামনে।

'নিন মহারাজ, আজ আমি আপনার পানীয় পরিবেশনকারী। ভগবান মঙ্গল করুন আপনার, সকল আশা, সব কামনা পূর্ণ হোক আপনার।'

তন্দ্রাদেবীর হাতে ধরা ড্রাগনের ছবি আঁকা চীনামাটির পানপাত্রে শরতের অম্লান পূর্ণিমায় স্বচ্ছ নদীর জলে ঝিরঝিরে বাতাসে মৃদু ঢেউ তোলা সোনালি জলের মতো সুমধুর উত্তেজক পানীয় তিরতিরিয়ে কাঁপে। বুঝতে পারে লক্ষণ, ভালোবাসার রঙিন কথামালা এখন পরিয়ে দিতে হবে তন্দ্রাদেবীর কণ্ঠে। মাথার ভেতর যুদ্ধাভিযানের দাবানল থেমে গেলেও ওটার আঁচ এখনো শেষ হয়নি। কাছের ও দূরের সামন্তরাজাদের কুটিল মুখচ্ছবি, সেনাপতিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জনসাধারণের অত্যাচারিত মুখ, পরাজয়ের ভীতি, সৈন্যদের ভেতর শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ওদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেয়া, এরকম শত শত ভাবনা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে তন্দ্রাদেবীর দিকে ঘুরিয়ে আনে ওটা।

'তন্দ্রাদেবী, রাজাদের কামনা-বাসনা কখনো পূর্ণ হয় না। এর অবসান হয় একমাত্র পরাজয়ে, অথবা মৃত্যুতে।'

'এভাবে বলবেন না প্রভু। মানুষের অনেক কামনা রয়েছে। রাজারাও মানুষ।'

এক হাতে তন্দ্রাদেবীকে বেষ্টন করে অন্য হাতে পানীয়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলে ধরে দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে প্রশংসায় সাবলীল হয়ে ওঠে লক্ষণ।

'বাহ্, দারুণ মিশ্রণ, দেবী! এত ঠাণ্ডা অথচ এমন উত্তেজক!'

'পানীয় প্রস্তুতের শুরু থেকেই এটার সঙ্গে ছিলাম, মহারাজ। আজকের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত এটা।'

প্রথম পেয়ালা নিঃশেষে পান করে তন্দ্রাদেবীকে আবার আলিঙ্গন করে সে। মাথার ভেতরে বয়ে যাওয়া ঝড় কিছুটা শান্ত হয়েছে তখন। মনের ভেতর দোলা দেয় রঙের খেলা।

'তন্দ্রাদেবী, জন্ম থেকেই তো দেখে আসছ রাজরাজরাদের এই মহান জীবনের 'রাজকীয়' বয়ে চলা, অন্য কোনো শব্দ আর খুঁজে পেলাম না এ জীবনটাকে উপমিত করার জন্য, এই 'রাজকীয়' জীবনের সারাক্ষণ মন্ত্রী, সামন্ত, মহাসামন্ত, অমাত্য, সেনাপতি, এরা সব ছিঁড়েখুঁড়ে নিঃশেষে খেয়ে

ফেলছে আমাকে। নিজের জীবন বলে আর কিছু নেই আমার তন্দ্রা যে তোমাকে দেব।'

'এর সবই আমি জানি প্রভু। কোনো অভিযোগ নেই আমার।'

'তোমার মহত্ত্ব এটা। মনে পড়ে তন্দ্রা আমাদের কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলোর কথা? ওই কটা বছরই বোধ হয় জীবন ছিল জীবনের ভেতর। বেঁচে ছিলাম আমরা।'

'খুব মনে পড়ে' শূন্যে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ তন্দ্রাদেবী। তারপর আবার বলে, 'খুব মনে পড়ে, প্রভু।'

আরেক পেয়ালা পানীয় তন্দ্রাদেবী তুলে দেয় লক্ষণের হাতে। ওটা থেকে প্রথমে একটু তন্দ্রার ঠোঁটে ছোঁয়ায় লক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে পান করে। ঘরের উঁচু ছাদে ঝোলানো ঝারবাতি থেকে ঠিকরে পড়া টুকরো টুকরো উজ্জ্বল আলোর বর্ণালি এক অনিন্দ্যসুন্দর আভা তৈরি করেছে ঘরের ভেতর। পানীয়ের নেশায় ওটা এখন এক স্বর্গীয় আলোর রূপ নিয়ে এসেছে লক্ষণের কাছে। রাজ্যের যাবতীয় যন্ত্রণার জটাজাল ছিন্ন করে জীবনের এক ফোঁটা মধু আহরণের জন্য সর্বতোভাবে নিজেকে ছেড়ে দেয় তন্দ্রাদেবীর নিয়ন্ত্রণে।

'মহারাজ এখনো পরিপূর্ণ যুবক রয়েছেন।'

'তুমিও তন্বী তরুণীই রয়েছ। জলে টলমল পূর্ণ দিঘি।'

'কেন লজ্জা দিতে চান মহারাজ। আজ ওটা চাই না। আমি জানি, কী ছিল আমার, আর কী নেই এখন।'

'সবই আছে, সবই আছে তন্দ্রা, দেবী।' তন্ময় এক ঘোরের ভেতর ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে লক্ষণ।

অনেক অনেক দিন পর কৈশোরের উন্মাদনা শেষ হলে আরেক পেয়ালা পানীয় ঢেলে দেয় তন্দ্রা। সঙ্গে কিছু খাবার। নিজেও মুখে দেয় এটা ওটা। লক্ষণের মাথার ভেতর রাজ্যের ঐ ঝড়টা আবার ফিরে আসতে শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

আশ্চর্য এক বংশীবাদক আরণ্য। বেশ বড় একটা কোষা নৌকা আছে ওর। কালো কাঠামোর ওই নৌকার গলুইয়ে সাদা রং দিয়ে দুটো চোখ এঁকে নিয়েছে। যখন কোনো যুদ্ধযাত্রা থাকে না, কিংবা লক্ষণের সঙ্গে প্রমোদবিহারে বেরোতে হয় না, এই নৌকাটা নিয়ে একা একা ভেসে বেড়ানোর জন্য চলে আসে আড়িয়াল বিলে। অনেক পুরোনো এই বিলে এসে মিশেছে কিছু ছোটখাটো খাল ও শাখানদীর স্রোতধারা। বিলের একটা অংশ একসময় পদ্মাবতীর খাত ছিল। ফলে অনেক জায়গা যথেষ্ট গভীর। শুকনো মৌসুমেও পানি থাকে ওখানে। বিলের কিছু অংশ শীতকালে পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। কৃষকেরা ওখান থেকে ধানের একটা চাষ উঠিয়ে নেয় প্রতি বছর। পুরো বিল ভরা রয়েছে ছোট বড় অনেক রকম মাছে। একটা খাল আছে এখানে, নাম ভরাকৈয়ের খাল। যে-কোনো দিকে যাওয়া যায় এ বিল থেকে। ছোট্ট একটা খাল ধরে কিছুটা উজিয়ে অন্য একটা শাখানদীর ধীর বেগে বয়ে যাওয়া স্রোত ধারায় নৌকার হাল ছেড়ে দেয় আরণ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে ভেসে বেড়াবে নৌকাটা। নদীর দুর্বল স্রোত কিছুটা ভাটিতে নামিয়ে দিলে আবার বাতাসই হয়তো এটাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে উজানে। কখনো তীরে এসে লেগে থাকবে কিছুক্ষণ, আবার ভাটির টান, নয়তো বাতাসের ধাক্কায় ছুটে যাবে। নদীর উপর ঝুলে রয়েছে শীতল বাতাসের একটা স্তর। ধারে কাছে তেমন কোনো জনবসতি নেই। কৈবর্ত, চাষা ও খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা বাস করে নিচু চরাঞ্চলে, যেখানে স্থায়ী কোনো আবাস গড়ে তোলা যায় না। এক পুরুষেই হয়তো কয়েকবার আবাস বদলাতে হয়। উঁচু ও নিরাপদ জায়গায় বাস করে সামন্ত ও জমিদারেরা, ভৌমিকেরা, সমাজপতি ও কুলপতিরা। উঁচু জমির কিছু কিছু ভাগ পায় ওদের সার্বক্ষণিক সেবাদাসেরা। তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয় ওদের সবসময়।

অনেক বছর আগে, নদীর তীরে যখন তীরছোড়া চর্চা করত লক্ষণ তখন থেকে ওর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী আরণ্য। ওর খেলার সাথি, কৈশোরের অনেক দুরন্তপনার সহচর, অনেক স্মৃতিজড়িত বাল্যসখা। বনেজঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া, নদীজলে সাঁতরে বেড়ানো, ছোট ছোট বন্য প্রাণী ও পাখি শিকার, এরকম অনেক খেলাধুলা ও অসংখ্য গোপন উত্তেজনা শুরুর সাক্ষী। আধাশূদ্র পরিবার হতে আসা আরণ্যকে বল্লাল সেন নিযুক্ত করেছিল লক্ষণের বালকভৃত্য হিসেবে। আরণ্যের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠা লক্ষণকে অভিভূত করে। ওরা দুজনেই বেড়ে উঠার পর লক্ষণের সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয় ওকে। প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রহরী হিসেবে সারাক্ষণ সঙ্গে রাখে। লক্ষণ জানে যে আরণ্য জীবিত থাকতে ওর কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

লক্ষণদের সঙ্গে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক সঙ্গে হেসেখেলে বড় হয়েছে ওর প্রায় সমবয়সী, বৈমাত্রেয় দিদি প্রভাবতী। আরণ্যের সঙ্গেও ছিল প্রভাবতীর সখ্য। লক্ষণের সহচর হিসেবে প্রাসাদের ভেতর আরণ্যের ছিল অবাধ বিচরণ। শৈশব-কৈশোরের ঐ ছেলেখেলা যৌবন শুরুর কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে তীব্র ভালোবাসায় পরিণত হয়। প্রভাবতী ও আরণ্য, দুজনের কেউই প্রথমে বুঝতে পারেনি ওটা। আরণ্যের দিক থেকে ছিল কিছুটা স্বাভাবিক ভীতি। কিন্তু প্রভাবতী উচ্ছল নদীর মতো গ্রাস করেছে ওকে।

লক্ষণের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর উপরে ছিল ওর অবস্থান। প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর প্রধানও ছিল আরণ্যের একান্ত অনুগত। স্বভাবকবি হিসেবে প্রকৃতিগতভাবে আরণ্য ছিল অমায়িক, বুদ্ধিদীপ্ত ও মিশুক। ফলে সবারই ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিল সে।

রাজকন্যাদের মধ্যে প্রভাবতীও ছিল সকলের প্রিয়। ফলে প্রাসাদের কঠিন কোনো শাসনের শৃঙ্খল ছিল না ওর উপর। সদালাস্যময়ী এই বালিকাটি যখন তখন হারিয়ে যেত প্রাসাদের বেষ্টনী ছাড়িয়ে। একান্তে মিলিত হতো আরণ্যের নৌকায় এসে। প্রহরের পর প্রহর ভেসে বেড়াত নদীনালার বুকে। অসংখ্য কবিতা রচনা করে ঐ সময় আরণ্য। প্রতিদিন একটা করে নতুন কবিতা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত প্রভাবতী। প্রাসাদের ভেতর প্রভাবতীর মতো কবিতাপ্রেমী আর কেউ ছিল না। ওদের দুজনের অন্তরঙ্গতা প্রকৃতপক্ষে ছিল নিখাদ ও যথাযথ।

মানুষের স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নের ঘোরও ভাঙে। আরণ্য এক কবি, আবেগের আকর্ষণে অনেক দূরে গিয়ে উপনীত হয়েছে সে। আরো একটা সত্ত্বা রয়েছে ওর, সে সৈনিক। সামান্য এক পরিবার থেকে উঠে এসেও লক্ষণের আনুকূল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে সেনাদলের উচ্চপদে আসীন হতে পেরেছে। লক্ষণের একান্ত প্রিয়ভাজন, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী সে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগ নিয়ন্ত্রণের সহজাত ক্ষমতাও এসে যায় ওর ভেতর। সে বুঝতে পারে যে এ অসম সম্পর্কের পরিণতি কখনোই ভালো হতে পারে না। নিজের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে আনার মতো চরম নিষ্ঠুরতায় দমন করার চেষ্টা করে নিজেকে। এক রাজার রক্ষক সে। রাজ্য রক্ষার ভার রাজার, আর সে পালন করে চলেছে ওই রাজাকে নিরাপদ রাখার সুগভীর দায়িত্ব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ওর উপর দেয়া এই গুরুভার সত্যিই এক বিশাল অর্থ বহন করে। ব্যক্তিগত প্রেম, ভালোবাসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই তুচ্ছ এই গুরুদায়িত্বের কাছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে সে। কোনো না কোনো কাজের সূত্র ধরে প্রভাবতীর কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু এটার ফলাফল হয় আরো বিপরীত। এমনভাবে অস্থির হয়ে ওঠে প্রভাবতী যে গোপনীয়তার আবরণটুকু ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

আরণ্যের জীবনে আবেগের চেয়ে অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রভাবতীর সঙ্গে কোনোভাবে কুলিয়ে উঠতে না পেরে লক্ষণের শরণাপন্ন হয় সে। সুদূর কঙ্কগ্রামভুক্তিতে একটা সফল অভিযান চালিয়ে এখন অনেকটা হালকা মেজাজে রয়েছে লক্ষণ সেন। কিছুদিনের জন্য বিশ্রামেরও প্রয়োজন রয়েছে ওর। সুন্দর এক কবিতা-সন্ধ্যায় এক ফাঁকে কথা ওঠায় আরণ্য, 'মহারাজ, কিছুদিনের জন্য একবার দূরদেশে যাওয়ার অনুমতি দিন আমাকে।'

'দূরদেশে! কোথায় ওটা, আরণ্য?'

'হরিকেলের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে।'

কপালে কুঞ্চন তুলে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'কেন?'

কী বলবে একটু ভাবে আরণ্য। কিছুটা প্রস্তুতি অবশ্য রয়েছে মনে মনে। কিন্তু লক্ষণ সেন যেভাবে জেরা শুরু করেছে, কোথাও ফেঁসে যায় কিনা ভাবে। এমনিতেই মনের ভেতর রয়েছে চাপা ভয়। ইতস্তত করে বলে, 'কীভাবে বলব মহারাজকে বুঝতে পারছি না। একেবারে ব্যক্তিগত একটা ঔৎসুক্য।'

'ঠিক আছে, তোমার সমস্যা থাকলে বল না।'

এক্ষেত্রে বিষয়টা আবার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে বা অন্যরকম কিছু হয়ে উঠতে পারে। কী না কী ভেবে বসে থাকে লক্ষণ সেন, তাই সে বলে, 'না, কোনো সমস্যা নেই মহারাজ। শুনেছি হরিকেলের কোনো কোনো বন্দরে কিছু আরব বণিক এসে ভিড় করছে, যাদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারক কিছু সাধুও রয়েছে। ওরা নাকি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা রাখে। ওদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত যে ওরা খুব সহজ সরল ও প্রকৃত সাধু।'

'সাধুর আবার অপ্রকৃতও হয় নাকি আরণ্য?'

'তা হয়তো বোঝাতে চাইনি মহারাজ।'

'ঠিক আছে, বল।'

'অন্তজশ্রেণির মানুষদের কেউ কেউ ওদের সারল্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ওদের প্রচারিত নতুন ধর্মের অনুসারী হয়ে উঠছে।'

'তোমার উৎসাহের কারণ জানতে পারি আরণ্য? তুমি কী এখন ওই ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছ!'

'না মহারাজ, ওই ধর্মে দীক্ষা নেয়ার কোনো আগ্রহ আমার নেই। শুরুতেই বলেছি, শুধুই ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য।'

'জানা যায় ঐ ঔৎসুক্যের কারণ?'

'শুনেছি চন্দ্রদ্বীপেও দু-একজন সাধু আস্তানা গেড়েছে। ওদের ধর্মটা নাকি শান্তি ও সাম্যের। ধর্মান্তরিত হয়ে যে-কেউ ওটা গ্রহণ করতে পারে এবং ওই ধর্মে কেউ দীক্ষিত হলে ওদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয় ওরা।'

'কারা দেয়?'

'ওদের পেছনে শক্তিও রয়েছে, মহারাজ।'

'তাই নাকি, তা এত দূরদেশ থেকে এসে ওরা দীক্ষিত করছে তোমাদের, তোমরা কেন ওদের দীক্ষা দিচ্ছ না?'

'হিন্দুধর্মটা তো ধর্মান্তর গ্রহণ করে না, মহারাজ। হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়।'

'জন্মাতে হয় হিন্দু হয়ে। মৃত্যু নেয়া যায় অন্য ধর্মে গিয়েও! বাহ্ আরণ্য।'

'তাই তো জেনে এসেছি মহারাজ।'

'তুমি কী জান যে ওদের ধর্মটা কাউকে ঐ ধর্ম ত্যাগের অনুমতি দেয় কিনা?
'

'যদ্দূর জেনেছি মহারাজ, দেয় না।'

'তাহলে আর ওদের দীক্ষা দেবে কীভাবে?'

'ওদের দীক্ষা দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব না।'

'কেন?'

'কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে ওদেরটাই শ্রেষ্ঠ। ভালোটা ছেড়ে কে আর খারাপটা নেয় মহারাজ।'

'তাহলে তো দুটোই একমুখী। একটা নিতে দেয় না, আর অন্যটা ছাড়তে দেয় না। কোনটা ভালো?'

'উদারতার দিক থেকে তো মনে হয় প্রথমটা ভালো।'

'তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো ওরকমই মনে হয়।'

'কেন মহারাজ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওদের দীক্ষিত করার কোনো সুযোগ নেই এখানে। যা অন্যকে গ্রহণ করতে পারে না তা উদার হয় কী করে?'

'তাহলে তো আমাকেই সমর্থন করলেন।'

'তাই কী?'

'অন্যভাবে যদি বলেন, তাহলে যা ছেড়ে যেতে দেয় না, তাও বা উদার হয় কীভাবে?'

'তাও ঠিক।'

'ধর্ম বিষয়টা একটু জটিল মহারাজ। ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো।'

'ওখানে আকৃষ্ট হয়েই দূরদেশে যাচ্ছ তুমি!'

চুপ করে থাকে আরণ্য। আসল কারণ তো বলতে পারে না। বিষয়টা বুঝতে পারে না লক্ষণ। ভাবে, পেছনে হয়তো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত বলে, 'ঠিক আছে আরণ্য, যাও।'

খুশিতে লাফিয়ে ওঠে আরণ্যের চোখদুটো।

'মহারাজের মহানুভবতা শিরোধার্য।'

'কদিনের জন্য যেতে চাও?'

'খুব বেশি দিন না।'

'তাহলে চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত যাও না কেন? ওখানেও তো ঐ সাধুসঙ্গ পাচ্ছ তুমি।'

একটু যেন চুপসে যায় আরণ্য। সন্দেহ হয়, লক্ষণ হয়তো ঠিকই অন্য কিছু ভেবে বসে আছে।

'ঠিক সাধুসঙ্গ পাওয়ার জন্য নয় মহারাজ। বলতে পারেন একটু দূরদেশ ভ্রমণ করা, এই একটু হাওয়া বদলানো...।'

'বাহ্, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নাও না কেন?' আরণ্যের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে লক্ষণ।

একটু চমকে ওঠে আরণ্য। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেয়। আবার বলে লক্ষণ, 'না আরণ্য, কৌতুক করলাম। যাও যত দিনের জন্য খুশি তোমার। বুঝতেই পার, আমি চাইব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আস তুমি।'

'তাই হবে মহারাজ।'

'কত সৈন্য চাই তোমার? রসদ যা লাগে নিয়ে নিয়ো। আদেশ পাঠিয়ে দেব।'

'সৈন্য লাগবে না, মহারাজ। আমি একাই যেতে চাই।'

'বল কী আরণ্য, প্রধান সেনাপতির কাছাকাছি তোমার অবস্থান! তোমার জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

'ছদ্মবেশে যাব মহারাজ। দশ হাত পেরোলে এদেশে কে কাকে চিনে?'

'আমার মন মানছে না আরণ্য। তুমি আমার একজন সেনাপতিই নও কেবল, যে আদেশ দেব। তুমি আমার একান্ত সুহৃদ, তোমার উপর জোর খাটাব কীভাবে।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, আরণ্য কোনো ভুল করবে না।'

'তাই যেন হয় আরণ্য। ঠিক আছে যাও। ভগবান মঙ্গল করুন তোমার।'

লক্ষণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরণ্য বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণ দিকে। বড় একটা গয়না নৌকায় কয়েক মাসের রসদ নিয়ে ভাটির স্রোতে ভেসে চলে অনির্দিষ্টভাবে। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে স্রোতের টানে চন্দ্রদ্বীপের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। নদীটা এখানে ভয়াবহ। এত বেশি স্রোত যে মাঝিমাল্লারা ভয় পেয়ে যায়। জল দেখে বোঝা যায় না নদী না সমুদ্র। ঢেউগুলো অনেক বেশি উত্তাল। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ। জল খুব ঘোলা। নৌকার সারেং আর এগোতে চায় না। নদীর মোহনা এটা। এর পরে সমুদ্র। এ নৌকাটা সমুদ্রোপযোগীভাবে গড়া না। আবার উজিয়ে যেতে আদেশ দেয় আরণ্য। কোনো একটা শাখা নদী অথবা বড় খাল ধরে এগিয়ে যেতে বলে যেন প্রবল স্রোতের বিপক্ষে যেতে না হয়। সারেং বলে, সেক্ষেত্রে ফিরে যেতে অনেক দিন লাগবে। তাতেই সায় দেয় আরণ্য। এটাই বরং চায় সে। দুদিন পর একটা ছোট নদী অথবা বড় খালের ভেতর ঢুকে পড়ে নৌকাটা। নদীর জল গেরুয়া রঙের। একটু অবাক হয় আরণ্য। সারেং জানায় কয়েকদিন ধরে সামনে উজিয়ে গেলে পাওয়া যাবে রোহিতগিরি নামের একটা জায়গা। ওখানে অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর বাস। 'জল তো আর বৌদ্ধরা লাল করেনি, সারেং।' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে আরণ্য। সারেং জানায় যে উজানের অঞ্চল লালমাটি দিয়ে গড়া। এজন্য জায়গার নাম রোহিতগিরি। লোহিতগিরি থেকে বিবর্তিত হয়ে রোহিতগিরি হয়েছে। অসংখ্য ছোট ছোট গিরি বা নিচু পাহাড় ও টিলা রয়েছে। এসবের মাঝ দিয়ে নদীটা বয়ে এসেছে। এজন্য জলের রং এমন গেরুয়া। ওর জবাবে সন্তুষ্ট হয় আরণ্য। এখানকার সারেংরা বেশ অভিজ্ঞ। চারদিকের নদীনালা ও জলভূমির একটা মানচিত্র রয়েছে ওদের মাথার ভেতর। স্থলভাগের প্রাকৃতিক নিশানা, নদীর জলের রং, গভীরতা, বিস্তার এসব দেখে প্রায় নির্ভুলভাবে নিজেদের অবস্থান বুঝে নিতে পারে। আকাশের তারা দেখে সমুদ্রগামী নাবিকেরা যেমন ওদের অবস্থান বুঝে নেয়, এই সব সারেংরাও তেমনি মাটি ও জলের প্রকৃতি দেখে ওদের গতি ও যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করে। আরণ্য বুঝতে পারে না ওদের বামুন পুরোহিতেরা কেন জনসাধারণের জন্য সমুদ্র পাড়ি দেয়া নিষিদ্ধ করেছিল? নিশ্চয় কোনো গোষ্ঠীস্বার্থ রয়েছে এখানে। এটা করা না হলে বাংলার এসব দুঃসাহসী নাবিকেরা দূরদেশে ছড়িয়ে পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত। আরণ্যের ভেতর যেমন রয়েছে এক কবি, তেমনি রয়েছে ভ্রমণের নেশাও। ওর ইচ্ছে হয় শুধু জলে ভেসে বেড়াতে।

প্রভাবতীকে ভুলে থাকতে এসে এখন ওকেই মনে পড়ছে খুব বেশি। ওকে ছেড়ে আসার সময়ে কতশত কবিতা যে বানিয়েছে মাথার ভেতর, ওগুলোর একটাও শোনানো হলো না ওকে, সবই আবার মিলিয়ে গেছে। অন্তর্যাতনা নদীর তীব্র স্রোতের মতো ওর মনের দুকূল ভেঙে অজানার উদ্দেশ্যে বয়ে চলেছে ওরই মতো দিকচিহ্নহীন। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। জীবন কেন এমন, ভগবান! কেন সে জড়াতে দিল প্রভাবতীকে ওর জীবনের সঙ্গে! আরণ্য নিশ্চিত জানে প্রভাবতীও জ্বলে পুড়ে মরছে এক তীব্র দহনে। কী অর্থ এসবের!

অনেকটা জোর করে মন থেকে এ ভাবনাটা সরিয়ে রাখে আরণ্য।

নৌকা আবার নদী ছেড়ে ধুধু বালুর অসংখ্য চরের কাছাকাছি চলে আসে। ঘুম থেকে উঠে এমন চোখ ধাঁধানো সুন্দর দেখে একটু অবাক হয় আরণ্য। ছোটবড় অসংখ্য বালুচর, কোনো কোনোটায় সবুজ ফসল। মাঝে মাঝে বিস্তৃত জল। স্রোত নেই বললেই চলে। তড়তড়িয়ে এগিয়ে চলে নৌকা। কোথাও জল এত কম যে নৌকার তলা চরে আটকে যায়। মাঝিমাল্লারা জলে নেমে নৌকা ঠেলে আবার ভাসিয়ে দেয়। এসব চরের মাঝে দু-একটা লোকালয় ও পোষাপ্রাণীর আভাস পাওয়া যায়। নদীতে প্রচুর মাছ। জাল ফেলে ও বড়শিতে গেঁথে অনেক মাছ ধরে মাঝিরা। আরণ্যও জাল ছুড়ে কিছু মাছ ধরে। নৌকার চুলোয় ওগুলো রান্না করে দেয় মাল্লারা। এসব মাছভাজা খেতে খুব সুস্বাদু। বিকেলে কোনো একটা লোকালয়ের কাছে নৌকা ভিড়াতে বলে আরণ্য। সারেং রাজি হয় না। মেঘনার এসব চরাঞ্চলের মানুষজন নাকি কিছুটা হিংস্র ও উগ্রমেজাজি। কিছুক্ষণের বিরতি নেয়ার জন্য সারেঙের সুবিধামতো একটা নির্জন চরে নৌকা ভিড়ায় ওরা।

সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে। আকাশে আলো থাকতেই দেখা দেয় পূর্ণিমাতিথীর ঝকঝকে রূপালি চাঁদ। সারেঙের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য মনে মনে ইচ্ছা রাখে আরণ্য। ঘন সবুজ গাছপালায় ছাওয়া ছোট্ট একটা চর দেখিয়ে ওখানে নৌকা নিয়ে যেতে বলে আরণ্য। সারেং জানায়, 'ওখানটা নিরাপদ মনে হয় না।'

'কীভাবে বুঝলে, বাঘ ভালুক আছে?'

'না, তা নেই। ওটা লোকালয়।'

'ঘরবাড়ি দেখা যায় না যে কোনো?'

'চারদিকে দেখেন, কত নারকেল আর সুপারির গাছ। ওদের বাড়িঘরের চারপাশে নারকেল ও সুপারি বাগান থাকে।'

'জানা ছিল না আমার। অনেক খোঁজখবরই রাখ দেখি অবনী।'

'নৌকা চালিয়ে নিজেদের আহার জোটাতে হয়। এটাই আমাদের পেশা। কত জল পেরোতে হয় এক জীবনে! পথ ঘাটের নিশানা জানা না থাকলে বেঁচে থাকা যায় না, মহাশয়।'

'ঠিকই বলেছ অবনী, কোথায় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে জানা না থাকলে অপঘাতে প্রাণ হারাতে হয়।'

'আজ্ঞে মহাশয়। বাইরে থেকে আমাদের জীবনটা বোঝা যায় না। কত যে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিতে হয়! চমৎকার ঝকঝকে আকাশ দেখে পাল তুললেন নদী পার হবেন বলে, হঠাৎ মধ্যনদীতে ঝড়। এরকম কত শত ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। আমাদের পরিবারে পুরুষদের একটা বড় অংশ প্রাণ হারিয়েছে নদীতে। জানি না ভগবান কোথায় আমার পরিণতি লিখে রেখেছে। কখনো চরায় আটকে অপেক্ষা করতে হয় নদীতে পরের বার জোয়ার আসার জন্য। দস্যুদল কখনো চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। কত যে ঝঞ্ঝা!'

'প্রত্যেক পেশায়ই কিছু না কিছু ঝুঁকি আছে। তোমাদের হয়তো একটু বেশি অবনী।'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

লোকালয় থেকে অনেকটা সরে এসে ছোট্ট একটা খাঁড়ির মতো জলায় নোঙর ফেলে অবনী। এখান থেকে চারদিকের কোনোকিছু দেখা যায় না। নৌকার ছইয়ের উপর উঠে দাঁড়ালে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। আরণ্য এবার বুঝতে পারে যে এ অঞ্চলটা অবনীর একেবারে নখদর্পণে। সত্যিই নিরাপদ মনে হয় জায়গাটা। সন্ধ্যার অন্ধকার মিলিয়ে যাওয়ার আগে আকাশ উজ্জ্বল করে জ্যোৎস্না নেমে আসে। চারদিকে শুধু জল ও বালুময় ধূসর স্থলের সৌন্দর্য যে কী অসাধারণ তা না দেখলে বোঝা কঠিন। নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু কুলুকুলু সংগীত ছাড়া অতিরিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো শব্দ নেই এখানের প্রকৃতিতে। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকে আরণ্য প্রকৃতির এই মৌন মহান মুখরতায়। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পানীয় নিয়ে নৌকার ছইয়ের উপর উঠে বসে আরণ্য। বাকি জীবনটা যদি এই নিরিবিলি জলের রাজ্যে কাটিয়ে দিতে পারত! একটা কবিতা এসে প্রজাপতির হালকা পাখায় মাথার ভেতর ছন্দ তোলে। একপাত্র পানীয় নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক রাখে আরণ্য। ভগবানের স্বর্গরাজ্যে নিশ্চয় এমন কোমল আলোর সরল উদ্যান রয়েছে। ওসব হয়তো দেবতাদের জন্য। মানুষের এই রাজ্যে, মানুষের জন্য যেগুলো রয়েছে তা খুঁজে পায় না মানুষেরা, অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজেই না। এই নিসর্গের ভেতর এত মাধুর্য রয়েছে, এত অসীম সম্ভাবনা, এত প্রাণ, এত সুখ, এসব ছেড়ে কী নিয়ে, কেন যুদ্ধ করে মানুষেরা! এই অপূর্ব সুখের মুহূর্তগুলো একা একা উপভোগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আরণ্যের কাছে। বারবার প্রভাবতী এসে দাঁড়ায় সামনে, অম্লান মধুজ্যোৎস্নায় ভেসে, সোনালি জলের সুচিক্কণ ঢেউয়ের লঘুছন্দে, বাতাসের কোমল ফিসফিস ধ্বনির ভেতর, এরকম আশ্চর্য সব অভাবনীয় অনুভবে। নাহ্, একা একা আর সহ্য করা যায় না এসব। অবনীকে ডাকে, 'জেগে আছ অবনী?'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

'কিছুক্ষণ কথা বলি তোমার সঙ্গে?'

'আজ্ঞে বলুন।'

'তোমার বিষয়ে জানি কিছু? এতদিন ধরে আছি এক সঙ্গে।'

'সামান্য এক মাঝি আমি। জানানোর মতো কী আছে আমার মহাশয়?'

'ওভাবে বলছ কেন? তোমার বাড়িঘর, পরিবার, এসব আর কী।'

চুপ করে থাকে অবনী। আবার বলে আরণ্য, 'কিছু সময় না হয় শুধু কথাই বললাম।'

'ঠিক আছে মহাশয়।'

'তোমার নিবাস কী এ অঞ্চলে?'

'নিবাস আর কী, বাড়িঘর বলতে যদি মাথা গোঁজার ঠাঁই বলেন, তবে তা আছে আমার সঙ্গেসঙ্গে।'

'বুঝিনি অবনী।'

'এই নৌকাটাই আমার বাড়িঘর মহাশয়।'

'ও হো, তাহলে এখন তোমার বাড়িতেই রয়েছি আমি। বেশ মজা তো।'

'না না মহাশয়, ওভাবে বোঝাতে চাইনি। আপনার বাড়িতেই রয়েছেন আপনি। যতদিন এটার ভাড়া দিচ্ছেন, আপনিই মালিক এটার। আমি আপনার সেবাদাস।'

'নিজেকে এত ছোট করার কারণ নেই অবনী। আমি কোনো সামন্ত পরিবারের সদস্য নই।'

'যদ্দূর জেনেছি সেনরাজাদের একজন সেনাপতি আপনি।'

'খুব ছোট সেনাপতি। ওটা কোনো বিষয় না।'

'তারপরও আপনি আমাদের প্রভুগোত্রের মহাশয়।'

'না অবনী, আমি তোমাদের গোত্রের।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অবনী। তারপর বলে, 'রাতের বেলা মাঝে মাঝে সামান্য সিদ্ধি নেই আমি, মহাশয়ের কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না অবনী, স্বাচ্ছন্দ্যে নিতে পার। তা তোমার পরিবারে কে কে আছে?'

'এখন আর কোনো পরিবার নেই আমার।'

'স্ত্রী নেই?'

'না, গত হয়েছে প্রায় দেড় বছর।'

'আহা, তোমার কষ্ট মনে করিয়ে দিলাম।'

'মনে করানোর কিছু নেই মহাশয়। মনে মনেই আছে ওটা।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়েদের সবাই সংসারী এখন।'

'তোমাকে দেখে তো বেশি বয়সী মনে হয় না।'

'মাঝিমাল্লাদের শরীরটা ধরে রাখতে হয়। নাহলে ঝড়জলের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না।'

'তা অবশ্য ঠিক। ছেলেরাও কী নৌকা চালায়?'

'না, আমাদের প্রথম সন্তান ঝড়ে নিখোঁজ হওয়ায় স্ত্রী দিব্যি দিয়েছিল বাকিদের এ পেশায় না আনতে।'

'কী করে ওরা?'

'একজন মাছ ধরে। আর একজন সামন্তের লাঠিয়াল।'

'তোমাদের সামন্তের নাম কী অবনী?'

'ভূবন বর্মন।'

'বর্মন?'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

'বর্মনদের না সেনরাজারা উচ্ছেদ করেছে?'

'রাজাদের উচ্ছেদ আর কী? এক জায়গায় পরাজিত হলে অন্য জায়গা দখল করে নেয়। নতুন রাজ্যপাট গড়ে তুলে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয় শুধু আমাদের, মানে প্রজাদের।'

'এখনো কী বর্মনদের রাজত্ব আছে?'

'ওই অর্থে নেই। আমাদের অঞ্চলের সামন্ত পরিবারটা বর্মনদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী।'

'কোথায় এ অঞ্চল?'

'যেখান থেকে আমরা ফিরতি যাত্রা শুরু করেছি।'

'এখন বুঝতে পারছি কেন আরো ভাটিতে যেতে চাওনি অবনী।'

'না মহাশয়, ওটা কারণ না। ইচ্ছে হলে ওটুকু সাহসও ধরতে পারি আমরা। কিন্তু সমুদ্রপাড়ি দেয়া আমাদের জন্য শাস্ত্রের নিষেধ।'

ভাবনায় পড়ে আরণ্য। কী কারণ থাকতে পারে এটার? কেন এই নিষেধ? চন্দ্রদ্বীপের মানুষেরা সমুদ্রগামী নৌকা বানাতে পারে। শোনা যায় আরব বণিকেরাও এদের তৈরি নৌকা কিনে নেয়। এখানে এসে ওরা নৌকা মেরামত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। সমুদ্রগামী নৌকা বানানোর কলাকৌশল সব জানে এখানের কিছু মানুষ। শাস্ত্রের এই নিষেধাজ্ঞার কারণ খুঁজে পায় না আরণ্য। জিজ্ঞেস করে, 'সমুদ্র পাড়ি দেয়া নিষেধ কেন জান অবনী?'

'তা আমরা জানব কেমন করে মহাশয়। আপনারা আদেশ দেন, নিষেধ দেন, আমরা ওসব পালন করি। শাস্ত্র জানা তো আমাদের কাজ না।'

'তা ঠিক অবনী। থাক ওসব শাস্ত্র জেনে আমাদেরও কাজ নেই।'

পুরোহিতদের এই সব পশ্চাতমুখী নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয় এই সাধারণ মানুষজনকেও। অবাক হয় আরণ্য। গোষ্ঠীস্বার্থে বামুনেরা এই আত্মঘাতী নিষেধাজ্ঞাটা যদি জারি না করত তাহলে বাংলার সাহসী এসব মানুষ নিশ্চয় সমুদ্র জয় করত একদিন। নিজের ঘরে বসে অন্যের হাতে মার খেতে হতো না এভাবে। ধর্মের মোড়কে এসব অনাচার আর কতদিন যে চলবে ভেবে পায় না আরণ্য। বাইরে থেকে আসা এসব বামুনেরা বাংলার মানুষজনের যে কতটা ক্ষতি করেছে এরকম নিষেধাজ্ঞাগুলো জারি করে তা বুঝতে হয়তো এ জনপদের মানুষদের আরো শত শত বছর লেগে যাবে। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছে আরণ্য, বাংলার মানুষেরা সব কিছু একটু দেরিতে বোঝে।

কথা বলার নেশা পেয়েছে এখন ওকে। কিছুটা সিদ্ধি নেয়ায় অবনীকেও বেশ চাঙা ও উৎফুল্ল মনে হয়। বেশ সহজও হয়ে এসেছে।

আরণ্য জিজ্ঞেস করে ওকে, 'শুনেছি আরব বণিকদের সঙ্গে আজকাল কিছু কিছু ধর্ম প্রচারকও আসছে এদিকে। কিছু জান ওদের সম্পর্কে?'

'কিছু জানি আজ্ঞে।'

'বল শুনি কী জান।'

'জানতে চান কোনটা?'

'এই ওদের ধর্মটা কেমন, ধর্মের নিয়মনীতিগুলো কেমন, কীভাবে ওগুলো পালন করে ওরা, এসব আর কী।'

'ধর্মটা কেমন জানি না। তবে ওদের চলাফেরা কিছু দেখেছি। আমাদের এক মাল্লা একদিন নিয়ে গিয়েছিল আমাকে ওদের আখড়ায়। খারাপ কিছু দেখিনি। বরং ভালোই লেগেছে আমার। সবকিছু এত সহজ ও সরল! যে-কেউ এটা পালন করতে পারে।'

'যেমন?'

'দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে ওরা। কোনো মন্দির বা পুরোহিত লাগে না ওদের। যে-কোনো পরিষ্কার জায়গায় যে-কেউ প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারে। এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে, কখনো বসে ও কখনো প্রণাম করে প্রার্থনা জানায় ওরা। কোনো প্রতিমা নেই ওদের। সূর্যাস্তের দিকে ওদের প্রভুগৃহ। সবাই ওদিকে মুখ

ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। কোনো আড়ম্বর নেই। একেবারে সাদাসিধা। ওরা একেশ্বরবাদী।'

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু থামে অবনী। সিদ্ধি বেশ ভালোই কাজ করা শুরু করেছে। মুখে কথা ফুটেছে ওর। গত একটা মাস ওকে দেখেছে শুধু জলের সঙ্গে কথা বলতে। আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গায়। হাঁকডাক ছেড়ে মাঝিমাল্লাদের নির্দেশ দেয়। নৌকার হাল ধরে থাকে শক্ত হাতে। আর সামনের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। মাঝে মাঝে গেয়ে ওঠে অবোধ্য কোনো গানের দু-একটা কলি। ওর মনের ভেতর যে এত দুঃখ, জীবনের এত অভিজ্ঞতা, এত সঞ্চয়, কথা না বললে এসব কোনোদিনও জানা হতো না আরণ্যের। ওকে উসকে দিয়ে বলে, 'বল অবনী, বল।'

'খুব পরিচ্ছন্ন থাকে ওরা। লম্বাঝুলের কাপড় পরে। প্রতিবার প্রার্থনার আগে হাতমুখ ধুয়ে মন্ত্র পড়ে। ওরা বলে দুয়া।'

'জানো দু-একটা?'

'না, মহাশয় জানি না।'

'আর কী জান ওদের বিষয়ে?'

'পরিচ্ছন্ন থাকাকে ওরা বলে পাক। আর নোংরা হয়ে গেলে বলে নাপাক। নাপাক শরীরে ওরা প্রার্থনা করতে পারে না। তাই সব সময় পাক থাকার চেষ্টা করে।'

'মানুষজন কী ওদের অনুসারী হচ্ছে?'

'এখনও না। তবে ওদের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে অনেকের।'

'তোমার কী মনে হয় সাধারণ মানুষজন নেবে এটা?'

'সাধারণ মানুষদের নেয়া না নেয়ায় কী আসে যায় মহাশয়। সাধারণ মানুষজন কী স্বেচ্ছায় কোনো ধর্ম নিতে পারে, না ছাড়তে পারে?'

'তাহলে?'

'সহজ কথাটা কেন জিজ্ঞেস করছেন! রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম। প্রজাদের ধর্ম রাজারা গ্রহণ করেছে এরকম একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?'

'আমার জানা নেই। তবে অনেক ধর্মেরই উৎপত্তি নিপীড়িত প্রজাদের মধ্য থেকে, এটা জানি। কোনো রাজা বোধ হয় কখনো কোনো ধর্ম আবিষ্কার করেনি। প্রজাদের মধ্যে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে অত্যাচারী রাজাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। পরে আবার রাজারাই কোনো না কোনো ধর্ম গ্রহণ করেছে নতুনভাবে প্রজাশাসন অথবা প্রজাপীড়ন অব্যাহত রাখার জন্য। যখন ওরা দেখেছে, প্রজাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত করেছে, অথবা নিজেই রাজা হয়ে উঠেছে, এবং এসব মেনে নিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা বিশ্বাস করেছে অসংখ্য মানুষ, তখন নিজেরাই কোনো না কোনো ধর্ম গ্রহণ করেছে, নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও ধর্মের রক্ষক সাজিয়ে রাজ্য শাসন করেছে। প্রজাদের একটা অংশ, যারা শাসনশোষণের ভাগ পেয়েছে, ঐসব রাজাদের সহায়তা দিয়েছে।'

'আজ্ঞে মহাশয়। এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমাদের রাজারা যদি এই ধর্মটাকে গ্রহণ করে তাহলে প্রজাদের এটাতে পরিবর্তিত করবে। তা রাজারা এটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করুক, কিংবা পরাজিত হয়ে নিজেদের রক্ষার্থে গ্রহণ করুক, সেটা ভিন্ন বিষয়। তবে রাজার ধর্মই আমাদের ধর্ম। এটাই বুঝি আমরা। ধর্মটা তো আর পালন করতে হয় না আমাদের। পুরোহিতদের দেয়া আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চললেই হলো।'

মনে মনে খুব অবাক হয় আরণ্য। সামান্য এক সারেং, যাকে মনেই হয় না যে এই নৌকাটা চালানো ছাড়া আর কিছু জানে, সে কীভাবে মনের ভেতর এত কিছু লালন করে! জীবনের গভীর গোপন যন্ত্রণাগুলো কীভাবে জমা করে রেখেছে বুকের ভেতর!

নিজেই এটার জবাব দেয় আরণ্য। নাবিক ও বণিকেরা সাধারণত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ওদের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে। মানুষের অভিজ্ঞতাগুলো জেনে নিতে পারে ওরা। দিনের পর দিন যখন জলের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মানুষের ভেতর কাটাতে হয় তখন কথা বলার জন্য পরস্পরকে বেছে নিতে হয়। আর এভাবে নাবিকের ও বণিকের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত হয়। এখন আর খুব বেশি কথা বলতে ইচ্ছে হয় না আরণ্যের। ওর কুঠুরিতে গিয়ে ঘুমোতে বলে অবনীকে। মনে হয় ঘুম পেয়েছেও ওর। বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় অবনী। নৌকার ছইয়ের উপর শুয়ে পড়ে আরণ্য। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে। চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখে এবং পুরোপুরি বুঝতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেও এখন এক ধরনের লুকোচুরি খেলছে প্রভাবতীর সঙ্গে। যার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য সরে এসেছে তার কাছ থেকে খুব সামান্য সময়ের জন্যই দূরে থাকতে পেরেছে সে। মেঘের সাদা ভেলার ভেতর ভেসে রয়েছে প্রভাবতী, বাতাসে ওর উষ্ণ নিশ্বাস, কালো কোমল কেশের স্নিগ্ধ সুবাস, মাদকতাময় শরীরের নিবিড় সান্নিধ্য, কঠিন আলিঙ্গন, উত্তাল শরীরী উন্মাদনা, সবকিছুই যে জীবন্ত! কিছুই এড়াতে পারে না আরণ্য। ঘুম আসছে না একটুও। জেগে জেগে আকাশ দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আরণ্যের পুরো আকাশ জুড়ে এখন অস্তাচলের রঙিন মেঘের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অলজ্ঘ্য এক প্রভাবতী!

১০

ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ায় যাত্রাবিরতি দিতে হয় আরণ্যদের। চারদিন পর আবার উত্তরদিকে উজান বাওয়া শুরু। দুদিন পর ওরা এসে পৌঁছোয় মেঘনার এক সবুজ দ্বীপে। অবনীর ইচ্ছে এখানে এক-দুদিন কাটানো। দূর থেকে অনেক সুন্দর দেখায় দ্বীপটাকে। জল থেকে বেশ দূরে প্রায় একই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি গাঢ় সবুজ গাছপালা। বোঝা যায় যে বেশ অনেকদিন লেগেছে মূল দ্বীপ গড়ে উঠতে। সামনে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বালুচর। সাদা ধবধবে বালু জলের ধূসর রঙের সঙ্গে আঁকাবাঁকা বিচিত্র রেখা তৈরি করেছে। দ্বীপের মাটিতে নৌকা ভিড়ানো যায় না। অনেকটা ঘুরে অন্যদিকে গিয়ে ছোট্ট একটা খাল দেখতে পায় ওরা। দ্বীপের ভেতর ঢুকেছে ওটা। খালের শুরুতে নৌকা নোঙর করে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকাতে চড়ে তীরে নামে আরণ্যেরা।

একটাই মাত্র জনবসতি ছোট্ট এই দ্বীপে। একেবারে প্রান্তিক মানুষজন। মেঘনা নদীতে মাছ ধরে, চাষবাস করে, ফসল ফলায়, ফলমূলের বাগান করে। প্রচুর সুপারি ও নারকেল গাছ আছে এখানে। গ্রামের মাঝখানে বাড়িঘর। প্রতি বাড়িতে এক-দুটা তেঁতুলগাছ আছে। বছরের একটা সময় তেঁতুল পাকলে স্থানীয় ফড়িয়ারা নৌকায় এসে এসব টক তেঁতুল কিনে নিয়ে যায় মিষ্টি খেজুরের বিনিময়ে। তারপর গঞ্জে গিয়ে বিক্রি করে আরব বণিকদের কাছে।

কয়েক বছর আগে একদল আরব বণিকের সঙ্গে এক সাধু নাকি এসেছে এখানে। ওরা বলে সুফি দরবেশ। কেউ কেউ বলে সুফিবাবা। সাদা ধবধবে চেহারা। বুক পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি। সাদা পাগড়ি পরে থাকে মাথায়। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা জামা গায়ে থাকে সব সময়। ওটাও নাকি সাদা। সবকিছুই সাদা। শুধু চোখ দুটো কালো। আর দামি পাথরের মতো উজ্জ্বল।

'ওকে দেখেছ তুমি, অবনী?' জিজ্ঞেস করে আরণ্য।

'আজ্ঞে মহাশয়, দেখেছি। ওখানে যেতে চাইলে নিয়ে যেতে পারি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যাব অবনী। অনেকদিন থেকে কানে আসছে এসব সাধুদের কথা। হরিকেলের সমুদ্রবন্দর দিয়ে এসে ওদের কেউ কেউ নাকি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।'

'পুরোনো লোকালয়গুলোয় স্থানীয় বামুনদের বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে ওরা। কিন্তু নতুন কোনো লোকালয়ে বামুনপুরুতের দল ওভাবে না থাকায় সহজে টিকে যাচ্ছে।'

'মানুষদের কী ধর্মান্তর করছে ওরা?'

'উদ্দেশ্য নিশ্চয় ওটা। কিন্তু কাউকে বাধ্য করছে না।'

'নিজে থেকে কেউ নেয় ওটা?'

'তা হয়তো নেয়।'

'এখানের মানুষজনেরা কী বৈষ্ণব?'

'ওভাবে বলা যায় না। মোটাদাগে কৃষিজীবীদের বেশিরভাগ বৌদ্ধ ও মৎস্যজীবীদের হিন্দু বলা যায়। এখানের হিন্দুরা কালী, মনসা, শিব এরকম বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে।'

'বামুন নেই?'

'বামুন ছাড়া দেশ আছে, মহাশয়?'

'আছে অবনী। ঐ সব দেশের খবর আমরা জানি না।'

'হয়তো অন্য রকম বামুন ওরা।'

'তা হবে হয়তো।'

'এখানে এক-দুঘর বামুন আছে, পৈতাধারী। আসল ব্রাহ্মণ না।'

'কিছু মনে কর না অবনী, তোমাকে ভালো লেগেছে আমার। মনের কথা বলি দু-একটা তোমার সঙ্গে। প্রজাগোত্র থেকে এসেছি আমি। এখন রাজদরবারের হয়ে গেছি। দুটো দিকই দেখেছি। এক মুঠো খুদের জন্য ওই পৈতাধারীরাই সবার আগে ধর্মান্তর নেবে।'

'কী বলবেন মহাশয়, ওরাও তো দরিদ্র। দরিদ্রের কাছে ধর্মের চেয়ে খুদ ও নুনের মূল্য অনেক বেশি। ওদুটোর নিশ্চয়তা দেবে যারা তাদেরই অনুসরণ করবে ওরা। একেশ্বর বা অনেক ঈশ্বর কোনো পার্থক্য তৈরি করে না ওদের ভেতর।'

'তোমার কী ধর্মে বিশ্বাস নেই অবনী?'

'ওটা থাকা বা না থাকায় ধর্মের কোনোকিছু আসে যায় না।'

'তোমার তো আসে যায়!'

'না, তাও না।'

'ভেবে বলছ?'

'ধর্মটা কী সত্যিই আছে, মহাশয়?'

'অবশ্যই আছে অবনী।'

'তা হয়তো আপনাদের জন্য। সাধারণ মানুষের কাছে আছে ধর্মের দায়। ধর্ম থেকে এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি কী ঘটেছে বা ঘটবে? চরম ভোগান্তি ছাড়া ধর্ম আর কী দিয়েছে সাধারণ মানুষকে? মর্ত্যলোক আর দেবলোক, দুটোই তো আপনাদের জন্য মহাশয়।'

'দেখ অবনী, সত্য আর ধর্ম, এ দুটোকে ভিন্নভাবে দেখি আমি। ধর্ম হচ্ছে একটা বিশ্বাস, যা থাকে অন্তরে, অন্ধকারে। আর সত্য হচ্ছে আলোর মতো, যা প্রকাশ্য।'

'পুরোপুরি বুঝিনি মহাশয়।'

'যা দেখতে পাও তুমি, অনুভব করতে পার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর, যেমন আকাশের সূর্য, চাঁদ এসব যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ করতে পার না। সূর্য দেখা যায়। এটার শক্তি অনুভব করতে পার। চাঁদেরও তাই, এটার আলো পাও, স্নিগ্ধতা পাও। কিন্তু ধর্মগুলো যে-সকল ঈশ্বরের কথা বলে, ওদের দেখেছে কেউ? কিংবা তুমি আর আমি কী দেখি, না অনুভব করি?'

'যা দেখি না, যা অনুভব করি না, তা কী সত্য হতে পারে না?'

'ওভাবে বলিনি। এই গ্রামটার দিকে দেখ। এটার পরে কী আছে? আরেকটা গ্রাম, তারপর আরেকটা, এভাবে যে কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতা বলে ওসব আছে। তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতায় যা আছে অথচ তোমার সীমাবদ্ধতার কারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হচ্ছে না, তাও সত্য হতে পারে।'

'কিন্তু ধর্মের ওইসব কাহিনি কী মানুষের অভিজ্ঞতায় আছে?'

'না, ওগুলোর কোনোটা কেউ কখনো ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করেনি।'

'সবই কী কল্পকাহিনি?'

'হতেও পারে।'

'তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতায় যা নেই তা সত্য নয়!'

'তাও বলিনি অবনী। মানুষের অভিজ্ঞতায় না থাকলে কল্পনায় থাকতে পারে। আমার কল্পনায় যা আছে, তোমার কল্পনায় তা নাও থাকতে পারে। তুমি আমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনাটাকে গ্রহণ করতে পার বা নাও পার।'

'গ্রহণ না বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস। ধর্মটা হলো এরকমই এক বিশ্বাস। এটা থাকতে পারে অথবা নাও পারে। মহাভারতের যুদ্ধটা কি দেখেছে কেউ? তারপর এই যে ওরা বলে, এটা বেদবাক্য, এটা চিরসত্য, এটা এই, এটা ওই, অভ্রান্ত... এসব, আর এখানেই আমার আপত্তি অবনী। এটা ভ্রান্ত না অভ্রান্ত, আমাকে বিবেচনা করতে দাও দয়া করে। চাপিয়ে দিয়ো না আমার উপর। আমাকে বাধ্য কোরো না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের বামুনরা তো তাই করছে।'

'এজন্যই তো ধর্মান্তর ঘটছে। আজকে যে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম, যা একবার গ্রহণ করলে আর ছাড়া যায় না, এমনকি মেরে ফেলা হয় ধর্মত্যাগীদের, তাদের এ অবস্থা তো বেশি দিন থাকবে না। কালের নিয়মে নাহয় কয়েকশো' বছর। তারপর অন্যকিছু আসবে নিশ্চয়।'

'এসব আমার কল্পনায় নেই, অভিজ্ঞতায়ও নেই।'

'প্রয়োজনও নেই।'

'ঠিকই বলেছেন মহাশয়। আপনাকে মনে হয় বিশ্বাস করতে পারি।'

'এই যে দেখ, আবার বিশ্বাস এসে গেল। তুমি এটা করতে পার। আবার নাও পার। আবার অন্য দিক থেকে দেখ, তোমার এ বিশ্বাসটা আমি বজায় রাখতে পারি, আবার নাও পারি। বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি। তাহলে এই বিশ্বাসটা দুদিকেই নির্ভরশীল। নিরেট একটা বিষয় তো একই সময়ে দুদিকে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না।'

'জটিল করে তুলছেন, দুদিক কেন, আলো তো দশদিকেই থাকে।'

'এজন্যই আলো সত্য। তবে ওটা বোঝাতে চাইনি। ধর, পুবদিকটা কী পশ্চিমেও থাকতে পারে?'

'না।'

'ওরকমই কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছি। আমিও যে বিষয়টা বুঝি, তা না। ধর্ম হচ্ছে এরকমই এক অস্বচ্ছ ধাঁধা। যারা বোঝায় বা প্রচার করে ওরাও যে খুব বেশি বোঝে, তা না। কিছুক্ষণ কথা বললেই দেখবে ওরা আটকে গেছে। এটা এক ফাঁদ অবনী। সবাইকে পা রাখতে হয় এখানে।'

'যাকগে মহাশয়। সামান্য এক মাঝি আমি। এসব তত্ত্বকথা বুঝি না।'

'না অবনী। তুমি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ জীবনে। এই অভিজ্ঞতাটাই জীবনের সারকথা। কেউ এটা পায় গুরুগৃহে, কেউ এটা সংগ্রহ করে প্রকৃতি থেকে, মানুষজনের কাছ থেকে। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিশেছ তুমি। ওদের অভিজ্ঞতাগুলো কোনো না কোনোভাবে জানতে পেরেছ। ঐ সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তুমি আমার কাছে। বামুনেরা সীমিত শিক্ষার গণ্ডি কেটে বাইরে আসতে পারে না। ওটাকেই পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞানভাণ্ডার ধরে নিয়ে টিকিপৈতেয় আস্ফালন তোলে। নিজেদের মহাজ্ঞানী ভেবে নিয়ে সাধারণ মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

ওদের আলোচনা এখানেই থেমে যায়, আপাতত। ঝুপ করে বৃষ্টি নামে। নদীতে বৃষ্টির ফোঁটার অবিরাম পতন দেখে আরণ্য। মাথায় একটা কবিতাভাব ঘুরঘুর করে। জলে জল মেশে। মনে এসে মন মেশে না। হায়! একাকার হয়ে যায় সবকিছু। মানুষও মিশে মানুষের সঙ্গে, অথচ কত পৃথক এই মেশামিশি। কত ভিন্ন প্রতিটা মানুষ। প্রভাবতী ও আরণ্যের এই মেলামেশা জলের একেবারে বিপরীত। কত বিচিত্র এই জলের জগৎ! একই জল কখনো অদৃশ্য জলকণা হয়ে ভেসে থাকে বাতাসে, কখনো তরল হয়ে থাকে জলাশয়ে বা সমুদ্রে, আবার কখনো কঠিন বরফ হয়ে পর্বত শিখরে। মানুষের মনের সঙ্গে কী কিছু মিল রয়েছে জলের এই চরিত্রটির! অথবা মানুষের অনুভবের সঙ্গে। প্রভাবতীর সঙ্গে আরণ্যের সম্পর্কটার দৃশ্যমান কোনো রূপ আছে? কী ব্যাখ্যা এর? মনের একটা স্তর? এরকম অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়ে হারিয়ে যায় আরণ্য। আবার ভাবে, ঠিকই তো আছে। মানুষ তো আর জল না যে যে-পাত্রে ধারণ করবে তারই আকার নেবে।

মনের এই তরল অথবা বায়বীয় অবস্থায় আর আটকে না থেকে আরণ্য সিদ্ধান্ত নেয় যত কঠিন ও নির্মমই হোক এবার গিয়ে প্রভাবতীকে জানিয়ে দেবে ওদের সম্পর্কটার সাফল্য আসবে না কখনো। ও যেন ক্ষমা করে দেয় আরণ্যকে।

মহারাজের সঙ্গেও একটা আলোচনায় যেতে হবে। প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে মহারাজের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব রাখবে। তাহলে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পা রাখতে হবে না আর। প্রভাবতীর চোখের আড়ালে থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু এখন আর ভাবতে পারে না আরণ্য।

পরের দিন জলহাওয়ায় একটা ভালো পরিবর্তন আসে। ঝকঝকে শুকনো আকাশ। অনেক উপর দিয়ে সাদা মেঘ ভেসে যায় আরো দূরের দেশে। অবনীকে নিয়ে আরণ্য বেরোয় ওই সাধুর আস্তানার খোঁজে। লোকালয়টাতে মানুষজন তেমন নেই। বেশিরভাগ জঙ্গুলে জায়গা। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও বুনো গাছপালা জন্মে প্রাকৃতিক বনের সৃষ্টি করেছে। এক জায়গায় কিছু ঘরবাড়ি ও সারিবদ্ধ গাছপালা দেখিয়ে অবনী বলে, 'ওটাই গ্রাম।' লোকালয় এড়িয়ে যায় অবনী। কিছুক্ষণ পর যেখানে গিয়ে পৌঁছোয় ওরা দূর থেকে ওখানটা দেখা যায়নি। চারদিকে জঙ্গল। মাঝখানে পরিচ্ছন্ন একটা আখড়া। প্রবেশপথে থামতে হয় ওদের। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে দুজন মানুষ। এখানে কেউ আসছে কিনা তা মনে হয় দূর থেকে লক্ষ্য রাখে ওরা। অবনীরা আস্তানায় এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। লোকদুটোর সঙ্গে কথা বলে অবনী। আরণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারে যে বেশ ভালোভাবে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করে ওরা। তা নাহলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে কোন সাহসে ধর্ম প্রচার করে!

ওদের সঙ্গে নিয়ে আখড়ার ভেতর ঢোকে লোক দুটো। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ভেতরটা এত প্রসারিত। আস্তানার রক্ষণাবেক্ষণকারী জানায় যে সাধুর সঙ্গে দেখা করা যাবে ওদের সান্ধ্য প্রার্থনার পর। অবনীকে নিয়ে প্রাঙ্গণটা ঘুরে দেখতে কোনো বাধা নেই। বেশ বড় একটা ঘর রয়েছে অভ্যাগত মানুষজনের বসার জন্য। আখড়ার প্রায় চারদিকেই বাঁশের ঝাড়। ওটার বাইরের দিকে ঘন ফনিমনসা গাছের প্রাকৃতিক দেয়াল। প্রবেশপথ ছাড়া অন্য কোনোদিক দিয়ে এখানে ঢোকা সম্ভব না। মূল আখড়ার সামনে বিশাল পুকুর। অন্য দিকগুলোয় ঘন গাছপালা। আখড়ার প্রবেশপথে রয়েছে সার্বক্ষণিক পাহারা। আরণ্যের সৈনিক চোখ রেকি করে সব কিছু। মনে মনে প্রশংসা করে বিদেশি সাধুর। বিকেলের দিকে প্রচুর ফলমূল ও ডাবের পানি দিয়ে আপ্যায়িত করে ওদের। সঙ্গে সুমিষ্ট খেজুর ও যব বা গম থেকে বানানো মোটা ও নরম রুটি। আরণ্য ও অবনী, দুজনেরই ক্ষুধা থাকায় পেট পুরে খায়।

সন্ধ্যায় দেখে ওদের সবাই এক সারিতে দাঁড়িয়ে অস্তসূর্যমুখী হয়ে প্রার্থনা করছে। এখানে যে এত মানুষ থাকে বুঝতে পারেনি আরণ্য। এরা এখানেই থাকে না বাইরে থেকে এসে প্রার্থনার জন্য একত্রিত হয়েছে তাও বুঝতে পারে না। যা শুনেছিল আরণ্য, সে রকমই দেখে। ধূপধুনা, ঘণ্টাধ্বনি, ফুল বেলপাতা, এসব কিছু নেই। কোনো আড়ম্বর নেই। একেবারে সাদাসিধা। শেষ দিকে সবাই দুহাত তুলে কিছুক্ষণ রেখে হাতে চুমো খেয়ে প্রার্থনা শেষ করে। দিনে পাঁচবার নাকি এরকম করে ওরা। এ আস্তানাটাকে ওরা বলে খানকা।

সন্ধ্যার একটু পর মাঝারি আকারের একটা ঘরে অভ্যর্থনা জানানো হয় ওদের। এখানে নাকি ধর্মীয় আলোচনা হয়। ওরা বলে মজলিস। বৃষ্টিবাদল থাকলে প্রার্থনাও এখানে করা হয়। প্রতি শুক্রবার এদের পবিত্র দিন। ওই দুপুরে সবাই এক সঙ্গে প্রার্থনা করে। পুরোহিতকে ওরা বলে ইমাম। শুক্রবারের প্রার্থনার সময় ধর্মোপদেশ দেয়া হয়। ঐ প্রার্থনাঘরকে ওরা বলে মসজিদ। ওটা নাকি ওদের প্রভুর ঘর। সবকিছু কেমন অদ্ভুত মনে হয় আরণ্যের। ঘরের ভেতর মাদুর পাতা। একেবারে খালি ঘর। এত অনাড়ম্বর ও জৌলুসহীন একটা প্রার্থনাঘর এই প্রথম দেখে আরণ্য। কিছুক্ষণ পর ভেতরে ঢুকে সাধু। ওরা বলে সুফি। ডাকে সুফিবাবা বলে। এদেশীয় ভাষা এখনো ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেনি। বুঝে বেশিরভাগই। বলতে পারে সামান্য। ফলে এদেশী একজন দোভাষী রয়েছে সঙ্গে। সুফিসাধুর পশ্চিমদেশীয় ভাষায় আরণ্যদের স্বাগত

জানায়। দোভাষী বুঝিয়ে বলে, যার অর্থ আপনাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না আরণ্য। চুপ করে থাকে। কথা শুরু করে অবনী, 'সুফিবাবা, ইনি এসেছেন দূর দেশ থেকে। আপনার ধর্মটা সম্পর্কে জানতে।'

'খুব ভালো। খুব খুশির কথা। কী জানতে চান?'

'নির্দিষ্ট কিছু নেই। আপনাদের ধর্মটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।'

'কোন দেশ থেকে এসেছেন আপনি?' সরাসরি প্রশ্ন করে আরণ্যকে।

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করার ঢং ও চোখেমুখে একটা ভালোবাসা ফুটিয়ে তোলার ধরন মুগ্ধ করে আরণ্যকে। সুনির্দিষ্টভাবে ওর ঠিকানা না বলে জানায় যে গঙ্গার উত্তর তীরে ওর আবাস। এ বিষয়ে আর কিছু জানতে চায় না সুফি। 'খুব ভালো।' বলে কিছু একটা ভাবে, তারপর বলে, 'সন্ধ্যা ও রাতের প্রার্থনার মাঝখানে সামান্য কিছু খাই আমরা। আপনারা কী ঐ পর্যন্ত থাকবেন? যদি ফিরে না যান, আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে পারি। আমার পরামর্শ যদি নেন, তাহলে থাকাটাই ভালো। রাতের বেলা এখানের রাস্তাঘাট তেমন নিরাপদ না। সাপখোপের ভয় আছে। পথের নিশানাও খুব একটা স্পষ্ট থাকে না।'

এটা তো ভাবেনি আরণ্য। অবনীর দিকে তাকায়। অবনী বলে, 'থেকে যান, মহাশয়।'

ওর কথায় সায় দেয় আরণ্য। অন্য কিছু আর ভেবেও পায় না।

'ভালোই হলো। আপনাদের সঙ্গে কতটা সময় আলোচনা করা যাবে জানতে পারলাম। একটু আয়েশ করে বসুন তাহলে। এখানে খুব আরামে রাখতে পারব না আপনাদের। ক্ষমা করবেন, আমার অতিথিরা।'

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না আমাদের। নিতান্তই সাধারণ মানুষ আমরা। সুখবিলাসে অভ্যস্ত নই।'

আরণ্যের দিকে তাকিয়ে বলে সুফি, 'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না।'

একটু সতর্ক হয় আরণ্য। সন্দেহ করছে না তো ওকে? সুফির হাতে একটা জপ মালা। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওটার কয়েকটা গুটি এগিয়ে যায়।

'বলুন মহাশয়রা, কী জানতে চান?'

'বুঝতে পারছি না কী বলে সম্বোধন করব আপনাকে।'

'খানকার সবাই আমাকে সুফিবাবা ডাকে। আমার নাম অবশ্য একটা আছে। ওটার দরকার পড়ে না। সুফি বা বাবা কোনোটাই আমার নাম না।'

'পদবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তাও না। সুফি শব্দটা আমার ভাষা থেকেই এসেছে। বাবাটা এখানকার।'

'শব্দটার অর্থ জানতে পারি? আমিও সুফিবাবা সম্বোধন করি আপনাকে? আমার নাম আরণ্য।'

'ঠিক আছে মহাশয় আরণ্য।'

'মহাশয় লাগবে না, সুফিবাবা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে আরণ্য। সুফি শব্দটার অর্থ ধার্মিক বা মরমি সাধক। ইসলাম ধর্মের একটা ধারা বা মতবাদ, সুফি মতবাদ। এর বেশি এখন না বলাই ভালো। গাছটাকে না চিনে তার একটা পাতা নিয়ে টানাহেঁচড়া করলে যেমন ঘটে এটাও তাই হবে এখন। প্রথমে ধর্মটাকে যদি জানেন বা বোঝেন তাহলে এর কোনো কোনো মতবাদ নিয়ে হয়তো কথা বলা যাবে।'

'অনেক মতবাদ কী আছে আপনার নতুন ধর্মটায়?

'অনেক না হলেও কিছু তো আছেই। আর ধর্মটা আমার কাছে নতুন না। আমার ও আমার পূর্বপুরুষদেরও এ ধর্মেই জন্ম হয়েছে।'

'মরমি শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন, ওটাও বুঝিনি।'

'মর্ম যে বোঝে, সে মরমি। আধ্যাত্মিক, বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নিয়ে যে সাধনা করে, সেই মরমি সাধক।'

'কোন দেশ থেকে এখানে এসেছেন আপনি?'

'বসরা থেকে।'

'জানি না এটা কোথায়।'

'আরব উপদ্বীপে।'

'আচ্ছা।'

'আমি কী ধর্মটা সম্পর্কে কিছু বলব?

'নিশ্চয় বলবেন।'

'আমাদের ধর্মটার নাম তো জানেনই, আপনাদের ভাষায় এটার অর্থ শান্তি।'

'বাহ্।'

'আমরা একেশ্বরবাদী। আমাদের বিশ্বাসে আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। মুহম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত নবী। তিনিই শেষ নবী। তবে আগের নবীদেরও, যেমন আদম, ঈব্রাহিম, মুসা, দাউদ, ঈশা, এদের স্বীকার করি আমরা।'

'যাদের নাম বললেন তাঁরাও কী একেশ্বরবাদী ছিলেন?'

'ছিলেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে তাদের পথ বদলে গেছিল। তাই শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ পরিপূর্ণ জীবনবিধান পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য।'

'জীবনবিধান?'

'হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট দায়বদ্ধ। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে।'

'এই পুরস্কার বা শাস্তিটা কে দেয়?'

'মানুষের মৃত্যুর পর আরেকটা জীবন আছে, তা অসীম। পৃথিবী ধ্বংসের একটা দিন আছে এবং আছে শেষ বিচারের দিন। ঐ দিন সবার পাপ ও পুণ্যের হিসাব নেয়া হবে। পুণ্যের ফল ও পাপের শাস্তি দেয়া হবে তখন।'

'মানুষ কী তখন আল্লাহকে দেখতে পাবে?'

'তিনি দৃশ্যমান না এবং তাঁকে নিয়ে খুব বেশি ভাবার শক্তিও তিনি আমাদের দেননি। তিনি সর্বজ্ঞ। আমাদের জ্ঞান খুব সীমিত।'

'কীভাবে বিচার করবেন তিনি, কোন কাজটা ভালো আর কোনটা মন্দ?'

'সব কাজই নির্দিষ্ট করা আছে আমাদের জন্য। আমরা জানি কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। কোনো অসুবিধা হয় না আমাদের। এমনকি আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, জীবনধারণ সম্পর্কেও পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দেয়া আছে।'

'দু-একটা বলবেন?'

'খাবার যদি বলেন, শূকরের মাংস, পানীয় মদ্য, এরকম ক্ষতিকর অনেক কিছু আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। আর্থিক বিষয়ে সুদ, ঘুষ এসব নিষিদ্ধ। মানুষের সমাজের জন্য ক্ষতিকর সব বিষয় আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'

'মেনে চলেন সেসব?'

'ওটাই তো আমার ধর্ম।'

'ধর্মের রীতিনীতিগুলো যদি একটু বলেন।'

'কীভাবে এসব পালন করি?'

'হ্যাঁ।'

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কিছু অবশ্য করণীয় আছে। যেমন পাঁচবার নামাজ পড়া, বছরের একটা নির্দিষ্ট মাস রোজা রাখা, প্রতি শুক্রবার একসঙ্গে নামাজ পড়া, দুটো ঈদ পালন করা। যারা ধনী, তাদের জাকাত দেয়া, হজ করা, এরকম আরো আছে।'

'কীভাবে নামাজ পড়েন?'

'মুসলমান হলে এটা শিখিয়ে দেই আমরা। প্রত্যেকবার নামাজ পড়ার আগে পবিত্র হতে হয়।'

'কীভাবে?'

'হাত মুখ পা এসব ধোয়ার একটা রীতি বা পদ্ধতি আছে। অপবিত্র ছোঁয়া লাগলে আবার পবিত্র হতে হয়। আমরা বলি অজু।'

'অপবিত্র বলতে কী বোঝান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মলমূত্র, অপবিত্র প্রাণী, এরকম অনেক কিছু।'

'তাহলে তো সমাজের ধাঙড় বা ঐ শ্রেণির মানুষেরা কখনো আপনাদের ধর্মটা নিতে পারবে না।'

'কেন?'

'কারণ সারাক্ষণ অপবিত্র থাকে ওরা। মলমূত্র পরিষ্কার করাই ওদের পেশা।'

'কিছু মনে করবেন না, ওরাই বরং এগিয়ে আসবে। কারণ আমাদের ধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই। এটা সাম্যের ধর্ম।'

'আপনাদের আবর্জনা পরিষ্কার করে কারা?'

'এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি নেই। যে-কেউ এটা করতে পারে। নিজেরাই এটা করি আমরা।'

'আপনাদের রাজাউজিরেরাও কী নিজেরা করেন?'

'ওদের বিষয়টা ভিন্ন। আমাদের ধর্মটা বিশেষ করে সাধারণ ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে।'

'শুনেছি আপনাদের রাজাবাদশারা তলোয়ারের শক্তিতে মানুষকে বাধ্য করছে ধর্মটা গ্রহণ করতে।'

'মনে হয় এটা পুরোপুরি ঠিক না। কোনো কোনো অত্যাচারী রাজাদের হয়তো এটা করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু নিপীড়িত মানুষদের কখনোই না।'

'রাজাদের কাছে নাকি আপনাদের প্রস্তাবটা এমনভাবে থাকে, হয় আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর, নয়তো যুদ্ধে আস।'

'এ ধর্মটা মানুষের কল্যাণের জন্য। এটার প্রতিষ্ঠাতা কোনো রাজা ছিলেন না। অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে। তাঁর যুদ্ধ ছিল অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের বিপক্ষে না।'

'কীভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়?'

'সমাজে যতটুকু সম্ভব সমতা প্রতিষ্ঠা করে। উঁচু ও নিচু শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনে। আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী ধনীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে দরিদ্রদের দেয়া হয়। ফসলের একটা অংশ দেয়া হয়। পবিত্রতা ও সংযম শিক্ষা দেয়া হয় মানুষকে। ক্ষতিকর খাদ্য ও বিষয় হতে দূরে থাকতে আদেশ দেয়া হয়। নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি ও চিরপ্রশান্তির পথ দেখানো হয়। নিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণ পালনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। এরকম অনেক কিছু। যারা এ ধর্মটা গ্রহণ করে তারা খুশিমনেই পালন করে এবং এসবের সুফল পায়।'

'আপনাদের ধর্মে তাহলে সবাই সমান। দাস-ব্যবস্থা নেই?'

'দাস-ব্যবস্থা উচ্ছেদ এত সহজে সম্ভব না। তবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পথনির্দেশ আছে। একজন দাস তার কাজের মধ্য দিয়ে রাজাও হতে পারে। সমাজের যে-কেউ যে-কোনো অবস্থানে পৌঁছতে পারে। কোনো বাধা নেই।'

'আপনাদের রাজাবাদশারা যে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করছে, অন্য ধর্মের নারীদের সঙ্গে অধর্মাচরণ করছে, সেখানে আপনাদের ধর্মটা নীরব কেন?'

'দেখুন, রাজাবাদশাদের কাজই ওটা। কোন ধর্মের তিনি ওটা বড় কথা না। এখন যেহেতু ওরা দেখছে ইসলামের পতাকাতলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ, লুটতরাজের সামান্য অংশ বিলিয়ে ওদের দিয়ে কাজ করানো সম্ভব, তাই ওরা ধর্মটাকে ব্যবহার করছে। এটা প্রত্যেক ধর্মেরই একটা দুঃখজনক দিক। এদের তলোয়ার কিন্তু ধর্মপ্রচার কিংবা রক্ষার জন্য না। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য সম্পদ আহরণ ও নিজেদের শক্তি প্রদর্শন। কোনো ধর্মপ্রচারককে দেখেছেন আগ্রাসী হতে? ওরা আপনার কাছে ধর্মের বাণী নিয়ে আসে, আহ্বান জানায়। আপনাকে ভালোমন্দ বোঝায়। দুটো জিনিস যদি দেয়া হয় আপনাকে কোনটা নেবেন?'

'বুঝলাম।'

'আমি আপনার দেশে এসেছি ধর্মের আহ্বান জানাতে। আপনি আমাদের আস্তানায় এসেছেন স্বেচ্ছায়। আমাদের কেউ কী অন্যকে ভয় ভীতি দেখিয়েছে?'

আরণ্য যেন এক ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সুফিসাধুর কথা বলার ধরন, মাঝে মাঝে বিরতি, আন্তরিক অভিব্যক্তি, রাতের আলো-আঁধারি পরিবেশ, বাইরের আশ্চর্য নীরব প্রকৃতি, সব মিলিয়ে এক আবেশের ভেতর ডুবে যায় আরণ্য। অজানা কোনো বশীকরণ মন্ত্রের ছোঁয়ায় ঘোরগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। লোকটা কী জাদু জানে! আরণ্যের মনের অবস্থা বোধ হয় অনুমান করতে পারে সে। চুপ করে হাসে মিটিমিটি। ওর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, মধুর ব্যবহার, অন্তরঙ্গ স্পর্শ, সবকিছুই অভিভূত করে, মোহিত করে ওকে। আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু পুরোহিতের কাছে এমন আশ্চর্য ব্যবহার পায়নি আরণ্য। এমনকি মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধভিক্ষুরাও নিজেদের ধর্মটাকে এভাবে তুলে ধরে না মানুষের সামনে। কিছুক্ষণ পর সুফি বলে, 'আরণ্য, কিছুক্ষণের জন্য উঠে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে যে। আমাদের রাত্রিকালীন প্রার্থনার সময় হয়েছে।'

'নিশ্চয়। আমরা কী এখানে থাকব?'

'থাকতেও পারেন অথবা পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেও পারেন। আর কিছু খাবেন?'

'না। এখানেই থাকি আমরা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওপাশটাতে গিয়ে বসুন তাহলে।'

সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার চেয়ে রাতেরটা বেশ দীর্ঘ মনে হয়। দাঁড়িয়ে, বসে, অর্ধনত হয়ে, আভূমি নত হয়ে, ডানে ও বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে, বিভিন্নভাবে প্রার্থনার কাজ শেষ করে ওরা। মনে মনে অবাক হয় আরণ্য। শরীর দিয়েও কী প্রার্থনা করে ওরা? প্রার্থনা শেষ হলে আবার এসে ওদের সঙ্গে বসে সুফিসাধু। আরণ্য জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কী শরীর দিয়েও প্রার্থনা করেন?'

'আত্মা ও শরীর, এই ইহলোকের জীবনে দুটোই তো অচ্ছেদ্য, একটা ছাড়া আরেকটা বাঁচে?'

কী জবাব দেবে আরণ্য?

'আমাদের প্রার্থনা আর কিছুই না, পবিত্রতার। ধর্মটাই পবিত্রতার। এজন্যই আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি। দেহ ও মনের শুদ্ধির জন্য, পবিত্রতার জন্য। পাপ কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকতে পারে না মানুষ। কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রতি নামাজের পর পরমপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, পাপ কাজ থেকে আমাদের দূরে রাখতে, আত্মা ও শরীর নিষ্কলুষ রাখতে।'

'ভালো তো। নিষ্কলুষ হতে পারেন আপনারা?'

'তা কী কখনো পারে মানুষ? এজন্যই তো পরম করুণাময়ের কাছে বারবার প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া।'

'আপনাদের ধর্মের মূলমন্ত্রগুলো বলবেন?'

'মন্ত্রতন্ত্রে আস্থা নেই আমাদের। এগুলো আমাদের বিশ্বাস।'

'শব্দটা হয়তো ভুল বলেছি।'

'যাহোক, আমাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর সবারই পুনরুত্থান হবে। ঐ জন্মটা অনিঃশেষ, শেষবিচারের দিন সবার পাপ ও পুণ্যের বিচার হবে, আগেও বলেছি এটা। পবিত্র দেহ ও মনে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। বছরের নির্দিষ্ট এক মাস রোজা রাখা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব রকম খাওয়া-দাওয়া, পানীয় গ্রহণ প্রভৃতি থেকে শুরু করে ইন্দ্রীয়ানুভূতি আদান প্রদান থেকে বিরত থাকা। ধনীদের জাকাত দেয়া, হজ পালন। আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা। একেবারে নতুন কোনো ধর্মবিশ্বাস না এটা। আগের নবী ও রসুলদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এ ধর্মে। ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব প্রমুখ নবীদের স্বীকার করা হয়েছে। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া কিছু অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। স্বামী বেছে নেয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয় নারীদের। উত্তরাধিকার দেয়া হয়। যে-কোনো স্তরে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সব মানুষকে দেয়া হয়। যে-কোনো পেশা গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়। মেয়েদের বিবাহপূর্ব নাম রাখার অধিকার দেয়া হয়। এরকম অনেক কিছুই, যা অন্য অনেক ধর্মে দেয়া হয় না।'

'শেষ বিচারের দিনের বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'হ্যাঁ, শেষ বিচারের মালিক আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে সবাইকে।'

'সবাইকে মানে, যারা অন্য ধর্মাবলম্বী?'

'সবাইকে মানে সবাইকে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না আরণ্য।'

'মৃত্যুর পর মানুষের দেহটা তো বিলীন হয়ে যায়, কী নিয়ে দাঁড়াবে সে?'

'দেহই কী সব আরণ্য?'

'না, আত্মা আছে। কিন্তু দেহ ছাড়া আত্মার অবস্থান কোথায়?'

'আমরা বিশ্বাস করি আত্মা অবিনশ্বর। লোহে মাহফুজ নামের একটা অবস্থানে থাকে ওটা।'

'সনাতন ধর্মেও তো বলে, ন হন্যতে, হন্যমান শরীরে।'

'ওটা আমি জানি না। যাহোক, আপনি দেহ ও আত্মার কথা বলেছিলেন। এর বাইরেও একটা অনুভবের বিষয় রয়েছে। দেহ ছাড়াও অনুভব করতে পারেন ওটা। একটা উদাহরণ দেই, আপনি জন্মেছিলেন শরীরের মধ্যখানে ছোট্ট একটা অঙ্গ নিয়ে। ওটা যে কী অনুভব দিতে পারে আপনাকে, তা একটা বয়স না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারেননি। আবার যখন বুড়ো হয়ে যাবেন ঐ অনুভব আর দিতে পারবে না ওটা। অথচ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওটা আপনার দেহেই রয়েছে। তাহলে দেহই কী সব আরণ্য?

কী জবাব দেবে এর! এ যে এক ভীষণ ধাঁধা। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকে আরণ্য। ওকে ভাবার সুযোগ দেয় সুফি। কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চায় না সে। নিজেই ভেবে বের করুক। কথার ফাঁকে ফাঁকে সুফির হাতের জপমালাটা সচল হয়। এক আশ্চর্য প্রতিভা সে। মানুষকে মোহগ্রস্ত করে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে ওর। খুব বেশিক্ষণ ভাবার সময় দেয় না ওকে। বিপরীত ভাবনা মাথায় আসার আগেই আবার মোহজাল বিস্তার করে।

'মানুষের নিষ্কলুষতার কথা বলছিলে। পৃথিবীর সব প্রান্তে সব ধর্মের মানুষের ভেতরই পাপী রয়েছে। আমার জীবন-শুরুর দিকের কাহিনি একদিন শোনাব আপনাকে, যদি সুযোগ হয়। আমাদের ধর্মের বয়স প্রায় পাঁচশো বছর। এতদিনে কোনো কলুষতা তো সমাজে থাকার কথা না। অথচ কত যে নির্মমতা এখনো টিকে রয়েছে তা বর্ণনা করে কোনোদিনও শেষ করতে পারব না। ধর্মসম্মত জীবন যাপন করার চেষ্টা হচ্ছে এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সাধনা। যতটা সম্ভব পাপমুক্ত রাখা যায় সমাজটাকে তারই সাধনা। অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা। আরব বণিকদের কাছে আপনাদের দেশের অনেক কাহিনি শুনেছি। আপনাদের ঐশ্বর্যের কথা যেমন শুনেছি, তেমনি জেনেছি যে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা কত বেশি নির্যাতিত এখানে। আপনাদের ধাঙর, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি সম্প্রদায় তথাকথিত উঁচুজাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণদের ছোঁয়া দূরে থাক, তাদের ছায়া মাড়ালেও শাস্তি পেতে হয়। ওদের জন্য ভিন্ন জলাশয়, ভিন্ন আবাস। আপনাদের মলমূত্র পরিষ্কার করে ওরা। অথচ নিজেদের থুতুও মাটিতে ফেলতে পারে না। ওটার জন্য গলায় মাটির ভাণ্ড বয়ে বেরাতে হয়। মানুষের প্রতি এ-কেমন নির্দয়তা ও অভব্য আচরণ! কল্পনা করাও কষ্টকর। এসব জেনেশুনে মনে হয়েছে আমাদের ধর্মটা প্রচারের জন্য আপনাদের দেশটা উপযুক্ত। নিজের জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুপরিজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ফেলে এখানে পড়ে রয়েছি কীসের আকর্ষণে বলুন?'

'জানি না। কিছু না কিছু তো রয়েছেই। অন্তত পরকালের বিষয়টা আপনাদের জন্য তো খুব লোভনীয়।'

'এ পথে না এসেও পরকালের পুণ্য অর্জন করতে পারতাম আরণ্য। সবাইকে একভাবে ভাবা মনে হয় ঠিক না।'

'আপনাকে আহত করে থাকলে সত্যিই দুঃখিত আমি। যাহোক, এটা হয়তো আপনার শ্রেণির মানুষজনের জন্য এক ধরনের প্রীতি। ওদের জন্য আপনার অন্তরে জেগে থাকা ভালোবাসা।'

'বিষয়টা জটিল। এটা বোঝা বা বোঝানো একটু কঠিন। মানুষ সবসময় কার্যকারণ নির্ধারণ করতে পারে না। যেখানে আমাদের চিন্তাশক্তি থেমে যায়, আমরা ওটা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেই। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আমরা মনে করি সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।'

'এটার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি হয়তো আছে।'

'নিশ্চিতভাবেই আছে। অন্তত, আমরা তো উপলব্ধি করতে পারি। মানুষের শক্তি, দৈহিক বা মানসিক, যে সীমিত এটা তো নিশ্চয় স্বীকার করেন।'

'এটা তো অস্বীকার্য নয়।'

'তাহলে অসীম শক্তির আঁধার একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে নিতে বাধা কোথায়?'

'কোনো বাধা হয়তো নেই। আপনার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'আমাদের বিশ্বাস, তিনি শুধু আমার ও আপনারই নয়, সবারই সৃষ্টিকর্তা, এক ও অনন্য। যাহোক, তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানার চেষ্টা মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে, তিনি অগম্য। তিনিই ইঙ্গিত দিয়েছেন এটা।'

'আপনাদের ধর্মে নাকি বহুগামিতা অনুমোদন করেন?'

'এটা ভুল। পুরোপুরি ভুল ব্যাখ্যা। একটু বিস্তারিত বলতে হয়। ধৈর্য থাকবে আপনার? রাত হয়েছে।'

'মন দিয়ে শুনছি সুফিবাবা, বলুন।'

'ধর্মে চারজন স্ত্রী বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু নিয়ম-কানুন আছে যা অবশ্য-পালনীয়। বলুন, চারজন স্ত্রীকেই কী সমানভাবে তৃপ্ত করা সম্ভব?'

'কেউ কী ওটা মানে, না ভাবে?'

'না মানলে ওটার শাস্তি তাকে পেতে হবে।'

'ওটা তো পরকালে।'

'আমরা বিশ্বাস করি ওটা আছে।'

'তাহলে নারীদের কেন চারজন পুরুষ নেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। আপনারা বলেন যে ধর্মটা সাম্যের।'

'তাহলে সন্তান ও উত্তরাধিকার নির্ধারণ করবেন কীভাবে?'

'একটা পথ খুঁজে নেয়া যেত। ঘুরে ঘুরে তিনমাস অথবা তিন চক্রের পরপর স্বামী বদলে।'

'দেখুন, প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কিন্তু ধর্ম না। স্বভাবগতভাবেই পুরুষেরা অসংযমী। এক নারীতে সীমিত থাকা ওদের পক্ষে কঠিন। নারীরা কিন্তু এক পুরুষে তৃপ্ত থাকতে সক্ষম। ওদের চাহিদা বেশি হলেও সংযম অনেক বেশি। একটা উদাহরণ দেই। একজন নারীর প্রতি পুরুষ সহজেই লোভী হয়ে ওঠে। এমনকি দশ পুরুষও হামলে পড়ে একজন নারীর উপর। কিন্তু কখনো শুনেছেন দশ নারী একজন পুরুষের উপর হামলে পড়েছে? চার স্ত্রীকে একজন স্বামী কিন্তু জোর করে গ্রহণ করে না। আরো স্ত্রী আছে জেনেও ওরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।'

'পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অধিকার যেখানে সীমিত সেখানে পুরুষকে হামলা করার প্রশ্নই আসে না। যদি সাম্য থাকত তাহলে নারীরাও হয়তো হামলা করত। আর ঐ বিবাহ বন্ধনে নারীরা আবদ্ধ হচ্ছে কী স্বেচ্ছায়, না অভিভাবকের ইচ্ছায়?'

'দুটোই বলতে পারেন। দেখুন, যদিও বিধানটা আছে কিন্তু ইসলামি বিশ্বে এক হাজার জনের ভেতর বোধ হয় একজন পাবেন যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে। প্রত্যেক সমাজেই ব্যতিক্রম রয়েছে। ঐসব ব্যতিক্রমী পুরুষের জন্য ওটা রাখা হয়েছে। নাহলে ওরা হয়তো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। প্রকৃতির নিয়মটাই দেখুন না, পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। পুরুষের তুলনায় চারগুণ নারী কী কোনো সমাজে রয়েছে?'

'চারজন নারী রাখা হয়তো ধনী পুরুষদের পক্ষে সম্ভব।'

'না, শারীরিক সক্ষমতা ও সমভাবে দেখার বিষয়টাও রয়েছে।'

'আপনাদের রাজাবাদশাদের হারেমের বিষয়টা বলবেন?'

'কোন ধর্মের রাজবাদশাদের ওটা নেই? আগেও বলেছি, রাজাবাদশাদের সঙ্গে ধর্মের বিষয়টা তেমন যায় না। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই মূলত ধর্মের সব প্রচেষ্টা। লক্ষ্য করেছেন কী যে প্রতিটা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই সাধারণ মানুষজন। রাজাবাদশারা কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। ওরা এগুলো ব্যবহার করে শুধু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরেকটা বিষয়, এদেশের নিপীড়িত মানুষের কাছে শান্তির ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশের মানুষকে ভালোবেসে এদেশে এসেছেন, কিন্তু আপনার ধর্মে যেসব নবী বা ধর্ম প্রচারকদের স্বীকার করেছেন বা যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা সবাই তো আপনার দেশের। এদেশেও অনেক ধর্ম আছে, ধর্ম প্রচারক আছে, সেসব ধর্মে বিশ্বাসী অনেক মানুষ আছে, আপনাদের কথিত ঐ বিশ্বজনীন ধর্মে সেসবের কোনো উল্লেখ নেই কেন? কীভাবে বুঝব যে আপনার ধর্মটা এদেশের মানুষের জন্য গ্রহণীয় হবে?'

একটু যেন ভাবনায় পড়ে সুফিসাধু। তারপর বলে, 'এটার জবাব আমার কাছে নেই আরণ্য। আমার ধর্মের ভালো দিকগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরা আমার কর্তব্য। আমি তো সর্বজ্ঞ নই। সবকিছুর জবাব আমার কাছে পাবেন না। কারণ ওসব আমি জানি না। কোনো মানুষের পক্ষে তো সব কিছু জানা সম্ভব না।'

'আর কী ভালো দিক আছে আপনার ধর্মের?'

'নারীর বিষয়টা যেহেতু তুলেছেন, ওটা বলি, আপনাদের ধর্মে বিধবাবিবাহ নেই, অনেকে আবার বিধবাকে সহমরণে বাধ্য করেন। আমরা বিধবাবিবাহে অনুমোদন দেই। বাল্যবিবাহে আমাদের অনুমোদন নেই। আপনাদের বিবাহবিচ্ছেদ নেই। যৌক্তিক কারণে আমরা ওটার অনুমোদন দেই। এছাড়া অন্য আরো অনেক বিষয়ে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আমাদের ধর্মে।'

'কীভাবে? অন্তপুরে ওদের বন্দি রেখে?'

'না, ওটা ওদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। বাইরে বেরোতে নিষেধ নেই ওদের। এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিতে পারে ওরা। শুধু পর্দা মেনে চলতে হয়।'

'কেন?'

'পুরুষদের কুনজর থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য।'

'আপনি বলেছেন নারীরা প্রকৃতিগতভাবে সংযমী। তাহলে আপনাদের পুরুষদের কিছুটা সংযমী হতে বলুন না। নারীকে না ঢেকে পুরুষদের চোখগুলোকে সংযমী হতে বলছেন না কেন? আমাদের পুরুষেরা তো নারীদের উপর হামলে পড়ে না এখানে। ওদের চলাফেরায় কোনো সমস্যা হয় না।'

'পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা ভিন্ন এখানে। আমাদের ওখানে নারীদের সংখ্যানুপাত কম। ফলে পুরুষেরা নারী স্বল্পতায় ভোগে।'

'তাহলে যে বলছেন ধর্মটা সব মানুষের জন্য? আমাদের জন্য তো তাহলে ভিন্ন নিয়ম থাকা উচিত।'

'আমি তো বলছি না যে এখুনি আমার সবটা গ্রহণ করুন। আমাদের যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো নিন। তারপর আপনারা বুঝতে পারবেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। ভালোটা ছেড়ে কেউ মন্দটা নেয় না।'

'এবার তাহলে আপনাদের মন্দ দিকটাও একটু বলুন। কোনোকিছুর সবকিছুই তো ভালো হতে পারে না।'

'আমার কাছে তো আমার সবকিছুই ভালো। আপনিই বলুন কোনটা খারাপ আমার।'

'আমি তো কিছুই জানি না এ সম্পর্কে। বলব কী করে?'

'কিছু তো জানেন নিশ্চয়।'

অবনীকে দেখিয়ে বলে আরণ্য, 'এই মানুষটা কিছু কিছু জানিয়েছে আমাকে। যা কিছু জেনেছি, ওর কাছ থেকে।'

'আশা করি ভিন্ন কিছু বলেননি তিনি।'

মন দিয়ে সবকিছু চুপচাপ শুনছিল অবনী। বেশ রাত হয়েছে। আলোচনাটা আর টেনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কারো নেই। বিষয়টা বুঝতে পারে সুফি। বলে, 'বেশ রাত হয়েছে। অন্য কোনোদিন না হয় আবার বসব আমরা। কোনো একটা মজলিসে আসার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের জন্য। ওখানে আমরা ধর্ম ব্যাখ্যা করি। আমাদের মহাগ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাই। আমাদের নবীর জীবন নিয়ে আলোচনা করি। ওসব অনুসরণ করি। জীবনের শেষে এসে একটা ভাষণ দিয়ে গেছেন তিনি। অনেক নির্দেশনা রেখে গেছেন ওখানে। আমরা বলি বিদায়-হজের ভাষণ। ওগুলো মেনে চলি আমরা। আরেকটা অনুষ্ঠান করি, আমরা বলি বাহাস। ওখানে যুক্তিতর্ক করি। শুনতে আসতে পারেন একদিন।'

এতগুলো কথা বলে একটু বিরতি দেয় সুফিসাধু। তার চোখেমুখে উজ্জ্বল দ্যুতি ফুটে ওঠে। বলে, 'সব শেষে বলি আরণ্য, আমাদের ধর্মটা মানুষের জাগতিক প্রাপ্তি থেকে আত্মিক উন্নতির মূল্য দেয় অনেক বেশি। আপনার দেহটা প্রধান নয়, আত্মাটা মূল। চোখ বন্ধ করুন একটু আরণ্য, জানি না আপনি বিবাহিত কিনা, অবিবাহিত হলে আপনার মাকে স্মরণ করুন, অথবা আপনার দয়িতকে স্মরণ করুন। দেখুন তো ওদের উপস্থিতি আপনার আত্মা অনুভব করে কিনা। ওই অনুভবটাই ভালোবাসা, ধর্মও ভালোবাসার জিনিস, আরণ্য। আপনার আত্মা যদি ওটা গ্রহণ করে, তাহলে ওটা আসবে আপনার কাছে। এখন বিদায় আরণ্য। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।'

আরণ্য অনুভব করে সত্যিই চোখ দুটো বন্ধ ওর। কাছেই রয়েছে প্রভাবতী! এত কাছে যে আত্মার ভেতর লীন হয়ে আছে ওর আত্মা! চোখ খুলতে সাহস পায় না। তাহলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলবে ওকে। তখনই সিদ্ধান্ত নেয়, আর এক মুহূর্তও না, কাল ভোরেই নৌকা ভাসাবে এখানটা ছেড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আরণ্য। আলোর দিকে ছুটে চলা পতঙ্গের মতো এখন ছুটে যেতে চায় নিজ বাসভূমে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে দমকা বাতাস। সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি। অভিজ্ঞ মাল্লা অবনী। নৌকা ভাসাতে সম্মত হয় না। আরো দুটো দিন কাটাতে হয় ঘাটে বসে। এরই মধ্যে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে আরণ্য। সুফিসাধুর ফাঁদে পা দিতে গিয়েও বেরিয়ে আসতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। লোকটা যেন জাদু জানে। কীভাবে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল ওকে! অবনীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছে যে সে হয়তো ধর্মান্তরটা গ্রহণ করে ফেলবে। কিন্তু অবনীর সমাজের ভেতর সে তো কোনো সমস্যায় নেই! এটার কোনো কারণ খুঁজে পায় না আরণ্য। হয়তো ওই সাধুর জাদুকরী প্রভাব।

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলেও জোরালো বাতাস রয়েছে। যাত্রা শুরু করতে দুদিন দেরি হলেও দক্ষিণ থেকে আসা অনুকূল বাতাস ওটা পুষিয়ে দেয়। নিজের ভেতর এখন এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে আরণ্য। লক্ষণের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চেয়ে প্রভাবতীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছে। ঐ সুফিসাধুর আশ্চর্য ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রভাবতীর অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে। অথচ যত কাছে এগিয়ে আসছে গন্তব্য, আরণ্য যেন তত পিছিয়ে যেতে চাইছে। এখন আর মুখোমুখি হতে চাইছে না প্রভাবতীর। এমনকি লক্ষণ সেনেরও না। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে আরণ্য। কিছুই ভেবে পায় না কী করবে!

এ অবস্থা থাকে না বেশি দিন। রাজধানীতে পা ফেলা মাত্র মহারাজের তলব এসে পৌঁছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় আরণ্য।

'কী বিষয় আরণ্য? কোনো সমরাভিযানে বেরিয়েছিলে?'

খোঁচাটা হজম করে আরণ্য। মাথা নিচু করে থাকে।

'তুমি যদি আর সমরাভিযানে যেতে না চাও তাহলে আমাকে বেরোতে হবে খুব শীঘ্র। সম্ভব হলে আজই। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। প্রাসাদের ভার অন্য কারো হাতে দিয়ে যে স্বস্তিতে থাকব না তুমি তা নিশ্চয় জান?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'তাহলে কি প্রস্তুতি নিতে পারি?'

'মহারাজের আদেশ প্রতি অক্ষরে পালিত হবে।'

'ঠিক আছে আরণ্য।'

'আমার একটা প্রার্থনা ছিল মহারাজ।'

'বেশ।'

'আমাকে আপনার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিন, মহারাজ।'

একটু অবাক হয় লক্ষণ। বুঝতে চেষ্টা করে কোনো কারণ আছে কিনা। রাজধানীর বাইরেই বা এত দীর্ঘদিন ছিল কেন আরণ্য? জিজ্ঞেস করে, 'বলবে, কেন এরকমটাই চাইছ?'

'অন্য কোনো কিছু নেই মহারাজ। যুদ্ধাভিযানে অংশ নেয়ার ইচ্ছা ছাড়া।'

'যে অভিযানে যেতে চাইছি তাতে কোনো যুদ্ধই হয়তো করতে হবে না।'

'মহারাজের সঙ্গে থাকতে চাইছি কিছুদিন। আমাকে মার্জনা করবেন, প্রভু।'

একটু ভাবে লক্ষণ সেন।

'তাহলে রাজধানী ও প্রাসাদের দায়িত্বে থাকবে কে?'

'আমার বিশ্বাস দুর্জয় সেন খুব ভালোভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।
'

'তাই মনে কর?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'ঠিক আছে। তাহলে আরো দুদিন সময় নাও। সবকিছু ঠিকঠিকভাবে ওকে বুঝিয়ে দাও।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ।'

'ঠিক আছে আরণ্য। অনেক দীর্ঘ যাত্রা করে এসেছ। বিশ্রাম নাও।'

লক্ষণের সামনে থেকে দ্রুত সরে আসে আরণ্য। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ছেড়ে নিজের ঘরে এসে গা এলিয়ে দেয় দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য। শারীরিকভাবে ক্লান্ত থাকার কোনো কারণ নেই ওর। কিন্তু মানসিকভাবে এত ক্লান্ত যে রাতের খাবার খেতেও ইচ্ছে হয় না। ঘুমোনোর চেষ্টা করে। সারারাত বিছানায় গড়াগড়ি করে কাটায়। কোনোভাবেই ঘুম আসে না।

যে তীব্র টানে ছুটে এসেছে আরণ্য তা যেন ধনুকের ছিলার টান হয়ে বাতাসে ভেঙে পড়বে যে-কোনো মুহূর্তে আর একটা সরল শরের মতো ছুটে যাবে সে সামনে, অজানা দূরত্বে। প্রচণ্ড শক্তিতে ঐ ইচ্ছাটাকে আকর্ষণ করছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিজের দিকে। এখন আঙ্গুলের বাঁধন একটু ঢিলে হলেই তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে যাবে। এখন কিছু সময় অন্তত ওটা ধরে রাখতে চায় আরণ্য। প্রভাবতীর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে। এভাবে চলতে পারে না। আত্মায় ক্ষত রেখে শরীর সুস্থ থাকতে পারে না। মনে পড়ে আবার ওই সুফিসাধুর কথা। সকালে বেরিয়ে আসার সময় আরণ্যের কাঁধে হাত রেখে অনেক কিছু বলেছিল সে। এখন বুঝতে পারে ওসবের ভেতর এক অতি সরল আন্তরিকতা ছিল। নিখাদ ভালোবাসা ছিল। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা!

'তোমার আত্মাকে নিষ্কলুষ রাখার চেষ্টা করো আরণ্য। তাহলে শরীরের পবিত্রতার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করবে। শরীরের চাহিদা সীমিত, আত্মার অসীম। শরীরের জন্য আত্মার অবমাননা করো না। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে আরণ্য। তুমি বিচক্ষণ। এসবই বোঝ। বলার প্রয়োজন নেই আমার। মনে কর তোমার এক ভাই হিসেবে বিষয়টা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। যদি কখনো তোমার আত্মা বিচলিত হয়, আমাকে মনে করো। আমার ধর্মটা নেয়ার জন্য কখনো বলব না তোমাকে। আমার ধর্মও বলে না ওটা। তোমার ধর্ম তোমার, আর আমারটা আমার। আমাদের দুজন যে-দুধর্মে জন্ম নিয়েছি তাতে আমাদের কোনো হাত ছিল? কিংবা আমাদের পিতামাতার? সবই ঐ সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে। আমরা নিজেরা তো সৃষ্টি করিনি আমাদের। যে ধর্মেরই হও না কেন তুমি, আত্মার স্বরূপ সন্ধান করো। তাহলেই সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাবে। অন্তরে ভালোবাসা রেখ। আমারও দুটো পুত্র আছে আরণ্য। একটি তোমার কাছাকাছি বয়সের। ওদের জন্য আমার অন্তর কাঁদে। সবসময় দোয়া করি ওদের জন্য। তোমার জন্যও আমি দোয়া করব আরণ্য। তোমার চিত্ত যেন শান্ত থাকে। চিত্তকে শান্ত রাখাই হচ্ছে সাধনার মূল।'

আরণ্যের কাঁধে হাত রেখে পরম মমতায় অনেক কিছু বলেছিল সাধুবাবা। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আরণ্য জানে ওসবের প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য কখনো না কখনো ওর মনে পড়বে।

'তোমাকে ভালো লাগার একটা বিশেষ কারণ, লক্ষ্য করেছি, তোমার ভেতর জানিবার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসাটা আছে। এটা মানুষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আরণ্য। এত বছর ধরে আছি এখানে, এভাবে কেউ প্রশ্ন করেনি আমাকে। যা বলেছি, শুধু কান পেতে শুনেছে, অনেক কিছু গ্রহণও করেছে। এটা হতে পারে যে ওদের অন্তরে জানার ইচ্ছা বলে কোনো কিছু আর নেই। কিছু মনে করো না আরণ্য, শতশত বছর ধরে তোমাদের ক্ষত্রিয় প্রভুদের কৃপাণের আঘাত আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তন্ত্রমন্ত্রের নিষ্পেষণে উপরের দিকে মাথা তুলে তাকাতেই পারেনি ওরা, মুখ খুলবে কী করে। ওদের জন্য সত্যিই এক অনিরমেয় ক্ষত তৈরি হয়েছে আমার অন্তরে। আমি জানি ওদের অন্তরেও রয়েছে এক সুগভীর

ক্ষত। মানুষের জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় আর কী থাকতে পারে আরণ্য। এই যে এখানে স্বজন ও রক্তসম্পর্কীয় মানুষজন ছাড়া পড়ে রয়েছি, তা কীসের আকর্ষণে! আমাকে কি কেউ বাধ্য করেছে? আমি মনে করি এটাই পরমপ্রভু আমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখানের এই ব্রাত্যজনেরাই আমার স্বজন। ওরাই আমার আত্মার আত্মীয়। যদি সামান্যও কিছু করতে পারি ওদের জন্য তাহলেই যেন আমার আত্মার মুক্তি ঘটবে। ওইসব রাজরাজরার অত্যাচার, আগ্রাসন, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, এরকম অনেক অত্যাচার ও অনাচারের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে। যথাসাধ্য জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি আরণ্য। ওরা আমার স্বধর্মী হলেও দয়া করে ওদের সঙ্গে মিলিও না আমাকে। ওই সব অত্যাচারীকে জোর করে ধর্মের পথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতিগতভাবে মধ্য এশিয়ার শক, হুন এসব গোত্র যুদ্ধবাজ। ওরা খুব পরাক্রমশালী। ওদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য ওদের উপর ধর্মের দিক থেকে কিছুটা বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। ধর্মটা ওরা নিয়েছে ঠিকই কিন্তু ওদের চরিত্র বদলায়নি। ওরকম অনাচার কোনোভাবেই ধর্ম অনুমোদন করে না। এটা ধর্মের দোষ নয়। দোষ ওই মানুষগুলোর। ওরা যদি ওই ধর্মটাকে না নিত তাহলেও একাজগুলো করত। নিজেদের দেশে খুনোখুনি করে মরার চেয়ে অন্য একটা দেশ, বিশেষ করে এই ভারতবর্ষের মতো বিশাল ও সমৃদ্ধশালী একটা দেশ যখন আত্মকলহে লিপ্ত তখন একটা ভালো সুযোগের সন্ধান ও সদ্ব্যবহার করাই লোভনীয় মনে করেছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা। সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। ওদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। আমি বা আমার মতো যারা এসেছি তারা কি কোনো সম্পদ লুণ্ঠন করেছি আরণ্য?'

আরণ্যের কাছে কোনো জবাব ছিল না এ প্রশ্নের। তখন বুঝতে পারেনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা শুনে গেছিল সে ওই সাধুর। এখন মনে করতে পারে সব। সামনে হয়তো আরো অনেককিছু মনে করতে পারবে। একান্তে ডেকে নিয়ে কথাগুলো বলেছিল সুফিসাধু। একটা পাত্রে কিছু খেজুর আর এক গ্লাস জল খেতে দিয়েছিল। ওই খেজুরগুলো কী মন্ত্রপূত ছিল? আরণ্য শুনেছে এই সব সাধুরা অনেক তুকতাকও জানে। বিষয়টা সেই পরিষ্কার করেছিল, বুঝতে পারেনি তখন আরণ্য।

'অনেকে মনে করে আমি তুকতাক জানি, জাদুটোনা করি। বিষয়টা একেবারে মিথ্যা। আত্মার শক্তির কথা বলেছিলাম তোমাকে, লক্ষ্য করেছ, অসুস্থ কারো শিয়রে বৈদ্য গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র ওর অর্ধেকটা অসুস্থতা ভালো হয়ে যায়। তারও অর্ধেকটা ওর শরীরে হাত রাখার পর ও মুখে বলার পর যে ওটা কোনো অসুখই না। চিকিৎসা করতে হয় শুধু সিকিভাগের। এখানেই হচ্ছে আত্মার শক্তি। শরীরটাকে চালায় আত্মা। ওটা যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীর স্বাভাবিকভাবেই শক্তি ফিরে পায়। যত রোগবালাই আছে তার প্রায় সবই প্রাকৃতিক নিয়মে ভালো হয়ে যায়। খুব সামান্য কিছু রোগ আছে যার জন্য বৈদ্যের প্রয়োজন। আমার কাছে অনেকে আসে রোগবালাই নিয়ে। আল্লাহ্‌র কালাম পড়ে পানিতে ফু দিয়ে ফিরিয়ে দেই ওদের। দুদিন পর খুশি মনে ফিরে আসে ওরা। কাজ করে কিন্তু ওদের ঐ আত্মার শক্তিটা। জলের কোনো ভূমিকা নেই এখানে। কিছু কিছু কবিরাজি অবশ্য শিখে নিয়েছি। নিজের জন্যই শিখতে হয়েছিল। আমাদের ওখানে অসুখ-বিসুখ হলে ভেষজ চিকিৎসা আছে। এখানে এসে একবার অসুস্থ হওয়ার পর তোমাদের কবিরাজ ডাকতে হয়েছিল। এরপর নিজেই ওটা শিখে নিয়েছি। আমার আস্তানার আশেপাশে যে বনজঙ্গল দেখছ, ওখানে অসংখ্য ভেষজ গাছপালা আছে। ওগুলো থেকে বটি বানিয়ে ওদের দেই। ভালো হয়ে ভাবে ওগুলোয় তুকতাকও আছে। অনেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা শুনি। যতদূর সম্ভব সুপরামর্শ দেই ওদের। ওতে কাজ হয়। এসবের কারণে আমার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এখানে কোনো বুজরুকি নেই আরণ্য। কোনো প্রতারণা নেই। মানুষকে সহজ ও সরল পথে চলার পরামর্শ দেই। আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র এটা। সহজ ও সরল জীবন যাপন। ঐ রাজরাজারা শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মের প্রসার নয়, ক্ষতি করেছে। ধর্মের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেছে। তোমার যদি কখনো সময় হয়, এসো। আমার ধর্মেও ভিন্নভিন্ন মতবাদ আছে, বিভাজন আছে। বিতর্ক আছে। ঐসব রাজরাজারা ওদের লুটতরাজ চালানোর জন্য ধর্মটাকে ব্যবহার করছে শুধু। আমাদের অনেক জ্ঞানী ও গুণী সাধকদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে ওদের হাত থেকে। অনেককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে ওরা। বিশ্বাস করা যায়? তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি এসব। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভেতর কোনো প্রতারণা নেই। রাজার চর নও তুমি। আমাকেও এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে আরণ্য। চরম দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে পরিবার পরিজন ফেলে চলে আসতে হয়েছে জীবন বাঁচানোর তাগিদে। আমাদের রাজাবাদশারা লুটতরাজ করে সাধারণ মানুষজনদের যদি কিছু দিত তাহলে তো আমাদের ওই দারিদ্র্যের ভেতর থাকতে হতো না। অন্য দেশের সম্পদ যেমন লুট করে ওরা, নিজেদের দেশের সম্পদও তাই করে। যে-ধর্মেরই হোক না কেন ওই জনগণ। তাহলে বল, ওদের লুটতরাজের দায় আমাদের ধর্মটাকে নিতে হবে কেন?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুফিসাধু। আরণ্যেরও কিছু বলার নেই। আবার শুরু করে সে, 'এখন এদেশটাকেই ভালোবেসে ফেলেছি আরণ্য। পরমপ্রভুর কাছে মানুষ প্রার্থনা করে মৃত্যুর পর তাকে যেন নিজের বাসভূমিতে, নিজের দেশে সমাহিত করা হয়। কিন্তু আমি প্রার্থনা করি এদেশেই যেন আমার জীবনের অবসান ঘটে। এখানেই যেন কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতে পারি। মানুষের কোনো

দেশ নেই আরণ্য। কোনো স্বজন নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, চিরশত্রু নেই, চিরবন্ধু নেই, সবই পরিবর্তনশীল। মানুষ কেবলই মানুষ। এর চেয়ে বড় কোনো পরিচয় নেই। এই মানুষটার জন্যই অন্তরে ভালোবাসার জন্ম দিও, আরণ্য। এখন যাও। আমি প্রার্থনা করব তোমার জন্য। তুমিও প্রার্থনা করো। সর্বপ্রভু মঙ্গল করুন তোমার।'

একেবারে থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আরণ্য। আর বেশি কিছু শুনতে চায়ওনি। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত চলে এসেছে। ঘাটে এসে দেখে ফিরে এসে অবনী ঘুমিয়ে পড়েছে নৌকার ভেতর।

সারারাত নিঘুম কাটিয়ে এবার শরীরেও ক্লান্তি অনুভব করে আরণ্য। যাক, দুটো দিন পাওয়া গেছে লক্ষণের কাছ থেকে। মানসিক অবসাদটা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবে আরণ্য।

প্রভাবতী আর এক দিন সময়ও দেয় না ওকে। সাতসকালে ওর দূত এসে দাঁড়ায় সামনে। প্রাসাদের ভেতর অপেক্ষায় রয়েছে প্রভাবতী। মানসিক এই টানাপোড়েনের ভেতর একটা কবিতা এসে ভর করে মাথায়। একটু অবাক হয় আরণ্য। সুফিসাধুর পরামর্শ অনুযায়ী নিজেকে জানার চেষ্টা করে। সে কী লক্ষণের একজন সৈনিক, না কবি, না প্রেমিক, না ধর্মোপাসক? নিজের এই বিভিন্ন সত্তার ভেতর হারিয়ে ফেলে নিজেকে। কবিতাটা হারিয়ে যাওয়ার আগে মাথার ভেতর তৈরি করে ফেলে। একখণ্ড তুলোট কাগজে লিখে ফেলে ওটা। প্রভাবতীর জন্য নিয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো উপহার হয়তো এটাই হতে পারে।

মনের সঙ্গে অনেকটা বোঝাপড়া করে প্রভাবতীর সামনে এসে দাঁড়ায় আরণ্য। ওর থমথমে মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারে প্রভাবতী তৈরি হয়ে রয়েছে। প্রাথমিক কুশলাদির পর আসল কথায় আসে।

'তুমি কী আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছ আরণ্য?'

এটার জবাব তো সত্যিই তাই। একটু ইতস্ততার ভেতর কাটায় আরণ্য। আবার চাপ দেয় প্রভাবতী।

'কিছু বলছ না কেন?'

'বলতে পারছি না প্রভাবতী। বুঝতে পারছ না কেন?'

'কেন দূরে সরে যেতে চাইছ, বলো।'

'বললে বুঝবে তুমি?'

'আমার বয়স হয়েছে আরণ্য। বিয়ের বয়সে বিয়ে করলে এখন বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকত আমার। বুঝব না কেন বলো, শুধু আবেগের বশে কিছু চাইছি না তো এখন আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তো ভালোই। একটু বোঝার চেষ্টা কর, তোমার সঙ্গে আমার কিছু হতে পারে না প্রভা।'

'কেন হতে পারে না?'

'জীবনকে ভালোবাসি আমি, প্রভাবতী।'

'আমাকে বাসো না?'

'তাও বাসি। কিন্তু জীবন হারাতে ভয় পাই। আমি ভীতু। আমাকে ক্ষমা কর প্রভাবতী।'

নিশ্চল এক প্রতিমার মতো চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকে প্রভাবতী। অনেক কিছু ভাবে। ভেতরে যে ভয়াবহ ঝড় বয়ে চলেছে, বুঝতে পারে আরণ্য। একসময় ঐ নীরবতা ভেঙে প্রভাবতী বলে, 'তুমি জীবন ভালোবাসো। ঠিক আছে আরণ্য, ভালোবাসো। জীবন ভালোবাসো। আমাকেই সরে যেতে হবে জীবন থেকে দূরে। যেখানে হয়তো কোনো ভালোবাসাই নেই।'

'না প্রভাবতী, তুমি মহারাজের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। আমার মতো পথের ধুলোকে জীবন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেল। জীবনের পথ চলায় কত পথই তো অতিক্রম করতে হয়। মানুষ কী পথের ধুলো পায়ে জমিয়ে রাখে, না ধুয়ে ফেলে?'

'নিজেকে এত ছোট ভাব কেন?'

'আমার ভাবাভাবিতে জগতের কিছু যে আসে যায় না, প্রভাবতী।'

'একটু আগে একটা প্রতিজ্ঞা করলাম, আরণ্য।'

'কী?'

'ওটা বলতে চাই না।'

দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গভীরতায় ডুবে থেকে বুঝতে পারে আরণ্য যে প্রভাবতী কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ও যা বলে তাই বোঝায়। কোনো প্রতিবাদ করে না আরণ্য। বলে, 'এটা একটু বাড়াবাড়ি তোমার প্রভা, জীবন খুব অমূল্য। কোনো কিছুর জন্যই এটা নিয়ে আবেগাকুল হওয়া ঠিক না।'

'তাই যদি হয়, ঠিক আছে, আমার সিদ্ধান্ত আমারই।'

আবার চুপ করে থাকে দুজনেই। তারপর আরণ্য বলে, 'একটু সময় দাও আমাকে, প্রভা।'

আরণ্য ভাবে যে আরও কিছু সময় দূরে থাকলে ধীরে ধীরে স্মৃতি থেকে মুছে যাবে সে। মাসের পর মাস পেরিয়ে যায়। প্রভাবতীর অস্থিরতা আরও বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নেয় পালিয়ে যাওয়ার। এক অন্ধকার রাত্রিতে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে।

আকাশের তারাদের সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। মন্দিরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক মন্ত্রপাঠ সেরে নেয়। দুর্ভাগ্য ওদের, কদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যায়। বিয়ে

করার বিষয়টা গোপন রাখে রাজপরিবার। তাড়াতাড়ি দক্ষিণদেশীয় এক সেনাপতির কাছে বিয়ে দিয়ে দেয় প্রভাবতীকে।

লক্ষণ সেনের কাছে পুরো বিষয়টা খুলে বলে আরণ্য। ওখানে যে ওর হাত খুব বেশি শক্তিশালী ছিল না তা বোঝাতে পারে ভালোভাবেই। বিষয়টা আপাতত ক্ষমা করে দেয় লক্ষণ। একই পাপের জন্য দুজনকে তো আর ভিন্ন শাস্তি দেয়া যায় না। তাছাড়া, প্রভাবতী ওর দিদি হলেও আরণ্য ওর সহোদরের চেয়ে কম না।

আরণ্যের সহজসরল আন্তরিকতা ওর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের থেকেও অনেক বেশি জোরালো। প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীর দায়িত্ব ও লক্ষণের ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর দায়িত্ব, এ দুটো থেকেই সরিয়ে দেয় ওকে। কয়েকদিন পর ওকে ডেকে বলে, 'যুদ্ধাভিযানেই তো যেতে চেয়েছিলে তুমি আরণ্য। গহরবাল সীমান্তে কিছু ছোটখাটো সমস্যা হচ্ছে আমাদের। যদি পার ওসব সামলে ক জঙ্গলের ধারে কাছে একটা শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত কর যেন যে-কোনো অবস্থায় যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। আমাদের নৌবাহিনী যতটা শক্তিশালী, পদাতিক সৈন্যরা ততটা নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। তোমার জন্য এটা আশানুরূপ হবে আশা করি।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

আর একটা কথাও না বাড়িয়ে লক্ষণের সামনে থেকে সরে আসে আরণ্য। দুচোখে ওর লজ্জার কলঙ্কভার। প্রেমের ফাঁদে পড়ে এমন এক বালকসুলভ কাজ কীভাবে করল আরণ্য! আরো কুড়িবছর আগে যদি পালিয়ে যেত, তাহলে হয়তো এমন মনে হতো না। প্রভাবতীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক তো তারও আগের।

ওকে যে নির্বাসনে পাঠাল লক্ষণ এটা বুঝতে পারে আরণ্য। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। ওর জীবনের সঙ্গে যে-চারটা অনুষঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আবাল্য বন্ধু ও সখা লক্ষণ সেন, প্রিয় প্রভাবতী, জীবনে বেঁচে থাকার অনিবার্য অবলম্বন হিসেবে কবিতা, ও সম্প্রতি যোগ হওয়া সুফিসাধু, এর সব কটা থেকে দূরে সরে যেতে পারবে সে।

প্রায় হপ্তাখানেক লেগে যায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানী থেকে বেরিয়ে যেতে। দুহপ্তার পথ পেরোনোর পর লক্ষণের দূত এসে ধরে ফেলে ওদের। মহারাজাধিরাজের আদেশ, এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার ভেতর দিনগুলো কাটিয়ে দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসে আরণ্য। এসে যা শুনে তাতে আরও ভড়কে যায়।

প্রভাবতীর স্বামী দক্ষিণে ফিরে গেছে ওকে ফেলে রেখে। প্রভাবতী এখন লক্ষণের কাছে অনুমতি চাইছে কোনো মন্দিরের সেবাদাসী হতে। অবশিষ্ট জীবন সে ধর্মের সেবা করে কাটাতে চায়। কিন্তু এটার অনুমতি তো দিতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না লক্ষণ। পালিয়ে যাওয়ার যে-কাজটা ওরা করেছিল গোপনে, এখন লক্ষণ পরামর্শ দেয় ওটাই আবার ওকে জানিয়ে সম্পন্ন করতে।

রাজ পরিবারের এমন একটা কলঙ্ক প্রকাশ পেতে দিতে পারে না ওরা। সবাইকে জানিয়ে দেবে যে প্রভাবতী স্বামীর দেশে চলে গেছে। এমন কোনো দূরদেশে আরণ্য যেন ওকে নিয়ে যায় যা কোনোদিনও জানতে পারবে না কেউ। তাহলে রাজপরিবারের সম্মান রক্ষা ও প্রভাবতীর ইচ্ছা পূরণ, দুটোই হয়। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় আরণ্য। লক্ষণকে ওর সম্মতির বিষয়টা জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলে।

পরের হপ্তায় যাত্রা করে ওরা। নৌকায় বসে আরও বড় এক চমক নিয়ে আসে ওর জন্য প্রভাবতী। আরণ্যের সন্তান ধারণ করছে সে। দক্ষিণের ওই সেনাপতির কাছে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হলেও ওর শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি ওকে। এজন্যই ওকে ছেড়ে চলে গেছে সে।

সংবাদটা আনন্দ ও উৎকণ্ঠা, দুটোই নিয়ে আসে একসঙ্গে। প্রভাবতীকে নিয়ে গোপন জায়গায় যাওয়ার বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করতে হয়নি ওকে। সুফিসাধু ওকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল যে, যে-কোনো দুর্ভাবনায় যেন ওর শরণাপন্ন হয়। এর চেয়ে বড় সঙ্কট আর কী হতে পারে! আরণ্যদের নৌকা দ্রুত এগিয়ে চলে ওই অভয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে।

সুফিসাধুর আস্তানায় পৌঁছে এক ধরনের নির্ভরতা অনুভব করে আরণ্য। যেন অনেক হালকা হয়ে গেছে ওর ঐ কঠিন বোঝা। সবকিছু শুনেসুফি সাধু বলে, 'কিছু ভেব না আরণ্য, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। ঠিক হয়ে যাবে সব, আশা করি।' এভাবে কয়েকদিন কাটানোর পর বিষয়গুলো যখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে আরণ্যের সঙ্গে আলোচনায় বসে সুফিসাধু।

'তোমরা কী ধর্মমতে বিয়ে করেছ আরণ্য।'

'হ্যাঁ, সাধুবাবা। মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেছি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এখানে যে কিছু নিয়ম কানুন আছে, ওসব আমাদের মেনে চলতে হয়।'

'ঠিক আছে। চেষ্টা করব নিশ্চয়।'

'চেষ্টা করব নয় আরণ্য। এসব মেনে চলতে আমরা বাধ্য। কারণ এমনটাই আমাদের মহাপ্রভুর নির্দেশ।'

একটু যেন হোঁচট খায় আরণ্য।

'যেমন?'

'তোমাদের জন্য একটা বাসস্থান বানিয়ে নেবে এখানে। কিন্তু প্রভাবতীকে অন্তপুরে থাকতে হবে। অন্য কোনো পুরুষের সামনে আসতে পারবে না সে।'

'কেন সুফিবাবা?'

'এমনটাই আমাদের বিধান।'

'মেয়েদের বন্দি করে রাখা না এটা?'

'না, তা নয়। মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য এটা।'

'এদেশে মেয়েরা কি নিরাপদ না?'

'তোমার সঙ্গে এটা নিয়ে তর্কে যাচ্ছি না আরণ্য। অনেক ভেবেই এটা করা হয়েছে। অন্তপুরে ওরা বন্দি না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওদের নিজস্ব জগৎ রয়েছে। রাতে স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক জগৎ আর দিনে অন্যান্য নারী ও ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে পারিবারিক জগৎ। পুরুষের জগৎটা হচ্ছে বাইরের। উপার্জনের জন্য দিনের সময়টা বাইরে কাটাবে ওরা।

নারী ও পুরুষের জগৎটাকে দুভাগ করে নিয়েছি আমরা। এতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। নারীরাও সুখি এতে। এটা খুশি মনেই মেনে নিয়েছে। এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করে। বন্দি মনে করে না নিজেদের। প্রভাবতী কিছুদিন থাকুক অন্তপুরে। তারপর নিজেই জিজ্ঞেস কর ওকে।'

'এটা ভালো মনে হচ্ছে না আমার কাছে সুফিবাবা। একেবারে আদিমযুগের জন্য এমন কোনো প্রথা হয়তো ভাবা যেত। মানুষ এগিয়েছে কিছুটা।'

'নারীরা যে একেবারেই বাইরে আসতে পারবে না, তা কিন্তু না। যদি আসতে হয় তাহলে শরীর ঢেকে আসতে পারে।'

'শরীর তো পুরুষেরাও ঢাকে। নারীর জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন?'

'আগেও বোধহয় তোমাকে বলেছি, পুরুষের লোভী চোখ থেকে ওদের বাঁচানোর জন্য। পুরুষদের সংযম কম, ওরা আগ্রাসী। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর। যদি বিপরীতটা হতো, তাহলে হয়তো নারীদের ভয়ে পুরুষদের আচ্ছাদনের ভেতর থাকার বিধান দেয়া হতো।'

'নারীকে না ঢেকে পুরুষের লোভী চোখ নিয়ন্ত্রণ করার বিধান দেয়া হয়নি কেন?'

'সম্ভব হলে ওটাই করা হতো আরণ্য। তাছাড়া, একেবারে যে কোনোকিছু নেই, তাও না। ধর্মটাকে জানলে, ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবে আশা করি।'

'যাহোক, সুফিবাবা, এটা মেনে নিতে পারলাম না। এদেশের পুরুষেরা এত নারীলোভী ও আগ্রাসী না। এখানে নারীরা অনেক নিরাপদ।'

'হয়তো। এবং সহজলভ্য। কিন্তু এ বিধানটা তো আমার নয়। এখানে কিছু করতে পারব না, আরণ্য।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে আরণ্য। আর কিছু তো করার নেই। বলে, 'ঠিক আছে, সুফিবাবা, আমাদের জন্য ব্যবস্থা করুন।'

দিনসাতেক এখানে থেকে হাঁপিয়ে ওঠে আরণ্য। এখানে জীবন যাপন করে কীভাবে মানুষ! প্রভাবতী হয়তো মেনে নিয়েছে বিষয়টা। আরণ্যকে পাওয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো ওর জন্য সব পাওয়া। রাজধানীতে ফিরে আসে আবার আরণ্য। মন পড়ে থাকে প্রভাবতীর অন্তপুরে।

সৈন্যদল প্রস্তুত করে আবার ক জঙ্গলের পথে যাত্রা শুরু করে আরণ্য। প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া আর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সৈন্য পরিচালনা কখনো এক নয়। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততার ভেতর থাকে সব সময়। বিষয়টা হয়তো বুঝতে পেরেছিল লক্ষণ সেন। সৈন্যদলের সহ অধিনায়ক হিসেবে যাকে সঙ্গে দিয়েছে সে খুব বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। ওর সহায়তায় বিষয়গুলো উতরে যায় আরণ্য।

ক জঙ্গলে পৌঁছে কিছুটা বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয় ওরা। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আগে ছিল না আরণ্যের। ফলে পদে পদে হোঁচট খায়। এখানকার লোকালয়গুলোয় বৌদ্ধধর্মের মানুষের প্রাধান্য। মাঝে মাঝে হিন্দু গ্রাম আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে ক্ষেত্রজীবী সম্প্রদায় আছে কিন্তু মৎস্যজীবী নেই। ওদের ধর্মে যেহেতু প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ তাই ওরা মাছও ধরে না। খেতে আপত্তি নেই। ওদের রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করে কীভাবে, বুঝে উঠতে পারে না আরণ্য। শত্রুহত্যা না করে কী যুদ্ধ করা যায়! সুফিসাধুর কথাটা মনে পড়ে।

রাজাদের কোনো ধর্ম নেই, রাজত্বই ওদের একমাত্র ধর্ম। কথাটার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারে এখন। বৌদ্ধভিক্ষুরা এখানে ত্রিপিটক পাঠ ও অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তন্ত্রমন্ত্র সাধনায় ডুবে রয়েছে। আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা মহাব্যস্ত মহান আর্যধর্মের রক্ষণাবেক্ষণে। মাঝখান থেকে ছোট বড় সামন্তপ্রভুরা অন্তজ মানুষদের রক্ত শুষে ঝাড়েবংশে বেড়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের মনে কোনো শান্তি নেই। জনজীবনে নিরাপত্তা নেই। পেশাদার ডাকাতদলের অত্যাচারে প্রায় সব শ্রেণির মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ওদের রক্ষা করার কেউ নেই।

সুফিসাধুর প্রভাব কিছুটা কাজ করতে থাকে আরণ্যের মনের গভীরে। এসব নির্যাতিত মানুষের জন্য কিছু একটা করা যায় কিনা ভাবতে থাকে। ক জঙ্গলের পুব দিকে গড়ীদ্বারে এসে একটা শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। লক্ষণ সেনের কাছ থেকে এজন্য অনুমতি সংগ্রহ করে সেনাদল প্রস্তুত করায় মন প্রাণ ঢেলে দেয় আরণ্য। দুর্বল ও নিরীহ জনগণের জন্য কিছু করতে হলে নিজেকে অবশ্যই শক্তিশালী করে তুলতে হবে। দুর্বল দুর্বলকে আরও দুর্বলই করতে পারে। ওদের জন্য ভালো কিছু করতে পারে না। এটা বুঝতে পেরে অন্য সবকিছু ভুলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরণ্য।

১২

যুদ্ধবিদ্যা ও কাব্যকলা, বিপরীতধর্মী এই দুই ধারার চর্চা পাশাপাশি চালিয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব নিজেই ভেবে পায় না লক্ষণ। ভেতরের কবিমন যখন ললিতকলার কোমল আলিম্পনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ঠিক তখনই হয়তো রাজ্যের প্রয়োজনে বাজিয়ে দিতে হয় রণডঙ্কা। স্বাভাবিকভাবেই সেনদের ভেতর মিশেছে দুই ধারার বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণের জাতচরিত্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল। আবার ভৌগোলিক প্রভাবও রয়েছে এদের ভেতর। কর্ণাটের জলহাওয়ার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জলহাওয়ার পার্থক্য, মানুষজনের বিপরীত চরিত্র, খাদ্যাভ্যাসে ভিন্নতা, এসব মিলেমিশে লক্ষণের ভেতর এক অদ্ভুত মিশ্রণ গড়ে উঠেছে।

জীবনের এতগুলো বছর কখন কেটে গেছে, বার্ধক্যের দুয়ারে পৌঁছে গেছে কীভাবে, দামোদর তীরে বসে ভাবতে চেষ্টা করে সে। পূর্বপুরুষ সামন্ত সেনের গড়া আশ্রমটার চিহ্ন এখনও রয়েছে রাঢ় অঞ্চলের লালমাটির এই দেশে। যুদ্ধে যুদ্ধে ক্লান্ত লক্ষণ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে অবসর বিনোদনের জন্য তাঁবু ফেলেছে এখানে। আগামী বর্ষামৌসুম পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে। মনের ভেতর শান্তি আনতে পারছে না কোনোভাবে। পশ্চিম থেকে ঘোরি যেভাবে থাবা বিস্তার করেছে পুবদিকে তা কোথায় এসে থামবে কে জানে। পালরাজ্য এখন পুরোপুরি ধ্বংসের অতলে নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। রাজ্য বাঁচাতে মহীপাল কিছুটা চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাজ্যের ভেতরে ছোট ছোট রাজাদের লোভ ও অন্তর্কোন্দলে তা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে।

ইরানি-তুর্কি আক্রমণকারীদের বিপক্ষে ভারত হতে কার্যকর কোনো রাষ্ট্রসংঘও তৈরি হচ্ছে না। এমনকি পালরাও ওই সংঘশক্তিতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। দক্ষিণের চোলরাজা ও পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার রাজাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিমুখী সংঘর্ষে ভারতবর্ষের কেউই তেমন শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। একমাত্র দেবপালের সময় গৌড় বা বাংলা-মগধ সাম্রাজ্য কনৌজ থেকে উৎকল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ওই সাম্রাজ্যটা পালদের পরবর্তী রাজারা আর ধরে রাখতে পারেনি। এটার কারণও দক্ষিণের রাজাদের অকারণ আক্রমণ। এরা উত্তরে এসে পালরাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পালদের পরাজিত করে, বা না করে, আবার দক্ষিণে ফিরে গেছে। এভাবে পালরাজাদের দুর্বল করে না তুললে বিধর্মী তুর্কিদের কোনোভাবেই সাহস হতো না পালরাজ্য আক্রমণ করার।

গৌড়ের সিংহাসনে এ রকম দুর্বল রাজাদের অধিষ্ঠিত রাখাও বিপদজনক। গৌড়রাজ্য নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেয়ার জন্য মনস্থির করে লক্ষণ। আগে থেকেই মগধ ও মিথিলা সেনদের করায়ত্তে আছে। গহরবাল রাজ্যটাকে নিজেদের আওতায় এনে পশ্চিম দিকে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় মনে মনে। কিন্তু রাজ্যের ভেতরে ছোট ছোট রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে এখন। রাজ্যশক্তির একটা বড় অংশ ব্যয়িত হয় এদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। বাইরের শত্রুর আক্রমণ দমন করবে কখন! পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসও ডেকে এনেছে এই ঘরের শত্রু বিভীষণেরা।

আরণ্যকে স্থায়ীভাবে গঢ়ীদ্বারে বসাতে পেরে মনের ভেতর কিছুটা স্বস্তি বোধ করে লক্ষণ সেন। কবিস্বভাবের আরণ্য সব সময় ছিল ভাবুক প্রকৃতির। মাঝখানে প্রভাবতীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে কিছুটা উত্তাল ও অস্থির হয়ে ছিল কয়েকটা বছর। ওই উন্মাদনায় এখন ভাটা পড়েছে। কোনো কিছুই গোপন করেনি ওর কাছে আরণ্য। লক্ষণও মেনে নিয়েছে এসব।

গঢ়ীদ্বারে শক্তিশালী একটা সেনাচৌকিই শুধু গড়ে তোলেনি আরণ্য, এখানের অত্যাচারী সামন্তদেরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলটায় পেশাগতভাবে গড়ে ওঠা দস্যুদলকেও অনেকাংশে সামলাতে পেরেছে। স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। মনের ভেতর অনেক দুঃখ দানা বেধে আছে ওর। এত বড় সেনরাজ্য অথচ এখানে বঙ্গদেশের কোনো সৈনিক নেই বললেই চলে। বড়জোর লাঠিয়াল হতে জানে ওরা, যা দিয়ে স্থানীয় সামন্ত জমিদারের কাজ হয়তো চলে। কিন্তু রাজার সৈনিকের কাজ চলে না। এটার কোনো কারণ খুঁজে বের করতে পারে না আরণ্য। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি কখনো সুযোগ আসে, বঙ্গসেনা নামে একটা যোদ্ধাদল তৈরি করবে ভাটিবাংলার মানুষদের নিয়ে। কারো না কারো তো এটা করতে হবে! জন্মভূমির জন্য যুদ্ধটা নিজেদেরই করতে হয়। তা

নাহলে বারবার পরাজিত ও হাতবদল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এটার কোনো বিকল্প নেই সম্ভবত।

পশ্চিমের হানাদারদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করতে হলে গৌড়ের প্রবেশপথ গঢ়ীদ্বারকে শক্তিশালী রাখতে হবে। এ দায়িত্বটা ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে আরণ্য। গঢ়ীদ্বার নিয়ে লক্ষণের ভাবনা কিছুটা কমেছে। গহরবাল রাজ্যটাকে এখন আর পরোয়া করে না লক্ষণ সেন। পশ্চিমের আগ্রাসনের ভাবনা যদি না থাকত তাহলে হয়তো তাম্রলিপ্তি, গহরবাল প্রভৃতি রাজ্য স্থায়ীভাবে নিজের রাজ্যভুক্ত করে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন প্রস্তুতি নিতে হবে পশ্চিমের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। দূতেরা যেসব খবর নিয়ে আসছে তাতে চিন্তিত না হয়ে থাকা যায় না। কিন্তু এসবের প্রতি পিতাজি মহারাজাধিরাজের কোনো ভ্রুক্ষেপ আছে কিনা বুঝতে পারে না।

রাজ্য পরিচালনা থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছে বল্লাল সেন। সারাক্ষণ জ্যোতিষশাস্ত্র আর তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের নিয়েই আছে। এদিকে কৌলিন্য প্রথার সপক্ষে কিছু অনুশাসন এনে দুর্মতি ব্রাহ্মণদের আরও কিছু সুবিধা এনে দিয়েছে। ওদের হাতে সাধারণ জনগণ নিপিষ্ট হচ্ছে ইদুর প্রাণীর মতো। রাজ্যের প্রজারা যদি শান্তিতে না থাকে দুর্যোগের সময় রাজা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়! প্রজা পালনই তো রাজার ধর্ম। ওটাই বরং আসল ধর্ম। ঐ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে কোনো কিছুই রাজার পতন ঠেকাতে পারে না।

এই প্রজা পালনের ধারে কাছেও কি আছে আমাদের রাজারা? প্রজাদের সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই এখানের রাজাদের। সামন্ত প্রভুদের লাঠির জোরে ওদের কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনাটা পেয়েই ওরা খুশি। ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে তা জানারও প্রয়োজন নেই রাজাদের। এটা কি হওয়া উচিত? নিজেকেই প্রশ্ন করে লক্ষণ সেন।

মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কটা দিনের জন্য কৈশোরের বাধাবন্ধনহীন, উত্তাল ও উন্মুক্ত সময়টাতে ফিরে যেতে চায় লক্ষণ সেন। এটার জন্য উপযুক্ত সঙ্গ দিতে পারে আরণ্য। ওকে এখন ডেকে পাঠাবে কিনা ভেবে উঠতে পারে না। আরও কদিন কেটে যায় এভাবে। শেষ পর্যন্ত আরণ্যকে ডেকে পাঠায় লক্ষণ সেন। প্রকৃতির পালাবদলেও এবার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে লক্ষণ। হাড়কাঁপানো শীত পড়েছে। কোনো কোনো দিন সূর্য দেখা দেয় মধ্যদুপুরে।

সন্ধ্যা না হতেই কুয়াশায় ঢেকে যায় সবকিছু। জ্যোৎস্নাও ঢাকা থাকে গাঢ় কুয়াশার আড়ালে। রাতের প্রকৃতিকে সাদা চাদরে ঢাকা অপার রহস্যময় মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। সৈনিকদের তাঁবুর বাইরে দূরে কোথাও কোনো কোনো আলোর কণা অচেনা প্রাণীর লালাভ চোখের মতো তাকিয়ে থাকে।

আরণ্য এসে পৌঁছে কদিন পর। ওকে দেখে আর চেনা যায় না। মানুষের এত পরিবর্তন হয় কীভাবে! ঐ কবি আরণ্য আর এই সেনাপতির ভেতর অনেক ব্যবধান ঘটে গেছে। ওকে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছ আরণ্য?'

'ভালো মহারাজ।'

'তোমার সেনাদলের খবর কী?'

'ওরাও ভালো, মহারাজ।'

একটু সময় থেমে থাকে লক্ষণ। চট করে ভেবে পায় না এরপর কী জিজ্ঞেস করবে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রেখেছে আরণ্য। লক্ষণ বুঝতে পারে এ আরণ্য ওর বাল্যসখা আরণ্য নয়। ওর অধীনস্ত এক সেনাপ্রধান আরণ্য, যে শুধু ওর আদেশ পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে, বন্ধুত্বের জন্য নয়। ওকে একটু সহজ করার জন্য জিজ্ঞাসা করে, 'কবিতা লেখ, আরণ্য?'

একটু চমকে ওঠে আরণ্য।

'না, মহারাজ।'

'কেন, বল তো?'

'আসে না।'

'কেন আসে না আরণ্য, আমি তো এখনও পারি।'

'আপনার আর আমার জীবন এক তো নয়, মহারাজ।'

'সবার জীবনেই তো উত্থান পতন আছে। রয়েছে সুখ, ও দুঃখ!'

'আছে হয়তো।'

না, স্বাভাবিক করতে পারছে না ওকে। ভাবনায় পড়ে লক্ষণ সেন। প্রভাবতীর কথা কী কিছু জিজ্ঞেস করবে ওকে? এখনও মাটির দিকেই চেয়ে রয়েছে আরণ্য। এতে সুবিধে হয়েছে লক্ষণের। ওর শরীরের ভাষাটা বোঝার চেষ্টা করে। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। কবিতার বিষয়ে ফিরে যায় আবার।

'আমার একটা কবিতা শুনবে আরণ্য?'

'কবিতা শোনার কানই এখন নেই আমার, মহারাজ।'

লক্ষণ বুঝতে পারে যে আর এগোনো উচিত হবে না। রাতের খাবার এক সঙ্গে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় ওকে। অনুমান করতে পারে আরণ্য যে এটা ওর প্রতি আদেশ। রাতে আবার এখানে আসার সম্মতি জানিয়ে ওর তাঁবুতে ফিরে যায়। একটু খটকায় পড়ে লক্ষণ। এতটা বদলে যায় কীভাবে মানুষ! অন্য কোনোকিছু কী ঘটেছে ওর জীবনে যা লক্ষণ জানে না। হতেই

পারে। মানুষের সবকিছুই কী প্রকাশ্যে? কত গোপন রয়েছে মানুষের জীবনে। প্রকাশ্য বিষয়গুলোরই বা আর কটার সন্ধান পায় মানুষ। ভাবনাটা আপাতত ওখানেই ছেড়ে দেয় লক্ষণ সেন।

রাতের খাবারের সঙ্গে বেশ কিছু কড়া পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছে লক্ষণ। আরণ্যকে কিছুটা চাঙা করে তোলার উদ্দেশ্য তো রয়েছেই। কিছুক্ষণ পানীয় নেয়ার পর টুকটাক কথাবার্তা বলে ওরা। হঠাৎ প্রস্তাব দেয় লক্ষণ, 'চল কিছুদিনের জন্য বল্লালপুরী থেকে ঘুরে আসি আরণ্য।'

'মহারাজ আদেশ দিলে যেতে তো হবেই।'

'আদেশ নয় আরণ্য। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে বা হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আরণ্য। তারপর বলে, 'জানতে পারি মহারাজ, কেন যেতে চাইছি?'

'আর কিছু নয়। সত্যিই আর কিছু নয় আরণ্য। শৈশবের দিনগুলো একটু ছুঁয়ে দেখা, স্পর্শ করা। বয়স তো কম হয়নি আমাদের। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তো তেমন যারা আমার ঐসব দিনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।'

একটু যেন নরম হয় আরণ্য। এবার দেখা হওয়ার পর এই প্রথম লক্ষণের দিকে চোখ তুলে তাকায়।

'মনে আছে তোমার আরণ্য, আমাদের ওই নদীটার কথা? তীরধনুক ছোড়া শিখতে যেতাম যেখানে। হাঁসের মতো সাঁতরে বেড়াতাম, দিনের পর দিন নৌকায় ভেসে বেড়াতাম, নতুন নতুন কবিতা রচনা করতাম, পানভোজন, নাচগান, আরো কত কী!'

'ভুলে গেছি সব, মহারাজ।'

'কিছুই ভুলিনি আমি। এবং জানি, তুমিও একবিন্দু ভুলোনি।'

'ওই নদীটা আর নেই মহারাজ।'

'কোথায় গেছে?'

'অনেক দক্ষিণে নেমে গেছে।'

হো হো করে হেসে ওঠে লক্ষণ। আরণ্যও কিছুটা হাসির আভাস ফুটিয়ে তোলে।

'ঐ সময়টাও আর নেই আরণ্য। আমাদের ঐ দিনগুলো নেই। সাঁতার কাটতে কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে আর কখনো যাব না ওখানে। ওসবের সাধ্যিও নেই আমাদের। শরীর ক্ষয়ে গেছে। মন বুড়িয়ে গেছে। কত রকমের যাতাকলের নিচে পিষ্ট হচ্ছি সারাক্ষণ। জীবনের আর বাকি আছে কী আরণ্য? যদি যাই কখনো, তাহলে যাব শুধু ঐসব স্মৃতিগুলো একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য।'

'আমাকেও স্মৃতিকাতর করে তুলছেন, মহারাজ।'

'তোমার কী ইচ্ছা হয় না আরণ্য?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এতদিন হয়নি মহারাজ।'

'এখন হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

শীতের তীব্রতা কিছুটা সহনীয় করে তোলার জন্য ঘরের ভেতর চুল্লি বসাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ওটার আগুন উসকে দিতে হয়। ভৃত্যেরা ওখানে ধূপ ছিটায় একটু পর পর। ওসবের গন্ধে বাতাস কিছুটা ভারি। পানীয়ের প্রভাব ও ঝাড়লণ্ঠনের আলোর ফাঁদ মনের উপর একটা মায়াজাদুর সৃষ্টি করে। অতীতের ওইসব স্মৃতিবিধুর দিনগুলো আরণ্যকে সত্যিই প্রলুব্ধ করে। লক্ষণ যখন আবার জিজ্ঞেস করে, সে বলে, 'ঠিক আছে মহারাজ, কবে নাগাদ যাত্রা করতে চান?'

'যে-কোনো দিন।'

'আমি কী গঢ়ীদ্বারে কাউকে বসিয়ে আসব?'

'তাই কর। খুব নির্ভরশীল ও অসম সাহসী কারো কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে এসো। ওটা কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটি।'

'তাই হবে মহারাজ। একজন নয়, দলের মধ্যে বেশ কজন সেনাপতি আছে এমন, যাদের নেতৃত্বে পুরো একটা দল রাখা যায়।'

'ঠিক আছে আরণ্য, আমি বিশ্বাস করি তোমাকে।'

'কখনোই এর অমর্যাদা হবে না, প্রভু।'

'জানি আরণ্য। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, মহারাজ।

১৩

যৌবনের অনেক কটা বছর লক্ষণ কাটিয়েছে গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী দুটোর তীর ধরে। কজঙ্গল, ঔদাম্বরিক, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম, খাট্টিকা, তাম্রলিপ্তি, এসব অঞ্চলে। দক্ষিণের তাম্রলিপ্তির প্রকৃতির সঙ্গে উত্তরের কজঙ্গলের অনেক অমিল। আবার পুবের বাংলা-সমতটের সঙ্গে পশ্চিমের রাঢ়-মগধের বিস্তর ব্যবধান। প্রকৃতির এসব বৈচিত্র্য খুব উপভোগ করে লক্ষণ। অনেক বছর পর আবার দীর্ঘদিন বল্লালপুরীতে কাটানোর জন্য এসে কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে সে। বয়সও কিছুটা কাজ করে এখানে। জীবনের এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছে লক্ষণ, যখন মন চায় মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকাতে। যুদ্ধে যুদ্ধে কাটানো ক্ষত্রিয়ের জীবনে প্রকৃতির সুষমা উপভোগ করার সুযোগ কতটাই বা আর আছে। আরণ্যের মনে কেন আর কবিতা আসে না বোঝে লক্ষণ। ওর ভেতরেও রয়েছে এক কবিসত্তা। যেটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে হয় প্রায় সারাক্ষণ। তারপরও দুএকটা চরণ এসে মাথার ভেতর আলোড়ন তোলে।

বল্লালপুরীতে এসে পিতাজির কাছে আবেদন জানায় একটা দীর্ঘ অবসরের। বল্লাল হয়তো ভেবেও দেখেনি এটার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, যা ভালো বোঝো কর। কোনো আপত্তি নেই। রাজ্যের অবস্থাটা যেন ঠিক থাকে ওদিকে লক্ষ্য রাখলেই হলো। ওকে আশ্বস্ত করে লক্ষণ।

পুত্র মাধব সেন পিতা ও পিতামহের মতো ক্ষত্রিয় চরিত্র কিছুটা অর্জন করতে পারলেও বাহুবল ততটা নেই। বল্লাল সেন যেমন যে-কোনো দায়িত্ব লক্ষণের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে লক্ষণ সেটা পারে না মাধবকে দিয়ে। সুবর্ণগ্রাম থেকে ওকে ডেকে পাঠিয়ে দেয় কর্ণসুবর্ণের কাছে ওদের শীতকালীন রাজাবাসে। আর ছোট কেশব সেনকে পাঠায় সপ্তগ্রামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুভায়ে যেন সবসময় কাছাকাছি থাকে ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলে তার নির্দেশ দিয়ে বড় দুটো সেনাদল ওদের অধীনে ন্যস্ত করে। ভবিষ্যতে ওদেরই তো রক্ষা করতে হবে এই রাজ্য। তাই কিছু কিছু দায়িত্ব এখন থেকেই কাঁধে চাপিয়ে দেয়। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন এতে সম্মতি দিলে সব ব্যবস্থা শেষ করে কিছুটা হালকা হয় লক্ষণ সেন। নদনদীতে ভরা বর্ষার স্ফীত জল এখন। ওদের দুজনকেই যেতে হবে নৌপথে। লক্ষণের নৌসেনাদলের উপর ভরসা রাখা যায়। ভারতবর্ষে এখন অদ্বিতীয় ওরা।

সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে লক্ষণ সেনের প্রমোদতরীবহর দীর্ঘদিন পর পদ্মাবতীর বুকে ভাসে আবার। আরণ্য, জয়দেব ও উমাপতির নৌকাও রয়েছে ঐ বহরে। নৌকার নোঙর তোলার পর আদেশ দেয় আরণ্যকে ওর বজরায় নিয়ে আসার জন্য। আরণ্য এসে পৌঁছালে সে বলে, 'চল আমাদের তীরধনুক অনুশীলনের জায়গাটায় যাই।'

'ঠিক আছে মহারাজ।'

নদীর বাঁক ঘুরে ওখানে যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। ওখানে গিয়ে সত্যি সত্যি চিনতে পারে না জায়গাটা। তীর ভেঙে পুরোনো কোনো চিহ্নই রাখেনি নদী। জলধারার মাঝখানে ছোট ছোট অনেক চর জেগে উঠেছে। নদীর মূলস্রোত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশ হয় লক্ষণ। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা জানতে তুমি, আরণ্য?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'প্রায়ই আস এখানে?'

'যখনই সুযোগ পাই।'

'তাহলে এসব ভাঙাগড়ার সবই দেখেছ।'

'প্রায় সবই, মহারাজ।'

আরণ্য বলতে পারে না যে ওর জীবনের সঙ্গে শেষ যে-অনুষঙ্গটা এখনও অক্ষয় রয়েছে তা লক্ষণ সেনকে জড়িয়ে। কবিতা নেই, প্রভাবতী নেই, সুফিসাধু নেই, শুধু আছে লক্ষণ সেনের আবাল্য বন্ধুত্বের স্মৃতি। যা হয়তো টিকে থাকবে আরও কিছুকাল। লক্ষণ সেন বলে, 'ঠিক আছে আরণ্য, একটা ব্যবস্থা করা যাক। এ যাত্রায় দুকবি মিলেমিশে থাকবে আমার সঙ্গে। দিনের বেলায় এক মৃত কবি, আরণ্য। আর রাতে জয়দেব। ইচ্ছে হলে রাতের আসরেও থাকতে পার তুমি। উমার শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছে না। রাতের আসরে, বা যে-কোনো সময় থাকতে পারে সে, ওর ইচ্ছে অনুসারে।'

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছে লক্ষণ সেন, উমাপতির প্রসঙ্গ এলে একটু গুটিয়ে যায় আরণ্য। ও চুপ করে আছে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে আরণ্য?'

'আজ্ঞে মহারাজ। জয়দেবের কবিতার ভক্ত আমিও।'

'ওর কবিতা তো সব শরীরী, আদিরসের!'

'সেজন্যই তো ও রাতের কবি।'

'এবার একটু হাস আরণ্য।'

'হাসার কারণ সৃষ্টি হলে নিশ্চয় হাসব, মহারাজ।'

'সাঁতার কাটবে?'

'কাটব মহারাজ।'

সাঁতার কাটার উপযোগী একটা জায়গায় মাল্লাদের নোঙর ফেলার আদেশ দেয় লক্ষণ। ওরা জানায়, কাছাকাছি কোনো জল নেই যেখানে নির্বিঘ্নে সাঁতার কাটা যায়। বর্ষার তীব্র স্রোত এখন নদীতে, জল ঘোলা, কোথাও কোথাও ঘরিয়াল রয়েছে। ঘোলাজলের ফলে সেসব দেখাও যায় না। একটু দমে যায় লক্ষণ। যেদিকে সাঁতার উপযোগী জল আছে সেদিকে নৌকা ঘুরাতে আদেশ দেয়। বিপাকে পড়ে মাঝিরা।

এই বর্ষায় নদীতে সাঁতার উপযোগী নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ছোট কোনো নদীতে যেতে হবে। সেখানে যদিও সাঁতার কাটা যায় কিন্তু জল থাকে খুব ঘোলা। রাজার আদেশ অলংঘ্য। প্রয়োজন হলে নদী কাটতে হবে। ছোট্ট একটা নদীর বাঁকে গিয়ে যখন পৌঁছে ওরা তখন বিকেল হয়ে এসেছে। সাঁতারের সময় নেই। পরদিনের জন্য ওটা অপেক্ষায় রেখে রাতের আসরে বসে ওরা।

কবি জয়দেবের কবিতা অনেকদিন শোনা হয়নি। নাচগানের ফাঁকে ফাঁকে ওর কবিতা মুগ্ধচিত্তে শোনে লক্ষণ। অনেক কবিতায় সুরারোপও করেছে সে। সুকণ্ঠী গায়িকারা ওসব গেয়ে শোনায়। গীতগোবিন্দের অনেক কবিতা এ সময়টায় রচনা করে জয়দেব। ওর কবিতা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায় লক্ষণের।

অনেকে মিলে সাঁতার কাটতে নদীতে নামে পরের দিন। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে এত হাঁপিয়ে ওঠে লক্ষণ যে ধরাধরি করে ওকে নৌকায় উঠাতে হয়। নৌকার পাটাতনে শুয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে, 'এতটা বয়স কখন পেরিয়ে এসেছি আরণ্য! ভাবতেও পারিনি শরীরে জড়া এসে এভাবে ঘাঁটি গেড়েছে।'

'পুরোপুরি ওটাও না মহারাজ। অনভ্যাসের ফলও আছে কিছুটা। পরপর কয়েকদিন সাঁতার কাটলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।'

'দেখা যাক।'

এরপর প্রতিদিন সাঁতার কাটতে নামে ওরা। কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পায় লক্ষণ। সাঁতারটাকে খুব উপভোগ করে সে। পশ্চিমের লালমাটির শুকনো দেশে অনেক দিন কাটিয়ে জীবনের কত কিছু যে হারাতে হয়েছে এখন তা বুঝতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম, জাম, কাঁঠাল ও এরকম অনেক রসালো ফল মনপ্রাণ ভরে খায় ওরা। লক্ষণের মনে হয় আবার যেন পুরোনো দিনে ফিরে এসেছে। এখানের নদীগুলোয় যে কত রকম মাছের আবাস রয়েছে তা কল্পনা করাও কঠিন। জাগতিক এসব ভোগের ভেতর ডুবে থেকে কয়েকমাসের জন্য সবকিছু ভুলে থাকে লক্ষণ ও তার সঙ্গীসাথীরা।

এক নির্জন দুপুরে আরণ্য কিছু কাজের কথা উঠায় লক্ষণের কাছে।

'মহারাজ অনুমতি দিলে রাজ্য শাসনের বিষয়ে দুএকটা কথা তুলতে পারি।'

'অবসরে আছি না আরণ্য! ওসব না তোলাই তো ভালো।'

'যদি সময় ও সুযোগ আর না আসে।'

'এমন ভাবছ কেন? যাহোক, বলো।'

'আমাদের এই সেনরাজ্যটার বয়স তো শতাব্দী পেরিয়েছে। একটা স্থায়ী রাজধানী, নগর বা দুর্গ এখনও গড়ে তোলা হয়নি, মহারাজ।'

'কেন? বিজয়পুর, বল্লালপুরী এগুলো রাজধানী নয়?'

'স্থায়ী হচ্ছে না তো কোনোটাই। মহারাজ কী বল্লালপুরীতে কাটাবেন?'

'ভালো প্রশ্ন করেছ আরণ্য। গৌড়েশ্বর হতে হলে রাজধানীটা তো পশ্চিমে থাকাই ভালো।'

'গৌড়ের তো একটা রাজধানী আছে।'

'পুণ্ড্রবর্ধনে আমি থাকতে চাই না। এমনকি ওটা অধিকার করা সম্ভব হলেও না। পালদের বিষয়টা তো জানোই। এখনও ওরা ওদের অধীন সামন্তরাজা হিসেবে দেখে আমাদের।'

'কারণ কী ওটার, মহারাজ?'

'কারণ তুমিও জান আরণ্য। সেনরাজাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় পালরাজাদের সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। অনেকে আবার ওদের অধীনস্থ সামন্ত ছিল। ওরা এটা ভুলতে পারছে না। এক কালের অধীনস্থ সেনাপতিদের একটা পৃথক ও স্বাধীন রাজ্য থাকবে মানসিকভাবে এটা মেনে নেয়া বোধ হয় কষ্টকর। যাহোক, পুণ্ড্রের কাছাকাছি কোথাও নতুন নগর গড়ে নিলে মনে হয় ভালো।'

'আমারও তাই মনে হয় মহারাজ। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটায় ওরা। তারপর আরণ্য বলে, 'আরেকটা বিষয় আমি জেনেছি, আরব বণিকদের সংস্পর্শে এসেছে যারা ওদের কাছ থেকে।'

'কী ওটা?'

'আরব বণিকেরা শুধু খেজুরই নিয়ে আসে না, অনেক ইতিহাস ও সংস্কৃতিও নিয়ে আসে।'

'যেমন?'

'পশ্চিমের দেশগুলোয় রাজাদের বিশাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকে। জয়পরাজয়ের বিষয়টা তো কখনো নিশ্চিত জানা থাকে না। কৌশলগত কারণে অনেক সময় দুর্বল সেনাপতির হাতেও একজন সুদক্ষ যোদ্ধার পরাজয় ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজারা দুর্গনগরীতে আশ্রয় নেয়। ওই নগরগুলোকে ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখে। দীর্ঘ দিনের জন্য খাদ্যশস্য, পানীয় প্রভৃতি এবং যুদ্ধের অস্ত্রসস্ত্র ও রসদ জমা রাখে। অনেক সময় বিপক্ষ সৈন্যেরা বছরের পর বছর দুর্গনগরী অবরোধ করে রাখে। তারপর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তখন রাজা আবার নতুনভাবে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করে নিজ রাজ্য রক্ষা করে।'

'তোমার কী ধারণা ভারতবর্ষের রাজাদের এ তথ্যটা জানা নেই।'

'আছে নিশ্চয়।'

'তাহলে?'

'আপনি বলুন মহারাজ।'

'ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অনেক বেশি। মানুষ সহজলভ্য এখানে। একটা দুর্গনগরী গড়ে তোলার চেয়ে সৈন্য দিয়ে মানব প্রাচীর গড়ে তোলা এখানে সুলভ ও সহজসাধ্য। দুর্গপ্রাচীর সরিয়ে নেয়া যায় না। মানবপ্রাচীর সরিয়ে নেয়া যায়।'

'এটাই কী একমাত্র কারণ?'

'আরও কারণ থাকতে পারে।'

'মহারাজ কী দুর্গ গড়ার পক্ষে না? ইচ্ছা ছিল গঢ়ীদ্বারে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলার।'

'ভেবে দেখার সময় দাও।'

'কজঙ্গলের কোথাও একটা স্থায়ী রাজধানী নগরী গড়ে তোলার বিষয়টা ভাবা যায়?'

'ওরকম দুর্গম জায়গা থেকে প্রশাসন চালানো কঠিন হবে। পালিয়ে থাকা হয়তো সহজ হবে, যদি কেউ অবরোধ করে।'

হাসতে থাকে লক্ষণ সেন। আরণ্যের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

'হাস, হাস আরণ্য। ভালো লাগছে। ঠিক আছে, তোমার এই হাসিটার মূল্য হিসেবে একটা রাজধানী নগরীর প্রস্তাবটা নিলাম। তবে কজঙ্গলে না। পুণ্ড্রনগরীর কাছাকাছি, কিছুটা দক্ষিণে, গঙ্গার পূর্বতীরে একটা উঁচু জায়গা বেছে নাও। পশ্চিমের নদীটা যেন প্রাকৃতিক রক্ষাবূহ্য হিসাবে থাকে।'

'তাই হবে মহারাজ। নাম ঠিক করে দেবেন?'

'এখনি?'

'আর কোনো কাজ নেই আমার। এ দায়িত্বটা আমাকে দিন মহারাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে নামটাও তুমিই বলো, ভেবে দেখি।'

একটু ভাবে আরণ্য। চট করে লক্ষণ ও প্রভাবতী মিলিয়ে মাথায় এসে যায় লক্ষণাবতী। একটু নিচু স্বরে বলে, লক্ষণাবতী। সঙ্গে সঙ্গে ওটা মনে ধরে যায় লক্ষণের। বলে, 'ঠিক আছে আরণ্য। লক্ষণাবতী।'

'কাজ শুরু করে দেব?'

'এক্ষুণি না। সবার আনন্দ অবসর তো মাটি হতে দিতে পারি না। কী বলো?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'বুঝতে পারছি আরণ্য। কোনো কারণে হয়তো তোমার মন উতলা হয়ে রয়েছে। এক কাজ করবে? কিছুদিনের জন্য তোমার দূরদেশ থেকে ঘুরে আস।'

আরণ্য বুঝতে পারে কী বোঝাতে চেয়েছে লক্ষণ। ভেবে দেখে, মন্দ হয় না। এই প্রমোদ ভ্রমণে থেকেও এতে অংশ নিতে পারছে না সে। এখানে থেকে লাভ কী? পরদিনই প্রমোদবহর ছেড়ে যায় আরণ্যের নৌকা। ভাটির স্রোতে ভেসে পরের হপ্তায় এসে পৌঁছোয় হরিকেলের ওই সবুজ দ্বীপে। এই কবছরে চোখে পড়ার মতো তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে না এখানে। মনে হয় দ্বীপটা স্থায়ী হয়ে গেছে। নদী ও জলাঞ্চলগুলো আরও দূরে সরে গেছে। সবুজের বিস্তৃতি আরো কিছুটা বেড়েছে।

সুফিসাধুর আস্তানার পথে হেঁটে আসতে আসতে মন ভারি হয়ে ওঠে আরণ্যের। কত কিছু ঘটে গেছে বিগত বছরগুলোয়! সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে গত হয়েছে প্রভাবতী। বেশি বয়সে সন্তান ধারণের ফল হয়তো এটা। প্রভাবতী ও আরণ্যের নাম মিলিয়ে পুত্রের নাম রেখেছে সে প্রদ্যুম্ন। প্রভাবতীকে কন্যার মতো গ্রহণ করেছিল সুফিসাধু। সে-হিসেবে প্রদ্যুম্নকে দৌহিত্রের মতো লালনপালন করেছে যত দিন জীবিত ছিল সে।

হঠাৎ করেই অন্তর্ধান ঘটে তার। সামান্য এক ব্যাধিতে মৃত্যু হয় অসাধারণ এই মানুষটার। ওর ইচ্ছা অনুসারে এখানেই সমাহিত করা হয়েছে ওকে। সুফিসাধুর প্রধান শিষ্য তইবশা এখন আস্তানা চালায়। ওরা বলে মুরীদ। বারো হাত বাঙ্গির তেরো হাত বিচির মতো নামের শেষে পদবি জুড়েছে যা কখনো উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে না আরণ্য। সুফিবাবাকে এখন পীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে ওরা। ওর ঐ প্রধান মুরীদ তইবশা এখন নতুন পীর। ওরা বলে গদ্দিনসীন পীর। আর খানকার নাম হয়েছে এখন পীরের দরগা।

দরগায় প্রবেশ করে একটু অবাক হয় আরণ্য। সিঁথিতে সিঁদুরমাখা এক রমণী দরগার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। সুফিসাধুর সময় এটা ভাবতেও পারেনি কেউ। প্রভাবতীকে নিয়ে ওর সঙ্গে বিতর্কটা পুরোপুরি মনে করতে পারে

আরণ্য। প্রভাবতীকে এখানে রাখার বিষয়ে কিছু শর্ত ছিল। ওদের ধর্মটা নেয়ার জন্য কখনো চাপ দেয়নি সুফিবাবা। কিন্তু এদের অন্তপুরের নিয়ম রক্ষা করে চলার বিষয়ে ও ছিল কঠোর। এখানে শাখা ও সিঁদুর ব্যবহার করতে পারবে না প্রভাবতী। অন্তপুরের অন্য মেয়েদের মতোই থাকতে হবে। ভেতরে ও বাইরে সাম্যই নাকি হচ্ছে ওদের ধর্মের আদর্শ। এ বিষয়ে কিছু এদিক সেদিক করার সুযোগ নেই। আরণ্য তর্ক করেছে।

'সিঁদুরে সমস্যা কোথায় সুফিবাবা?'

'জানি না তোমাদের পুরোহিতেরা কোন যুক্তিতে বিবাহিতাদের এভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এটার প্রয়োজন আমাদের নেই আরণ্য।'

'তখন ছিল। বিবাহিতা কোনো নারীকে যেন ভুলে কেউ প্রেম নিবেদন না করে...'

'এরকম ভুল আমরা করি না।'

'আপনাদের ধর্মের বয়স আর আমাদেরটার বয়স বিবেচনা করবেন সুফিবাবা। কিছু কিছু বিষয় আমাদেরও মেনে চলতে হয়। দুটো সমাজের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। আপনাদের সব কিছু যদি এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে হয়তো ঠোকাঠুকি লেগে যাবে।'

আর কথা বাড়ায়নি সুফিসাধু। আরণ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে। কিন্তু প্রভাবতী বিষয়টাকে মেনে নিয়ে থেকে গেছে। এখন মনে হয় ভালোই করেছিল। যে পিতৃস্নেহ প্রভাবতী পেয়েছিল এখানে তা হয়তো তার নিজগৃহেও পায়নি।

এই কবছরে এত সুন্দর একটা আস্তানার এত পরিবর্তন ঘটেছে ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত বুঝতে পারেনি আরণ্য। কোনো অতিথি এলে সুফিসাধু নিজে এসে অভ্যর্থনা জানাত। আর এখন ওর শিষ্য, এদেশীয় পীরের সাক্ষাতের জন্য প্রার্থী হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে হয়, নজরানা দিতে হয়। কখনো দিনের পর দিন নাকি অপেক্ষায় থাকতে হয়! সুফিসাধুর সমাধিস্থলটাকে ওরা পূজামণ্ডপের মতো সাজিয়ে নিয়েছে। ওর অনুসারীরা এটাকে মন্দিরের মতো গড়ে তুলতে শুরু করেছে।

হিন্দু পুরোহিতদের সঙ্গে এদের পার্থক্য খুঁজে পায় না আরণ্য। এমনকি তুকতাকও শুরু করেছে ঐ তইবশা। পীরের ফুঁ দেয়া জল বিক্রি করা শুরু করেছে। এই জল সম্পর্কে সাধুবাবার কথাগুলো মনে করে আরণ্য। বুঝতে পারে আর কবছরের মধ্যেই স্থানীয় এই ভণ্ডের দল সুফিসাধুর এই আস্তানাটাকে নতুন ধরনের আরেকটা মন্দির হিসেবে গড়ে তুলে ধর্ম ব্যবসা পুরোপুরি শুরু করে দেবে। আরণ্য তখনই সিদ্ধান্ত নেয় প্রদ্যুম্নকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যও অপেক্ষা করতে হয় আরণ্যকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদ্যুম্নকে দেখে অবাক হয় আরণ্য। সূচিকাজ করা একটা টুপি পরেছে সে! রক্ত চড়ে যায় আরণ্যের মাথায়। সে কাছে এলে মাথা থেকে ওটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ওর পরিচয় আস্তানার অনেকের জানা থাকায় কিছু বলার সাহস পায়নি। রক্ত চোখে নিয়ে তাকিয়ে থাকে শুধু। ঐ দিনই ফিরে আসে আরণ্য।

এসব কিছু আর বলে না লক্ষণকে। প্রদ্যুম্নকে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়ার ইচ্ছেটি শুধু জানায়। নিশ্চয়তা দেয় লক্ষণ। অবশ্যই ওটা করবে সে। একটু কৌতুক করে লক্ষণ, 'আরেকটা বিয়ে করতে পার না তুমি, আরণ্য?'

'না, পারি না মহারাজ।'

'কেন?'

'ওটার প্রয়োজন নেই।'

'তা অবশ্য ঠিক। প্রয়োজন না থাকলে কেন করবে। কিন্তু মানুষ কী সব কিছু প্রয়োজন থেকে করে?'

'তা জানি না মহারাজ। প্রশ্নটা আমার কাছে ওভাবে দেখা দেয়নি কখনো।'

'মানুষ যা কিছু করে আরণ্য, তার প্রায় সবই অকারণে, অপ্রয়োজনে, বিশ্বাস কর এটা?'

'তাই যদি হয় তাহলে আরেকটা অকারণ বাড়িয়ে লাভ কী?'

'এটা অবশ্য যুক্তির কথা বলেছ, আরণ্য।'

হরিকেল থেকে ফিরে এসে আরেক ধরনের চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে ওর ভেতর। কেন যেন মনে হয় জীবন থেকে ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। তাই আরো বেশি করে জড়াতে চায় জীবনের সঙ্গে। অবশিষ্ট দিনগুলো যেন দ্রুত অতিক্রম করে যেতে পারে ঐ চেষ্টা করে। লক্ষণের কাছে প্রস্তাব রাখে, 'অনুমতি দিন তো যাত্রা শুরু করি মহারাজ।'

'কোন যাত্রা?'

'পুঞ্ড্রের কাছাকাছি কোথাও লক্ষণাবতীর জন্য জায়গা খুঁজে বের করি।'

'পুঞ্ড্রের খুব কাছাকাছি যেও না। আবার দক্ষিণদিকে জঙ্গলের ভেতরেও ঢুকে যেও না। এমন একটা স্থান বেছে নিও যেখানে আমাকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে না হয়।'

খুব একচোট হেসে নেয় লক্ষণ। আরণ্যও যোগ দেয় ঐ হাসিতে।

'না মহারাজ। আপনার মনের মতো স্থান খুঁজে পেলে জানাব আপনাকে। সবদিক ভালো বিবেচনা করলে রাজধানী গড়ার অনুমতি দেবেন।'

'বিকল্প রেখ, যেন ভালোমন্দ তুলনা করা যায়।'

'ঠিক আছে মহারাজ।'

'গঢ়ীদ্বার কার হাতে থাকবে ততদিন?'

'যুবরাজের কাছে।'

'কেশবকে এতটা ভরসা করতে পারি না।'

'তাহলে ছোট যুবরাজ?'

'বিশ্বরূপকে তো আরো না।'

'আমি চোখ রাখব, মহারাজ। ভাববেন না।'

'ওটাই জানতে চাইছিলাম। বিষয়টা কী জান আরণ্য, ভবিষ্যত রাজারা যদি নিজেদের গড়ে না তোলে তাহলে রাজ্যটা থাকে না। কেন যেন ভয় হচ্ছে আমার। যুবরাজদের গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু ওরা হয়ে উঠছে না। তোমার মনে আছে আরণ্য, দাদুর হাতে আমাদের অস্ত্র চালানো শেখা?

আমাদের প্রশিক্ষণ নিজে দেখাশোনা করতেন তিনি। আর পিতাজি পড়ে রয়েছেন ঐ সব ভণ্ড তান্ত্রিক বামুনদের নিয়ে। বিশ্বরূপ, মাধব বা কেশবের দিকে একটু দৃষ্টি আছে তাঁর। আমাকে তো প্রায় সারাক্ষণ যুদ্ধ না হয় যুদ্ধজাতীয় কোনো অভিযানে থাকতে হয়, একটু থেমে বলেন, 'অভিযোগ করছি না আরণ্য। কাউকে তো বলতে পারব না এসব। মনের দুঃখটা তোমার কাছে জানালাম।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ।'

'তা জানি আরণ্য। এসব কথা তোমার সঙ্গেই থাকবে।'

'আমি কী একটু চেষ্টা করে দেখব মহারাজ?'

'আর হবে না, যেভাবে গড়ে উঠেছে ওরা, সেভাবেই থাকবে। এখন যদি কিছু বলতে যাও, তাহলে তোমার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। দাদুজী যৌবনে যুদ্ধ করে নতুন নতুন রাজ্য জয় করে তাঁর পিতার পায়ের নিচে এনে ফেলেছেন।

পিতাজি যৌবনে কী পরাক্রমশালী যোদ্ধাই না ছিলেন! আমি কত রাজ্য জয় করে পিতার পদসেবা করেছি। আর দেখ, মাধব, বিশ্বরূপ, বা কেশব, কারোই কী ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা আছে? পূর্বপুরুষের এই রাজ্যটাই ধরে রাখতে পারবে কিনা কে জানে? এটা একটা বড় দুর্বলতা আমার আরণ্য। যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করতে পারলাম না।'

'এ নিয়ে এত ভাববেন না মহারাজ। সময়ই সব ঠিক করে দেবে।'

'দেবে আরণ্য?'

মহারাজের কপালে ভাঁজ দেখা দেয়। গভীর ভাবনায় ডুবে যায় লক্ষণ সেন। কোনো কথা আর বলে না আরণ্য। চুপচাপ অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ পর লক্ষণ বলে, 'কবে যেতে চাও আরণ্য?'

'মহারাজের অনুমতি পেলেই।'

'ঠিক আছে আরণ্য। আমার শুভকামনা রইল।'

'বিদায় মহারাজ।'

'বিদায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয় লক্ষণ সেনরাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজে। পিতাজি বল্লাল সেনের একটা আকস্মিক সিদ্ধান্তে কিছুটা সঙ্কটে পড়ে লক্ষণ। সমগ্র দেশের শাসনভার লক্ষণের হাতে ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে, নিরঞ্জনপুরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন তিনি। এমনকি তার অর্ধসমাপ্ত গ্রন্থ অদ্ভুতসাগর শেষ করার ভারও দিয়ে দিয়েছেন লক্ষণকে।

রাজ্যের পূর্ণ শাসনভার নিজের হাতে আসার পর প্রকৃত ক্ষত্রিয়রূপে আবির্ভূত হয় লক্ষণ সেন। যুবাবস্থায় যে কামরূপরাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেনি, ঐ রাজ্যের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছিল, তা নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেয়। কলিঙ্গ জয় করে নিজেদের সীমানা সম্প্রসারণ করে। রাজ্যের পশ্চিমভাগ সুরক্ষিত রাখতে হলে রাজধানী বিক্রমপুর থেকে তা পালন করা কঠিন হবে ভেবে গৌড়ের কাছে লক্ষণাবতী নামে নিজের রাজধানীনগর প্রতিষ্ঠা করেছিল আরণ্যের কঠোর পরিশ্রম ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে। বছরের অধিকাংশ সময় এখন লক্ষণাবতীর কাছাকাছি কোনো রাজাবাসে অবস্থান করে লক্ষণ সেন। গৌড়ের অবস্থান সুদৃঢ় রাখার জন্য গহরবালদের রাজ্য মগধ জয় করে কাশী পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

গৌড়ের কিছু অংশ অধিকার করতে পারলেও পুণ্ড্রবর্ধনে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা লক্ষণ সেনের ছিল না। লক্ষণাবতীতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেও বেশি সময় সেখানে অবস্থান করতে চাইত না সে। নওদায় একটা সাময়িক আবাসন গড়ে তুলেছিল লক্ষণ সেন। তুর্কিরা পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌঁছুলে গৌড় রক্ষার জন্য গৌড়ের প্রবেশপথ গঢ়ীদ্বারে সার্বক্ষণিকভাবে একটা শক্তিশালী বাহিনী নিয়োজিত রাখে।

সৈন্যসামন্ত ও শক্তিমত্তায় লক্ষণ সেন এখন ভারতবর্ষের এক পরাশক্তি। নামের সঙ্গে যোগ করা পরমেশ্বর, পরমনারসিংহ, পরমভট্টারক, পরমবৈষ্ণব,

মহারাজাধিরাজ উপাধিগুলো তাকে মানায়ও। এত বিশাল হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী ও পদাতিক সৈন্য ভারতবর্ষের আর কোনো রাজার অধীনে আছে কিনা সন্দেহ। আর বঙ্গ-সমতটের নৌবাহিনী তো ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়।

এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তুর্কিদের ভয়ে ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে উঠেছে লক্ষণ সেনের সৈন্যরা। সৈন্যসামন্তের চেয়ে রাজ্যের প্রজারা যে অনেক বড়শক্তি এ ধারণাটা তৈরি হয়নি ভারত উপদ্বীপের রাজরাজরাদের ভেতর। এত বছর ওরা শুধু রাজ্যশাসন করেছে, যা প্রজাপীড়নের নামান্তর। এর প্রতিফল পাওয়ার সময় বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে।

সামন্ত ও মহাসামন্তদের অত্যাচারে রাজ্যের কোনো একটা অংশেও প্রজাদের মনে সুখ নেই। দস্যু ও তস্করের ভয়ে বণিকেরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে না। বৌদ্ধভিক্ষুদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লেলিয়ে দেয়া ভৃত্যের দল ওদেরও পলায়নোন্মুখ করে তুলেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রাচীন এ ধর্মটা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। পশ্চিমদিক থেকে তুর্কিরা যত এগিয়ে আসছে, রাজ্যের শৃঙ্খলা তত ভেঙে যাচ্ছে। আপতকালে যখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন শৃঙ্খলা, ঠিক তখনই সবকিছু ভেঙে পড়ছে একে একে। বেতনভূক পেশাদার সৈন্যরা যেদিকে সুবিধে দেখে সেদিকেই ধেয়ে যায়। চারদিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে লক্ষণের সামনে। মহামন্ত্রী পশুপতি যে কী ভাবছে তা বুঝে উঠতে পারে না লক্ষণ সেন। আরণ্যকে ডেকে পাঠায় গঢ়ীদ্বার থেকে। কটাদিনের জন্য মাথাটা একটু হালকা করা দরকার।

আরণ্য যখন রাজধানী লক্ষণাবতী এসে পৌঁছে লক্ষণ সেন দেব তখন মহামন্ত্রী পশুপতি, রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী, পারিষদ, সামন্ত ও মহাসামন্তদের নিয়ে রাজপুরীতে মহাব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। রাজজ্যোতিষীরা ও সভাকবিরা রয়েছে এই মহাসভায়। সভাগৃহে প্রবেশ করে আরণ্যের মনে হয় না যে এই সেনরাজ্যটায় কোনো সমস্যা রয়েছে। সবার উৎফুল্ল আচরণ দেখে মনে হয় কোনো একটা সফল যুদ্ধাভিযান শেষ করে দীর্ঘ একটা আয়েশী কাল যাপনের ভেতর রয়েছে মহারাজ লক্ষণ সেন। মিথিলা রাজ্যের পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে বেশ বড় একটা সামন্তরাজ্য রয়েছে ওদের। ওখানের মহাসামন্তের অত্যাচারে প্রজাসাধারণ পালানোর কোনো পথ না পেয়ে আরো পশ্চিমে তুর্কি অধিকৃত অঞ্চলগুলোয় পর্যন্ত পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। ওখানে গিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করে অন্তত জীবন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। শক্তসামর্থ্যরা ওদের পদাতিক সৈন্যদলে যোগ দিয়ে কিছুকিছু সুযোগসুবিধেও হাতিয়ে নিতে পারছে।

ক্ষেত্রজীবী বৌদ্ধদের প্রতি ঐ মহাসামন্তের সৈন্যরা খড়্গহস্ত। ওরাও পালিয়ে যাচ্ছে পুব ও উত্তরদিকে। অন্ত্যজশ্রেণির নারীরা ওখানের রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজাতশ্রেণির প্রতিরাতের বিভিন্ন আসন সহচরী। বাৎসায়ন নির্দেশিত প্রতিটা আসনের একনিষ্ঠ সাধক ও চর্চাকারী ওরা।

গ্রামের পর গ্রাম ওরা চষে বেড়ায় ক্ষীণকটি গুরুনিতম্ব বিশালবক্ষা রমণীদের খোঁজে। সারাক্ষণ আসব পানে মত্ত অবস্থায় থাকে ওদের প্রায় সবাই। সাধারণ জল বোধ হয় স্পর্শও করে না। ঐ মহাসামন্তরাজের সুখ্যাতি তুর্কি সেনাদের কাছেও পৌঁছে গেছে। রাজসভায় ওকে দেখে আরণ্যের মাথায় রক্ত উঠে আসে। সে শুনেছে এই মহাসামন্ত অর্ণব সেনের অনুচররা এখন তুর্কি সেনাদের আসন শিক্ষা দেয়ায় ব্যস্ত রয়েছে।

মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে আসে আরণ্য। খুশি মনে ওকে স্বাগত জানায় লক্ষণ সেন।

'এস আরণ্য, বস।'

'অনেক করুণা, মহারাজ।'

পশুপতি জিজ্ঞেস করে, 'কী সুখবর এনেছেন আরণ্য, বলুন।'

'রাজ্যজুড়ে এত সুখবর, কটা জানাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।'

'একটু যেন শ্লেষ রয়েছে আরণ্য?'

'ক্ষমা করবেন, মাননীয় মহামন্ত্রী। মহারাজের আদেশ পেয়ে ছুটে এসেছি। দেয়ার মতো কোনো খবর নেই আমার কাছে।'

'কোনো খবর না থাকাও নাকি একটা সুখবর।'

'বরং আমাকে কিছু সুখবর শোনান মাননীয় মহামন্ত্রী মহোদয়। অনেকদিন এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছি।'

নিজে কিছু না বলে রাজজ্যোতিষীদের দিকে ইঙ্গিত করে পশুপতি।

'ধর্মাধিকারী, পণ্ডিত হলায়ুধ মহাশয়, আমাদের এই সেনাপতিকে কিছু সুখবর শোনান তো।'

পণ্ডিত হলায়ুধ বলে, 'সেজন্য তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

লক্ষণ সেন চাপ দেয় হলায়ুধকে, 'তা হোক না। অপেক্ষা করার জন্য কেউ তো অধৈর্য হয়ে উঠেনি।'

'তাহলে শুনুন আরণ্য মহাশয়। আগামী আশ্বিনের ত্রয়োদশ অমাপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, কৃত্তিকা, স্বাতী, রেবতী ও উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে একসারিতে অবস্থান করবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রের তেজ, উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্রের নৈপুণ্য, রেবতী নক্ষত্রের রক্ষাবূহ্য ও স্বাতী নক্ষত্রের ক্ষিপ্রগতি আমাদের সৈন্যদের তেত্রিশগুণ শক্তিশালী করে তুলবে। ওই মাহেন্দ্রক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করে আমাদের সৈন্যরা তুর্কিদের পলাশ রেণুর মতো উড়িয়ে দিতে সমর্থ হবে।'

'মাননীয় জ্যোতিষ মহাশয়রা কী গণনা করে এসব তথ্য জানিয়েছেন পণ্ডিত মহোদয়কে?'

চোখ লাল করে চুপ করে থাকে পণ্ডিত হলায়ুধ। তার এক সাঙ্গ, রাজজ্যোতিষী সর্বানন্দ ব্রহ্মাচার্য বলে, 'আপনার সঙ্গে কী কৌতুক হচ্ছে আরণ্য মহাশয়?'

'না মহাশয়, কৌতুক না। আমার সৈন্যদেরও এসব জানাতে হবে কিনা, ভালোভাবে বুঝে নিচ্ছি। তেত্রিশগুণ শক্তিটা ওদেরও তো দরকার রয়েছে।'

'আর কী বুঝতে চান বলুন।'

'ঐ সব নক্ষত্রের আলো, তেজ ও অন্যান্য গুণাবলী কী বেছে বেছে আমাদের সৈন্যদের উপরই পড়বে? তুর্কি সৈন্যরাও তো একই আকাশের নিচে থাকবে।'

রাজজ্যোতিষী এবার একটু উষ্মা প্রকাশ করে, 'আরণ্য শুধু অস্ত্রচালনাটাই শিখেছে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকুক, ওটা সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা উচিত ছিল।'

'ক্ষমা করবেন মহাশয়, নিতান্তই এক অর্বাচীন আমি।'

টিকি দুলিয়ে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত বলে, 'ঐ সব নক্ষত্রেরা কী কেবলই নক্ষত্র, আরণ্য মহাশয়। পুরাকাল থেকে আমাদের মহামুনিরা, মহাঋষিরা নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করছেন ওখানে। আমাদের দেখভাল তো ওরাই করছেন।'

একথা বলে কপালে যুক্ত কর ঠেকিয়ে প্রণামের ভঙ্গি করে।

আরণ্য বলে, 'আকাশে তো অসংখ্য নক্ষত্র। তুর্কিদের মুনি ঋষিরাও কী ওখানে থাকতে পারে না?'

'জ্যোতিষশাস্ত্রের কী বোঝে ওরা?'

'জ্যোতিষশাস্ত্রটা হয়তো বোঝে না। শুনেছি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেককিছু খুব ভালো বোঝে আরব উপদ্বীপের মানুষরা।'

রাজজ্যোতিষীর বিরক্তিটা এবার প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। রাগত স্বরে বলে, 'বলুন দেখি আরণ্য মহাশয়, মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক লক্ষণ সেন দেব এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ যাত্রা করেছেন, সেসবের নির্ভুল গণনা কী এই রাজজ্যোতিষীরাই করে দেয়নি, কোনোটা কি ভুল হয়েছে? এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে মহারাজের পরাজয় ঘটেছে?'

কী বলবে আরণ্য? এই সব তর্কবাগীশ ভণ্ডদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আরণ্যের মৌন হয়ে থাকাটাকে ওদের জয় ভেবে নিয়ে নরম সুরে পুরোহিত বলে, 'জীবনটা নিয়ে একটু ভাবুন আরণ্য। ভগবানই আপনার মঙ্গল করবেন।'

রাজসভার এক কোনে কবি জয়দেবও বসে ছিল। এ অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ও বলে, 'এসব থাক আরণ্য। একটা কবিতা শোনাও, অনেকদিন তোমার কবিতা শোনা হয়নি।'

লক্ষণ সেনও এতে সায় দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ আরণ্য, নতুন একটা কবিতা শোনাও। সভায় একটু প্রাণ আসুক।'

একটু আড়ষ্ট হয় আরণ্য।

'মহারাজ, কখনো কী কবি ছিলাম আমি!'

জয়দেব বলে, 'ভান করো না আরণ্য। আমি জানি তোমার ভেতর কত বিশাল এক কবিপ্রতিভা ছিল। সেটা ব্যবহার করোনি তুমি।'

'একটু ভুল বুঝেছ জয়দেব। ওটা থাকলে নিশ্চয় ব্যবহার করতাম। সামান্য এক চারণকবি হয়তো ছিলাম কোনো এক কালে। সেসবের ছিঁটেফোঁটাও নেই এখন আর। তার চেয়ে বরং তোমার একটা কবিতা শোনাও জয়দেব।'

বাল্য সখা আরণ্যের ব্যপারটা বুঝতে পারে লক্ষণ। চাবুক মেরেও যে একটা চরণ ওর কাছ থেকে বের করা যাবে না, তা ভালোভাবেই বোঝে সে। বলে, 'একদুজন কবি এখানে নিশ্চয় আছে এখন কিন্তু কবিতাবোদ্ধা মনে হয় একজনও নেই। কবিতার আসরেই না হয় কবিতাপাঠ হবে। তা বলো আরণ্য। সমর অঙ্গনের খবর বলো।'

'বলার মতো কোনো খবর এখন আমার কাছে নেই মহারাজ।'

লক্ষণ বুঝতে পারে এই অপগণ্ড সভাগৃহে ওকে ডেকে আনা উচিত হয়নি। ওর সঙ্গে একান্তে বসতে হবে রাজ্যের খবরাখবর জানার জন্য। বলে, 'অনেক দূর থেকে এসেছ আরণ্য। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত। বিশ্রাম নাও গিয়ে। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।'

'মহারাজের আদেশ যেমন।'

'ভালো থেক।'

'আপনার আশীর্বাদ, প্রভু।'

আরণ্যের উপস্থিতি একটা রসভঙ্গ নিয়ে এসেছিল লক্ষণের সভাগৃহে। হাসি ও কৌতুকে ভাড়ের দল আবার তৎপর হয়ে ওঠে। এই সব কুটিল ও কপট ছারপোকাদের সঙ্গে লক্ষণের সভা চলে প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত। রাতে একটুও ঘুম হয় না লক্ষণের। বার্ধক্যজনিত কারণগুলো তো রয়েছেই, তার উপর রাজ্যের এই নিদারুণ অবস্থা! এই সব চাটুকারের দল বুঝতেও পারছে না ভবিষ্যতটা কী হতে যাচ্ছে। পাশের ঘরে আগুন লাগার পরও যে ঘুমিয়ে থাকে সে হয় নির্বোধ নয় পাষণ্ড। এরা কোন গোত্রের তা বুঝে উঠতে পারে না লক্ষণ। একটু দেরি করে বিছানা ছেড়ে ওঠে সে। মেঘমুক্ত পরিষ্কার নীল আকাশ। তীব্র উজ্জ্বল রোদ লক্ষণাবতীর নতুন আকাশ চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মন চাঙা হয়ে ওঠার মতো জলহাওয়া। একান্তে কথা বলার জন্য আরণ্যকে ডেকে পাঠায় লক্ষণ।

ওকে প্রণাম সেরে আরণ্য বলে, 'মহারাজ, গতকালের অপরাধের জন্য ক্ষমা করবেন আমাকে। আসলেই এক নগণ্য মানুষ আমি। ভুলতে পারি না যে-

ধুলো থেকে কুড়িয়ে এ পর্যায়ে আমাকে এনেছেন আপনি। রাজসভায় একেবারেই মানায় না আমাকে।'

'ওভাবে দেখ না আরণ্য। তুমি আমার একজন অতি-আস্থাভাজন সেনাধ্যক্ষই নও, আমার বাল্যসখাও। সভাঘরের ওইসব কীটদের খুব ভালো করে জানি আমি । কী করব বলো, তুমিও তো বোঝো, ওদের কাছে কত অসহায় হয়ে পড়েছি এখন।'

'আজ্ঞে মহারাজ। কিছুটা হয়তো বুঝি, এসব কিছু তো এক দিনে সৃষ্টি হয়নি।'

'হ্যাঁ আরণ্য, দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়েছে আমাদের ভুলগুলো। গড়ে উঠেছে এই পাপের নরকনগর। বেড়ে উঠেছে পাপচক্র। এখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ এখন আর জানা নেই আমার। ভেবে কোনো কিছুরই কূলকিনারা করতে পারছি না। যাহোক, তোমার খবর বলো আরণ্য।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, জানানোর মতো ভালোকিছু তো নেই আমার কাছে।'

'ওটা জানি আরণ্য। খারাপগুলোই বলো।'

'সংক্ষেপে বলি মহারাজ। মগধ ও মিথিলা বিষয়ে এখন আর কিছু না ভাবাই ভালো।'

চুপ করে থাকে লক্ষণ সেন। আবার বলে আরণ্য, 'এমন অরাজক অবস্থা বর্ণনার অযোগ্য মহারাজ। যে-কারোরই নিয়ন্ত্রণের বাইরে ওটা।'

'তবে?'

'তুর্কিদের বিষয়ে যতটা জানতে ও বুঝতে পেরেছি, গঙ্গা-ভাগীরথী অতিক্রম করে আসার মতো অবস্থা এখন ওদের নেই।'

'কোথাও না কোথাও তো থামাতে হবে ওদের।'

'ওরা সত্যিই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।'

'কীভাবে?'

'কারণ, আমরাই ওদের জন্য পথ কেটে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ভাবনার বিষয়ই বটে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ধরে গঢ়ীদ্বার হতে খাট্টিকা পর্যন্ত একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবূহ্য গড়ে তোলা যেতে পারে না?'

'মহারাজের হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী ও পদাতিক সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেও তো ওরকম কয়েকটা প্রাচীর গড়ে তোলা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় ওরা কোনো কাজে আসবে?'

'হাতে গোনা কটা দস্যুর হাতে দাঁড়িয়ে মার খাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মার খাওয়া তো নয় শুধু, একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।'

'সত্যিই বুঝতে পারছি না আরণ্য, কী করা উচিত আমার।'

'বিষয়টা জটিল হয়ে পড়েছে মহারাজ।'

'এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ কী আরণ্য?'

'খুব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন মহারাজ।'

'অস্ত্র চালানোর মতো শক্তি কী আমার কব্জিতে আছে আরণ্য? দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিই নেই পায়ে।'

'মহারাজ, যুদ্ধটা করতে হয় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই।'

'এখন কী পরমর্শ দাও তুমি?'

'আমারও দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পায়ে নেই মহারাজ। টিকে আছি শুধু মনের জোরে।'

'ওভাবে বলো না আরণ্য। এখনো আমার আস্থার জায়গাটা ধরে রেখেছ তুমি।'

'আমি কী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব মহারাজ?'

'তুমি কী এইসব সামন্ত ও মহাসামন্তদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবে?'

'তা নিশ্চয় পারব না মহারাজ।'

'এক কাজ কর আরণ্য, তুমি গঢ়ীদ্বারটা সামলাও। গৌড়ে ঢোকার এটাই সম্ভাব্য পথ। কর্ণসুবর্ণে রাখ মাধবকে।'

'সপ্তগ্রামে?'

'আশা করি অজয় সেন ওটা আগলে রাখতে পারবে।'

'মহারাজ কী লক্ষণাবতীতে অবস্থান করবেন?'

'সব সময় না। বরং ঔদাম্বরিকের কাছাকাছি বা আরো পশ্চিমে আমার হস্তীবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকব।'

'বিক্রমপুরে কারো থাকা দরকার না মহারাজ?'

'আপাতত ওই ভাবনাটা সরিয়ে রাখছি আরণ্য।'

'যুবরাজ কেশব সেন কোথায় থাকছেন?'

'ও লক্ষণাবতীতেই থাক। ওকে সরিয়ে লাভ নেই।'

'মহারাজ তাহলে মগধ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন।'

'তুমি বললে ওটা এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে।'

'তাই বলেছি মহারাজ। অচিরেই ওটা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়বে। যে যেদিকে পারে সরে পড়ছে। সামন্তসৈন্যরা, তুর্কিসেনারা, যে যা পারে লুটতরাজ করছে। সাধারণ মানুষজন কখনো নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। দুদশজন সৈন্যের কোনো দলকে ধরাশায়ীও করে ফেলে। কিন্তু ওটার প্রতিক্রিয়া

হয় আরো ভয়াবহ। খবর পেয়ে তুর্কিদলের সৈন্যরা ওইসব জনপদ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।'

'তাহলে ওখানে গিয়েও বা করব কী আমি?'

'মহারাজের উপস্থিতিই অনেককিছু। অন্তত স্থানীয় সামন্তরা মাথা নুইয়ে থাকবে। আর তুর্কি দস্যুদের এত সাহস এখনো হয়নি যে সরাসরি মহারাজের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করবে। সংঘবদ্ধ দস্যুদলের মতো ঝড়োগতিতে আক্রমণ করে যা পারে তাই নিয়ে সটকে পড়ে ওরা। এর বেশি ওদের চাওয়া বোধ হয় আপাতত কিছু নেই।'

'ঠিক আছে আরণ্য, ভেবে দেখি।'

গভীর ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে যায় লক্ষণ সেন। চুপচাপ বসে থাকে আরণ্য। ওর মনের ভেতরও রাজ্যের দুশ্চিন্তা। জীবনের এত কটা বছর অতিক্রম করে এসে এখন বানপ্রস্থে যাওয়ার কথা ওদের। নির্মোহ নিরুদ্বিগ্ন এক জীবন যাপনের কথা। আর এখন কিনা ভাবতে হচ্ছে যুদ্ধভাবনা! শরীরে শক্তি নেই, মনে জোর নেই, রাজ্যে শৃঙ্খলা নেই! এই দুই বৃদ্ধ এখনও ভেবে চলেছে জীবন ও জগতসংসার নিয়ে!

লক্ষণ বলে, 'আরণ্য, চল আজ একটু পান করি।'

'পারি না যে আর মহারাজ, অস্ত্রে ব্যথা হয় খুব।'

'আমিও পারি না আরণ্য। তবুও কেন জানি ইচ্ছে হলো... আচ্ছা থাক।'

'না মহারাজ, সামান্য হোক।'

'এসো, নাচঘরে।'

স্বল্প আলোর পিদিম জ্বালিয়ে পানপাত্র হাতে নাচঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পায়চারী করে দুজনে। তারপর সামনাসামনি বসে কৈশোরের ঐ দিনগুলোর মতো। কিন্তু কোনো কথা যে আর খুঁজে পায় না ওরা। ঘুমে ঢলে পড়ে লক্ষণ সেন। চুপচাপ বেরিয়ে আসে আরণ্য। মাথার উপরে জ্বলছে তখন অসংখ্য নক্ষত্র। সেনরাজ্যটা রক্ষা করার জন্য মহর্ষিরা, মহামুনিরা জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে লক্ষণাবতীর আকাশ থেকে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

অনেক সাধ্যসাধনা করেও মহারাজাধিরাজ লক্ষণ সেন গেন্ড় সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় রাজ্যের ভেতর থেকে ভিটের মাটি কেটে সুরঙ্গ বানিয়ে ফেলা ইঁদুরবাহিনীর জন্য। পিতাজি বল্লাল সেনের আমলেই জাঁকিয়ে বসেছিল তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরা। তন্ত্রমন্ত্রে এতটাই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল সবাই যে বল্লাল সেনের অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটাই জ্যোতিষ-নিবন্ধে ভরে উঠেছিল। তন্ত্রসাধনা দিয়ে যদি রাজ্য পরিচালনা করা যেত, তাহলে এত যুদ্ধবিগ্রহ এত সৈন্যসামন্তের কী প্রয়োজন ছিল, এ বিষয়টা বল্লালকে বোঝানো সম্ভব হয়নি। এখন পুরোটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এমনকি লক্ষণকেও জ্যোতিষদের কাছে হার মানতে হয়। জ্যোতিষের পরামর্শ ছাড়া অথবা অনুমতি ছাড়া কোনো যুদ্ধযাত্রা সম্ভব হয় না। রাজমন্ত্রী পশুপতি পর্যন্ত জ্যোতিষের নিয়ন্ত্রণভুক্ত, রাজমহিষীরা তো বটেই। এমন এক নৈরাজ্যকর অবস্থায় পূর্বপুরুষের ক্ষত্রিয় সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তার উপর পিতাজি কর্তৃক প্রবর্তিত অথবা সম্মতি-প্রদত্ত কৌলিন্য প্রথা সমাজের উপর আরেক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণি এইসব কুলীনদের দ্বারা দীর্ঘকাল নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত হয়ে রাজ্যের ভালোমন্দের সঙ্গে একাত্মবোধ করে না।

জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনো রাজার দীর্ঘদিন টিকে থাকা যে অসম্ভব তা বোঝার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। পরাক্রমশালী পালরাজাদের ক্ষমতায় এনেছিল জনগণ, আবার এদের পরিণতিও ঘটেছে একটা গণবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে। পালরাজ্য ধ্বংসের জন্য গণঅসন্তোষ একটা বড় কারণ। এরকম এক সময়ে, যখন পশ্চিমের বিধর্মীদের হাতে ভারতবর্ষের রাজরাজারা একে একে লুটিয়ে পড়ছে তখন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শক্তিসাম্যের যে প্রয়োজন কতটুকু হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পায় লক্ষণ সেন। এই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে খুব

অসহায় মনে হয় নিজেকে। গহরবালের মগধ রাজ্যটায় অভিযান চালিয়ে হয়তো ভুলই হয়েছিল। ওরা শক্তিশালী থাকলে তুর্কিদের আক্রমণ অন্তত ঠেকিয়ে রাখতে পারত কিছু সময়। ততক্ষণে গুছিয়ে নিতে পারত সেনরাজারা। এমনকি একটা রাজ্যসংঘশক্তি গড়ে তোলার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হতে পারত।

সারা জীবনে যত যুদ্ধ করেছে লক্ষণ সেন, পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়নি কখনো। জয়ের আনন্দ উদযাপন করে এসেছে আজীবন। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করেছে। আশি বছর পেরোনোর পর মানুষের মস্তিষ্কই বা আর কতটা কর্মক্ষম থাকে! এই একটা কিছু পরিকল্পনা করে তো একটু পরেই আবার ভুলে যায়। কেউ যখন আবার মনে করিয়ে দেয়, তখন অন্যটা মাথায় উঠে এসেছে। আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পিতাজির তান্ত্রিক সাধকগোষ্ঠী আর রাজজ্যোতিষিদের প্ররোচণার বাইরে যাওয়াও এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের কব্জিতে জোর না থাকলে অন্যের কব্জি দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। সামান্য কটা লুটেরা দস্যুর হাতে মগধ হারিয়ে এক রকম দিশেহারা হয়ে পড়ে মহারাজাধিরাজ লক্ষণ সেন। মগধে পরাজয়ের পর প্রজারাও আর সেনরাজাদের উপর ভরসা রাখতে পারছে না। মগধের পতনের পর ওই দস্যুরা রাজ্যটাতে যা করেছে তাতে বেঁচে থাকা প্রজাদের সবাই পুবে ও উত্তরে পালিয়ে কোনো রকমে জীবন বাঁচিয়েছে। মগধ এখন এক জনশূন্য শ্মশানপুরী। ওদের নির্মমতা এত ভয়াবহ যে সৈন্যদের মনেও ভয় ধরে গেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করা দূরে থাক যুদ্ধের কোনো নিয়মই ওরা মানে না। ভারতবর্ষের রাজারা ঐতিহাসিক কাল থেকে যুদ্ধ করে এসেছে রাজায় রাজায়। যুদ্ধের সকল নিয়মকানুন রক্ষা করে চলে ওরা । তস্করদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ওদের নেই। তাছাড়া, যুদ্ধকৌশলও এসব তস্করদের ভিন্ন।

অতর্কিত আক্রমণে তুর্কি ভাগ্যান্বেষী এক তস্কর বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা মহাবিহার অধিকার করে নেয়! লক্ষণের মাথায় কোনোভাবেই আসে না যে এটা রক্ষা করার ক্ষমতা কেন ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করেনি? এটাও মেনে নিতে হয় লক্ষণ সেনকে!

মহাবিহারকে রাজার প্রাসাদ ভেবে লুটতরাজের জন্য হন্যে হয়ে ফিরে ওরা। ওখানে ব্যর্থ হয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত জ্ঞানভাণ্ডার। অকারণে হত্যা করে হাজার হাজার মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধভিক্ষু। মগধরাজ্য লুট করে নিজেদের রক্ত পিপাসা মেটায়। বৌদ্ধরা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিল নিজেদের অন্তর্শক্তি। পালরাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অস্তাগমনও শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে। শেষ পর্যন্ত এর অবসান ঘটে বখতিয়ারের নৃশংস কালোহাতে। গৌড় হতে বৌদ্ধধর্ম পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় কালক্রমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগধ লুণ্ঠনের আরো যে খবর এসেছে লক্ষণের কাছে তাতে শিউরে উঠতে হয়। নিরস্ত্র জনগণকে কচুকাটা করে ও ওদের সম্পদ লুট করে হঠাৎ যেন সাত রাজার সম্পদ পেয়ে যায় ওরা। বিশাল প্রাসাদসম এক অট্টালিকার সামনে এসে দিশে হারিয়ে ফেলে। লুট করে জড়ো করা সবকিছু ফেলে ধেয়ে যায় ওদিকে। মনে মনে ভাবে, প্রাসাদের মণিমুক্তা ছেড়ে ওরা কিনা এতদিন কুড়িয়েছে যত সব খুদকুড়ো! ঝড়ের বেগে এগিয়ে যায় নালন্দার ওই বিখ্যাত মহাবিহারের দিকে। ভয়ানক একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল ওরা। অথচ কোনো বাধা ছাড়াই ঢুকে পড়ে তথাকথিত ঐ প্রাসাদের ভেতর। বৌদ্ধভিক্ষুরা তখন জোরেশোরে তন্ত্রমন্ত্র জপ করে চলেছে ঐ সব তুর্কিদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য! নির্মম তলোয়ারের আঘাতে হাজার হাজার মুণ্ডিতমস্তক অসহায় ভিক্ষু পবিত্র মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিহারের ভেতর থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যায় ফল্গু নদী পর্যন্ত। সোনাদানা হিরে-জহরত, কোনো কিছু না পেয়ে রাগে জ্বলতে থাকে ওই সেনাদল। বইপুস্তকের জঞ্জাল দেখে ওদের রাগ আরো বেড়ে যায়। ওটার উপশম ঘটায় শত সহস্র মানুষের সুমহান অর্জান, অমূল্য ওই জ্ঞানভাণ্ডারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। ওরা বলে, মানুষের সৃষ্টি শুধু প্রভুর আরাধনার জন্য, আর এইসব অবিমৃষ্যকারীরা কিনা এখানে জ্ঞানের চর্চা করে, ফুঃ! মাসের পর মাস ধরে জ্বলে ঐ আগুন!

সামান্য একদল দুর্বৃত্তের হাতে মগধের মতো শক্তিশালী এক প্রাচীন রাজ্যের পতনের পর হতাশায় ভেঙে পড়ে লক্ষণ সেন। মনে মনে ভাবে, এখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ জীবনটা ধরে রাখার কিই বা প্রয়োজন? জীবনের প্রায় আশিটা বছর অতিক্রম করেছে লক্ষণ বিজয় উৎসবের আনন্দ উদযাপন করে। পরাজয়ের কালিমা কখনো ছুঁতে পারেনি ওকে। এখন এই বুড়ো বয়সে, যখন বাহুতে বল নেই, সেনাদলে শৃঙ্খলা নেই, জ্যোতিষদের ভণ্ডামির ভেতর অপসিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি, সামন্তরা ভোগবিলাসে উন্মত্ত, প্রজারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত, ওদের রক্ষা করার কেউ নেই, তখন সাম্রাজ্য রক্ষা করবে কে? পর মুহূর্তেই আবার ভাবে, এসব ভেবে আর লাভ কী এখন!

সান্ত্বনা দেয় আরণ্য। ভাবনার জগত থেকে লক্ষণ সেনকে কিছুটা সরিয়ে আনতে চেয়ে বলে, 'আক্ষেপ করার কিছু নেই মহারাজ। ব্যক্তিমানুষ কখনো জানতে পারে না কোনটা ভালো। এমনকি শেষ মানুষটিও না। কারণ সে তো জানবেই না যে ওখানেই শেষ হয়ে গেছে সব। ব্যক্তিমানুষের শেষই তো মানবজন্মের শেষ না। একটার শেষ না হলে আরেকটা তো শুরু হতে পারে না। পরেরটা যে ভালো হবে না, কী করে বলি প্রভু। আপনি হয়তো অনুশোচনা করতে পারেন আপনার রাজ্যটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে। প্রকৃতির নিয়মেই কোনো না কোনোদিন এটার শেষ তো হবেই।'

'সান্ত্বনা দিচ্ছ?'

চুপ করে থাকে আরণ্য। অনেকক্ষণ পর কথা বলে লক্ষণ সেন, 'এমনকি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগছে না আরণ্য।'

'অনুমতি দিন তো ফিরে যাই আমি।'

'যাবে আরণ্য? মন যে তাতেও সায় দেয় না। খুব বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করছি।'

'চুপচাপ শুধু একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, মহারাজ।'

'ঘুম! খুব মজার একটা কথা বললে আরণ্য!'

'বিশ্রাম হলেও নিন।'

'জীবনের এমন একটা পরিণতি হবে জানলে হয়তো এটা শুরুই করতাম না আরণ্য।'

'জীবন কী কেউ নিজে শুরু করে, না শেষ করতে পারে, মহারাজ।'

'এই রাজার জীবনটা বোঝাতে চেয়েছি আরণ্য।'

'কোনো জীবনেরই পরিণতি জানা থাকে না মহারাজ।'

'শেষটাও তো জানা থাকে না আরণ্য।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'ভাববেন না মহারাজ, জীবনের বাকিটাও দেখবেন খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেছে।'

'বাকি আছে কী আর?'

'এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি মহারাজ।'

'না আরণ্য। যদি যৌবন থাকত আমার শরীরে তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম যে এমনটা কোনোভাবে ঘটতে পারত না। কিন্তু এখন যে বলার কিছু নেই আমার!'

'সময় এক বড় অনুষঙ্গ, মহারাজ।'

'এত বুড়িয়ে গেলাম কীভাবে, আরণ্য? যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যৌবনের শক্তিমত্তা, তখনই এসে গেল এই জড়ার কাল! কেন আর দু'যুগ আগে হাতের নাগালে পেলাম না এই তুর্কি তস্করদের!'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, ক্রোধবশত ওদের হয়তো তুর্কি তস্কর বলছেন। অনেক বীরযোদ্ধা আছে ওদের মধ্যে। প্রকৃত শক্তিধর সেনাপতি আছে।'

'কারো সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে তোমার আরণ্য?'

'না মহারাজ, সব শুনেছি।'

'বেশ তো।'

'আমাদের ভারত উপদ্বীপের মানুষের যেমন অনেক বদগুণ রয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে আরব উপদ্বীপের মানুষদের আছে অনেক সদগুণ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যেমন?'

'ব্যাখ্যাটা একটু বড় হয়ে যাবে। ধৈর্য থাকবে মহারাজ?'

'থাকবে আরণ্য, তুমি বলো।'

'একটু পেছন থেকে বলি মহারাজ।'

'বলো আরণ্য, আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

'তুর্কিদের এই ধর্মের সূচনাকাল কিন্তু ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। আরব উপদ্বীপের শতধাবিভক্ত কবিলাগুলো ছিল সার্বক্ষণিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। আমাদের এই সময়ের ভারতীয় রাজাদের মতো বলতে পারেন। ওদের একটা অংশ ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আর একটা অংশ ছিল বণিক। এদের যাতায়াত ছিল ঐ সময়ের জানা বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। সাধারণ মানুষদের ভেতর কবি ও ভাবুকদের ছিল প্রাধান্য। ওদের স্মৃতিশক্তি প্রখর। ভাষা সুললিত ও অপূর্ব ছন্দময়। কিন্তু রাজনীতির কোনো মেধা বা জ্ঞান ছিল না ওদের। ফলে কোনো দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি ঐ ভূখণ্ডটা। অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করত ওরা। ফলে বিভাজনও ছিল অগুনতি। এদের ভেতর ইসলামের আশ্চর্য সাফল্য শুধু যে উপদ্বীপের মানুষদেরই পাল্টে দিয়েছে, তাই না, পুরো বিশ্বকেই পাল্টে দিয়েছে। ইউরোপীয় অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছে এই মুসলমানেরাই। একেশ্বরবাদিতা ও ধর্মবিশ্বাসে প্রবল আস্থা এক অভাবিত ঐক্য এনে দিয়েছিল ওদের ভেতর। ঐ অসাধারণ ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে গ্রীস, রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলো হার মেনেছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় তখন ঘুনে ধরেছে। ওদের অবক্ষয়াবস্থা থেকে উত্তরণের পথ দেখায় নতুন এই ধর্মনুসারীরা। খ্রিষ্টধর্ম তখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল কুসংস্কার ও বিভিন্ন রকম যাদুটোনার ভেতর। তমসাচ্ছন্ন ও হতাশাগ্রস্ত জনগণকে মুক্ত করার জন্য এক অভূতপূর্ব আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে ঐ ধর্মটা। আরব উপদ্বীপের এক ধর্মশক্তি তখন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। মরুভূমির আরব যাযাবরদের ঐক্যের সাফল্য ছড়িয়ে পরেছিল সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত। আকণ্ঠ দুর্নীতির ভেতর ডুবে থাকা বাইজেন্টাইনিয়দের পরাজয় ঘটেছিল দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধাদের হাতে। খ্রিষ্টিয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও যাজকীয় অত্যাচারে নিপিষ্ট মানুষগুলো ইসলামকেই দেখতে পেয়েছিল ত্রাতারূপে। পারস্যদেশীয় নির্মম স্বৈরশাসনের যাঁতাকল হতে মুক্তি এনে দিয়েছিল ঐ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। খুব সামান্যই বললাম মহারাজ। ওদের সাফল্য অনেক।'

'মনে হয় পর্বত প্রমাণ!'

'আজ্ঞে মহারাজ। শুধু যে রাজনীতিতে, তাই না। চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সব বিষয়ে গত পাঁচশ' বছরে এই আরব

উপদ্বীপ হতে উৎসারিত মানুষেরা যে কত এগিয়ে গেছে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এর বিপরীতে আমাদের ভারত উপদ্বীপের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের জ্যোতিষীরা এখনো মাটিতে রেখাঙ্কন করে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি জয়পরাজয় নির্ধারণ করছে।'

এক সঙ্গে এত কথা বলে একটু থামে আরণ্য। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ ও ভঙ্গুর লক্ষণ সেন। ঘরঘরে গলায় বলে, 'একবিন্দু মিথ্যেও বলোনি আরণ্য। এর প্রায় সব আমিও জানি। কিন্তু কত যে অসহায় আমি, হায় ভগবান!'

'মিথ্যা বলা শিখিনি তো মহারাজ। চার বছর বয়সে পিতৃহীন হয়েছি। আপনার পিতাজিকে পিতার মতো জেনেছি। পিতৃস্নেহ যা পেয়েছি, তাঁর কাছ থেকেই। আপনার কাছ থেকে কী পেয়েছি তা তো প্রকাশ করার নয় মহারাজ। জীবন থেকে পালিয়ে অন্য আরেক জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। ভগবান আবার এখানেই ফিরিয়ে পাঠিয়েছেন। এটাকেই মেনে নিয়েছি। মিথ্যার কোনো প্রয়োজন পড়েনি জীবনে। আর এখন তো প্রশ্নই আসে না।'

'না আরণ্য, ওরকম কিছু বোঝাতে চাইনি।'

'বুঝেছি মহারাজ।'

'ঠিক আছে আরণ্য, এসো এখন। সত্যিই ক্লান্ত আমি।'

'শুভরাত্রি মহারাজ।'

'শুভরাত্রি।'

অনেকদিন পর গভীর ঘুমে প্রায় অচেতন হয়ে রাতটা অতিক্রম করে লক্ষণ সেন। ভোরের টুংটাং ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলে চোখ খুলে লক্ষণ। একটা বাল্যস্মৃতি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। বল্লালপুরীতে ঘুম ভাঙতো পুরোহিতদের কংস্যধ্বনিতে। শরীরটা এখন এত হালকা মনে হয় যেন সে ফিরে গেছে ঐ সব দিনে। একটু পরে দাদু আসবে অস্ত্রচালনা শেখার মাঠে নিয়ে যেতে। মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে দেখবে সেসব। তারপর নিয়ে যাবে সাঁতার কাটতে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে এখন সাঁতার কাটতে। সবকিছু ভুলে লাফিয়ে উঠতে যায় ওই কৈশোরকালের মতো। সঙ্গে সঙ্গে কোমরের হাড়ে ও পায়ের পেশীতে একসঙ্গে টান ধরে। ব্যথায় চিৎকার দিয়ে ওঠে সে। দৌড়ে আসে ভৃত্যেরা। কথা বলার মতো শক্তিও লক্ষণের নেই। মুহূর্তের ভেতর বৈদ্যের দল এসে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘ শুশ্রূষার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠে লক্ষণ। কিন্তু শরীরের তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে পুরো একহপ্তা পড়ে থাকতে হয় বিছানায়।

একটু সুস্থ হয়ে উঠার পর আবার শুরু হয় প্রাত্যহিক জীবন। ভোরের সূর্য উঠার অপেক্ষায় ছিল সেনাপতিরা। পারিষদেরাও এসে উপস্থিত হতে থাকে। পশুপতির ম্লানমুখ দেখে কিছুটা ধারণা করতে পারে লক্ষণ যে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভসংবাদ নেই। দৈত্যের শরীর, কিছুটা বয়স্ক, ঔদাম্বরিকের সেনাপতি উমাচরণ বর্মনকেই প্রথমে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'কোনো খবর আছে উমাচরণ?'

মাথা নিচু করে একটু ভাবে উমাচরণ। কোনটা দিয়ে শুরু করবে। মহারাজের শরীর ও মেজাজ, দুটোই বিগড়ে আছে। ওর ইতস্তত দেখে আবার বলে লক্ষণ, 'ভাবাভাবির কোনো কারণ নেই সেনাপতি। আমি জানি কোনো সুসংবাদ এখন অপেক্ষা করে নেই আমার জন্য। ওসব কেউ অপেক্ষমান রাখে না। বলো, নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে বলো।'

'মহারাজ, মাথা নিচু করে এ রাজদরবারে কখনো প্রবেশ করেনি উমাচরণ, তাই একটু সঙ্কট হচ্ছে।'

'জানি উমাচরণ। কত অসংখ্য যুদ্ধে যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছ তুমি, তার কোনোটাই ভুলিনি।'

'সেসব ম্লান হয়ে গেছে মহারাজ। মুছে গেছে ঐ সব কীর্তিগাথা।'

'যাহোক, খবর কী বলো। আমার বয়স হয়েছে উমাচরণ। কানেরও তো আয়ু আছে, তাই না?'

'কঙ্কগ্রামভুক্তি থেকে দূত ফিরে এসেছে গত পরশু।'

'আগে জানাওনি কেন?'

কীভাবে বলবে উমাচরণ যে মহারাজ তখন রোগশয্যায় অজ্ঞান! মাথা নিচু করে থাকে।

'ঠিক আছে, খবর বলো।'

'আমাদের সেনাদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে' একটু থেমে বলে, 'যদি অনুমতি দিন তো বলি ওটা ভেঙেই গেছে।'

'কেন?'

'অনেক বিষয় জড়িত এর সঙ্গে। প্রথমটা যদি বলি, ওখানের সামন্তরাজাদের অসহযোগ। সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ করাই সম্ভব হয়নি। ফলে অনেকে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে লুটতরাজে মেতে ওঠে।'

'হুঁ।'

'তারপর সৈন্যরা আসবপান ও বণিতাগমনে আসক্ত হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অনেকে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। ক্ষেত্রজীবীরা চাষাবাদ বন্ধ রেখেছে। কারণ ফসল লুট হয়ে যায়।'

'আরো আছে?'

'বণিকেরা ওদিকটায় যেতে সাহস পাচ্ছে না। দস্যুদলের উৎপাত এত বেড়েছে যে ওদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

'বুঝতে পারছি উমাচরণ, তোমার তালিকা শেষ হবে না।'

'আদেশ করুন মহারাজ।'

'আদেশ করব আমি? তুমিই বলো কী আদেশ চাও?'

কোনো কথা যোগায় না সেনাপতির মুখে। পশুপতিকে দেখিয়ে লক্ষণ বলে, 'ওদেরকে জিজ্ঞেস কর উমাচরণ, আমার কাছ থেকে কোনো আদেশ নেই। আছে শুধু একটা দীর্ঘ জীবনের বোঝা। জানি না ভগবান কেন এতটা আয়ু দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমাকে!'

'মার্জনা করবেন মহারাজ, আমার সাধ্যের ভেতর যা কিছু করণীয় তার সবই করেছি। জীবনে যা করিনি, তাও করেছি। এমনকি আমার সেনাপতিত্বও সৈন্যদের যে কাউকে গ্রহণ করে সেনাদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছি। আজীবন সৈন্যদল পরিচালনা করে এসেছি, সবসময় আদেশ দিয়ে এসেছি, সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খ পালিত হতে দেখেছি। এই প্রথম সৈন্যদের কাছে করজোড়ে আবেদন জানিয়েছি।'

'উমাচরণ, ঐ একটা ভুলই হয়তো করেছ জীবনে। সৈন্যদের কাছে কখনো আবেদন জানাতে হয় না, ওদেরকে শুধু আদেশই দিতে হয়।'

'কী করব মহারাজ, আমারও তো বয়স হয়েছে। শক্তি সামর্থ্য কমে গেছে। যা কিছু করেছি তার সবই রাজ্যের স্বার্থে।'

'ওটাই বড় কথা সেনাপতি। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, আর আমাদের তরুণদের প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছি। এই তুর্কিদের ও পৃথিবীর অন্যান্য আগ্রাসী শক্তির ইতিহাসটা আমাদের জানার জন্য দাদুমশায় একঘর গুরু-শিক্ষক রেখেছিলেন। শিক্ষাটা হয়তো ঠিক মতো নেইনি আমরা। আমাদের তরুণদের প্রস্তুত করতে সক্ষম হইনি।'

'আরো কিছু সংবাদ আছে মহারাজ।'

'ওবেলা শুনলে হয় না?'

'ওগুলোর সব কটাই খারাপ না। দুএকটা মিশ্র সংবাদও আছে।'

'ঠিক আছে, ওগুলোর একটা বলো এখন। খুব ক্লান্ত আমি, সেনাপতি।'

'সুহ্ম থেকে দূত এসে পৌঁছেছে আজ খুব ভোরে।'

'কী খবর?'

'ওখানের সাধারণ মানুষজন নিজেরাই তুর্কিদের বিপক্ষে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।'

'বেশ তো। ওদের সহায়তায় একদল সৈন্য পাঠিয়ে দাও।'

'সমস্যা হচ্ছে ওদের ভেতর কোনো নেতৃত্ব না থাকায় কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না। তাছাড়া ওখানে মহাসামন্তের সৈন্যদল জনসাধারণের ভেতর যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে তাতে আমাদের প্রতি কোনো আস্থা ওদের নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পরাজিতের প্রতি কারো আস্থা থাকে না সেনাপতি। কোনো একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসো। দেখেবে, সবাই এসে দাঁড়িয়েছে তোমার পেছনে।'

'যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্যটাই আবার ফিরে পেতে চাই মহারাজ।'

'সন্ধ্যায় এস উমাচরণ, কথা হবে, যদি সুস্থ থাকি।'

'প্রণাম মহারাজ।'

'এসো সেনাপতি।'

উমাচরণ বেরিয়ে গেলে ইশারায় ভৃত্যকে কাছে ডেকে বলে রাজমহিষীকে পাঠিয়ে দিতে। তিনি এলে ওর কানে কানে বলে, 'এই পশুর দলটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কর তো এখান থেকে।'

'ঠিক আছে মহারাজ। এক্ষুণি চলে যাবে ওরা। মহারাজ কী আবার অসুস্থ বোধ করছেন?'

'ঘুণপোকারা যে ভেতর থেকে আমার রাজ্যটাই খেয়ে ঝুরঝুরে করে ফেলেছে, শুধু তাই না, আমার শরীরটাকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে দেবী।'

'মনোবলটা ধরে রাখুন মহারাজ।'

'ওটা নিয়েই তো এখনো টিকে আছি।'

কথা কটা বলেই সিংহাসনে এলিয়ে পড়েন মহারাজ লক্ষণ সেন। ভৃত্যেরা ধরাধরি করে শয়নকক্ষের পালঙ্কে নিয়ে শোয়ায় ওকে। এই অসুস্থতা কখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি আর লক্ষণ সেন।

পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত জয়ী হওয়ার বাসনা মানুষের মেটে না। নিজের জানা পুরোটা পৃথিবী জয় করার পরও আক্ষেপ থেকে যায়। হায়, একটাই কেন পৃথিবী! জীবনের এই অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত অপরাজিত লক্ষণ সেন তুর্কিদের হাতে পরাজয় মেনে নেয়ার চেয়ে জীবনের অবসানই কামনা করে। বিহার রাজ্য হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ায় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি রক্ষার্থে গঢ়ীদ্বারের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করে তুলে।

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠার জন্য রাজধানী লক্ষণাবতী থেকে কিছুটা দূরে, নওদায় এক অস্থায়ী প্রাসাদে অবস্থান করছিল লক্ষণ সেন। বাংলা আক্রমণের সাধারণ পথ গঢ়ীদ্বার দিয়ে না এসে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চুপিসারে তিন হাজার দুর্ধর্ষ তুর্কি যোদ্ধার একটা দল নিয়ে বাংলায় ঢোকে অশ্বারোহী বখতিয়ার। ওর ছোট্ট সৈন্যদলটাকে ধারেকাছের ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে রেখে সতেরোজন অসমসাহসী ঘোড়সওয়ার নিয়ে লক্ষণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়। কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ও নিজেদের অশ্বব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে রাত কাটানোর জন্য প্রাসাদের ভেতর অবস্থান করার অনুমতি সংগ্রহ করে নেয় ওরা।

লক্ষণের মনে গোপন বাসনা রয়েছে এদের কাছ থেকে তুর্কিদের রণকৌশল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেবে। ভারতবর্ষের হেরে রেরে রণযাত্রার চেয়ে এদের যুদ্ধকৌশল একেবারে ভিন্ন। এত ঝড়োগতিতে এরা সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে কিছু বোঝার আগেই এদেশীয় সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কোনো অবস্থায় আর এদের ভেতর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই তখন ওদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয়দের যুদ্ধকৌশলে পাইক ও তীরন্দাজের ভূমিকা প্রথমে। তারপর দীর্ঘবর্শা ও উঁচুঢাল নিয়ে তীব্র গতিতে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের রক্ষাবূহ্য ভেঙে দেয়। এর পরের ধাপে ঘোড়সওয়ারীরা তলোয়ার হাতে মূল যুদ্ধটা শুরু করে। এর আগেই ধনুক বাহিনী তীর ছুড়ে প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু তুর্কি ঘোড়সওয়ারদের গতি এত বেশি যে তীর ওদের নাগালে পৌঁছার আগেই পাইক-বরকন্দাজদের উপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। ওদের আক্রমণকৌশল ও যুদ্ধসাজ একেবারে ভিন্ন ধরনের। সোজাসুজি না এসে ধনুকের মতো দুদিক থেকে চেপে ধরে। তখন প্রতিপক্ষ সৈন্যদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ থাকে না। তারপর ধনুকের দুদিক থেকে বিদ্যুতগতিতে সৈন্যদের পেছনে এসে মধ্যবরাবর জড়ো হয়ে তীরের গতিতে প্রতিপক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। ফলে সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারদিক থেকে মার খেতে থাকে। জীবন বাঁচানোর জন্য তখন শুধু খুঁজতে থাকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা। পলায়নপর ঐ সৈন্যদের বাঁধা দেয় না ওরা। ঐ সৈন্যরা মনোবল ফিরে পেয়ে কখনো আর ওদের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না, এটা বুঝে গেছে ওরা। বরং ওদের মধ্য থেকে সাহসীরা হয়তো ফিরে আসবে তুর্কি সৈন্যদলে যোগ দেয়ার জন্য। নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার জন্য!

দলেদলে মানুষজন মগধ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এখন রাঢ়েরও যদি এই অবস্থা হয় তাহলে রাজ্যটা দাঁড়াবে কোথায়! তীব্র মনোকষ্ট বুকে চেপে আহার করতে বসে লক্ষণ সেন। এরমধ্যে কোলাহল শুনে জানতে চায় বিষয়টা কী?

'ভয়ানক দুঃসংবাদ, মহারাজ। ওই ঘোড়সওয়ারীরা অকস্মাৎ আক্রমণ করে আমাদের প্রহরীদের হত্যা করেছে। প্রাসাদরক্ষীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে কোনোভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে ওদের। প্রাসাদের দরোজা এই অতিক্রম করল বলে। মহারাজের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া এই মুহূর্তে আবশ্যক।'

'নিরাপদ আশ্রয়!' সিংহের মতো গর্জে ওঠে লক্ষণ সেন। 'আমার জন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে আমাকে!' লাফিয়ে উঠে আদেশ দেয়, 'এই মুহূর্তে যুদ্ধের সাজপোশাক নিয়ে আস, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতেও এই বিশ্বাসঘাতকদের রেহাই দেব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই মিলে বিরত রাখতে চেষ্টা করে লক্ষণ সেনকে। কিন্তু লক্ষণের রণমূর্তি দেখে ঘাবড়ে যায় ওরা। অকৃতজ্ঞ, প্রতারক, সামান্য এক তস্করের ভয়ে লুকিয়ে থাকবে গৌড়ের অধিশ্বর মহারাজাধিরাজ লক্ষণ সেন!

'আরণ্য কোথায়? ওকে বলো এক্ষুণি যুদ্ধসাজে এসে আমার সামনে দাঁড়াতে। আর একপল সময়ও নষ্ট কর না। আমার যুদ্ধপোশাক নিয়ে আস। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম আমার, মৃত্যুও যদি হয়, তাহলে রণক্ষেত্রেই হবে। ওটাই ক্ষত্রিয়ের পুণ্যভূমি, প্রকৃত তীর্থ। যাও, এক্ষুণি যাও।' চেঁচিয়ে বলে লক্ষণ সেন।

শেষ পর্যন্ত রাজমহিষীর শরণাপন্ন হয় অনুচরেরা। প্রধানা রাজমহিষী এসে বলে, 'মহারাজ, যদি এখন বিপরীত কিছু ঘটে যায়, তাহলে এই রাজ্য রক্ষার ভার থাকবে কার হাতে? রাজ্যের সামন্তরা বিলাসব্যসনে ব্যস্ত। মন্ত্রী, অমাত্য, ধনিক-বণিক সম্প্রদায় নিজেদের আখের গোছানোয় আর জ্যোতিষের প্ররোচনায় মত্ত, জনসাধারণ দ্বিধাবিভক্ত। বিহার রাজ্য জনশূন্য, এখন কী গৌড় রাজ্যও জনশূন্য করার পথে রেখে যাব আমরা? যদি প্রজাই না থাকে তাহলে রাজ্য কার জন্য! শুধু রাজা, মন্ত্রী আর অমাত্যদের জন্য কোনো রাজ্য এ বিশ্বে গড়ে ওঠেনি। বিশাল এই রাজ্যের প্রজাদের রক্ষা করার জন্য হলেও নিজেকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন, মহারাজ।'

তীব্র উত্তেজনায় মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে থাকে লক্ষণ সেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা এসে ধরে ফেলে। বিশালদেহী, ভীমদর্শন লক্ষণ সেনের শরীরে এখন হাড় কটা অবশিষ্ট আছে মাত্র। এই শরীরে সে যেতে চায় যুদ্ধে! অনুচরেরাও বিস্মিত হয়। ধরাধরি করে একটা আসনে বসিয়ে মাথায় সামান্য পানি ছিটিয়ে পাখাবাতাস করে।

শেষ পর্যন্ত যুক্তির কাছে নতিস্বীকার করে প্রাসাদ ছেড়ে গোপন গবাক্ষপথে বেরিয়ে আসে লক্ষণ সেন। প্রাণের লক্ষণাবতী অতিক্রম করে নৌপথে বিক্রমপুরের দিকে পাল তোলে মহাপরাক্রমশালী রাজা, মহারাজাধিরাজ লক্ষণ সেন। আশ্চর্য স্বপ্নময় এই অনন্যসাধারণ ভূখণ্ডে কাটিয়ে দেয়া দীর্ঘ জীবনের শতশত খণ্ডস্মৃতি পেছনে ফেলে নতুন এক অকল্পিত, অভাবিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নয়, বরং পিছিয়ে যায় জীবনের অলংঘ্য, অন্তিম এক অবশ্যম্ভাবী বিনাশের উদ্দেশ্যে। চির অপরাজিত, চির উন্নতমস্তক, দুর্দণ্ড প্রতাপশালী এক ক্ষত্রিয় বীর অবশেষে পরাজয় নয়, পলায়নের কলঙ্ক নিয়ে ঘরে ফিরছে!

আর কিছু নয়, শুধুই করুণা হয় এখন, এই অবেলার অনাসৃষ্টির প্রতি, জগৎ সংসারের প্রতি, রাজ্যের প্রতি এবং সব চেয়ে বেশি, নিজের প্রতি!

ধিক লক্ষণ, ধিক এ জীবন!

১৬

পদ্মাবতীর তীব্র স্রোতে ভেসে একটানা দুদিনে অনেক দীর্ঘ একটা পথ পেরিয়ে এসে কিছুটা নিরাপদ বোধ করে লক্ষণ সেনের ছোট্ট নৌবহরের দায়িত্বে থাকা বল্লভ সেন। মাধবের এই পুত্রটির ভেতর ভবিষ্যতের কিছুটা সম্ভাবনা দেখতে পায় লক্ষণ সেন। কিন্তু সম্ভাবনা যদি কাজে না লাগানো যায় তাহলে ওখানেই থেকে যায় ওটা। বৃদ্ধ দাদুকে অনেকটা জোর করে রাজাবাসের পেছনের গোপন গবাক্ষপথ দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছিল বল্লভ। এখন বুঝতে পারে লক্ষণ যে ওর ওই সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিল।

পদ্মাবতীর একটা শাখানদীর তীরে ঘন জঙ্গলঘেরা জায়গায় পৌঁছে নৌকা ভিড়ায় বল্লভের বাহিনী। নৌকায় শুয়ে বসে হাতপায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তীরে নেমে ধীরে ধীরে হাঁটে লক্ষণ সেন। অনেকটা এগিয়েও লোকালয়ের কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না ওরা। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কোনো মানুষজন বাস করে আরণ্য?'

'করে হয়তো।'

'সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে যে?'

'মানুষজন হয়তো পালিয়ে গেছে, নয়তো যাচ্ছে।'

'ওরা পালাবে কেন?'

'অনেকদিন থেকেই তো মানুষজন পালাচ্ছে, মহারাজ। পশ্চিম থেকে দস্যুরা যত এদিকে এগিয়ে আসছে, মানুষজনও পুব থেকে আরো পুবে পালাচ্ছে।'

'পুবদিকটা কী খুব নিরাপদ আরণ্য?'

'খুব নিরাপদ না হলেও পালিয়ে তো থাকা যায়।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ আরণ্য, পালানোর জন্য পুবদিকটাই নিরাপদ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো অন্ধকার ছায়া নেমে আসে লক্ষণের চোখ-মুখ জুড়ে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না আর। চুপচাপ হাঁটতে থাকে। একটু পরে হঠাৎ থেমে যায় সবাই। বল্লভকে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'গানের সুর না?'

'হ্যাঁ, দাদুমশায়। দোহার কোনো সুর মনে হয়।'

'যাবি ওদিকটায়?'

'যাওয়া যেতে পারে। তোমাকে তো আর চিনবে না কেউ। শতশত পরিবার পালিয়ে আসছে এখন রাঢ় ও মগধ থেকে। ভাববে ওরকম পালিয়ে আসা কেউ।'

'কাঁটার খোঁচা দিলি বুকে, বল্লভ।'

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটে বল্লভ, 'না দাদামশায়। ওরকম কিছু ভেবে বলিনি।'

'তুই ভেবে না বললেও, রাজ্যের প্রজারা হয়তো আগামীদিনে এটাই বলবে।'

'কিন্তু তুমি তো পালিয়ে আসোনি, দাদু।'

'এটা কী কেউ বুঝবে?'

গানের ওই উৎসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এসেছে মনে হয়। গ্রামের রাস্তাগুলো এত প্যাঁচানো যে সামান্য দূরত্ব পেরোতেও অনেকটা হাঁটতে হয়। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট কোনোকিছুরই কোনো পরিকল্পনা নেই। যার যেখানে খুশি ঘর বাঁধে। তারপর রাস্তাগুলো জালের মতো জড়িয়ে পড়ে। কারো বাড়ির উত্তরদিকে রাস্তা তো কারো দক্ষিণে, আবার কারো পুবে তো অন্যেরটা পশ্চিমে, আড়াআড়ি, কোনাকুনি, যে-যেভাবে যেদিকে যুক্ত হতে পারে। শব্দ এসে পৌঁছায় সোজাসুজি। ফলে অনেকটা হাঁটতে গিয়ে আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন।

গানের আসরের কাছে এসে দেখে এখন বিরতি চলছে ওদের। শ্রোতারা মাটিতে খড় বিছিয়ে বসে গান শুনছে। ওদেরকে কাছে আসতে দেখে শ্রোতাদের একজন বলে, 'বসে পড়ুন মহাশয়রা। খুব ভালো গায় ওরা।'

লোকটা সম্ভবত ওই গায়কদলের দালাল। বল্লভকে বলে আরেকজন, 'ওখান থেকে দুগাছি খড় নিয়ে নিন মহাশয়, আরাম করে বসুন।'

একটু বেকায়দায় পড়ে বল্লভ, পরমভট্টারক, পরমনারসিংহ, মহারাজাধিরাজ শেষ পর্যন্ত বসবে ওই খড়ের গাদায়! ভাগ্যিস লক্ষণ সেনের মাথায় ঢুকেনি বিষয়টা। বল্লভ তাড়াতাড়ি বলে, 'আমাদের নিয়ে ভাববেন না মহাশয়। দাঁড়িয়েই ভালো আছি আমরা। দাদুমশায়ের বাতের ব্যামো। বসলে আর উঠতে পারবেন না। এমনিতে আমরা হাঁটতে বেরিয়েছি। একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য দাঁড়ালাম।'

'ঠিক আছে মহাশয়। দাঁড়ান ভালো করে।'

গায়িকাদের একজন ঘুরে ঘুরে শ্রোতাদের কাছ থেকে কড়ি নিচ্ছে একটা মাটির ঘড়ায়। বল্লভদের সামনে আসায় সেও দুটো কড়ি ফেলে ওখানে। বসে থাকা শ্রোতাদের একজন বলে, 'গান না শুনেই কড়ি দিয়ে দিলেন! মহাশয়দের নিশ্চয় আছে অনেক।'

চুপ করে থাকে বল্লভ। সব কথা লক্ষণের কানে ঢোকে না। ঢুকলেও বুঝতে পারে না। কান খাড়া করে শ্রোতাদের একাংশের কথা শোনে। গায়িকাদের একজনকে দেখিয়ে এক চ্যাংড়া বলে, 'ওই মাগীর কলসখান দেখিচিস ভুপেন? একটি গাহিল বটেক!'

'তুমি শালো গান শুনতি বচ্চো, না ওই মাগীক দেখতি এইচ্চো?'

'দুটোইরে ভুপেন।'

কুতকুতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলে, 'ও গাহিলের ভিতর কিছু আর দিতি হবি না তোমাক, নিজেই লাফিয়ে লাফিয়ে তোমার ছিক্কে থিকে বেইর করি লিবে সব।'

'চুপ কর শালা, গান শুনবির দে।'

'আবে গান শুরু হইলি ককুন?'

'হবি তো একুন আবার ।

'শুরু হইক, তারপর চুপ করবুনি।'

'চোক দি ওই মাগীক চেইটি খা শালো। মুকটি বন্ধ কর একুন।'

'হরে ভুপেন, আমার চাইটতিই ইচ্চে হচ্চি।'

'এক কাজ কইর শালো, ওই ঢেঁপার তীরে যেয়ি দেখগি গরম বালির শত্‌শত্ খোড়ল আছে। ঘইড়েলগুলোন ওম দিচ্চে ওকিনে। তোর ছিক্কেটি ওকিনে সেঁদি রাখগি, যা শালো।'

'রাগ কচ্চিস ক্যান্ ভুপেন। এসব কতা কি অন্য কাইরো সাত কতি পারি?'

'তুই থাক, গান শুনবুনি, যাচ্চি আমি।'

জোর করে হাত ধরে বসায় ওকে ভুপেন। কান পেতে ওসব শুনছিল লক্ষণ। ভাষাটা যেন একটু কেমন। ওদের কথাবার্তার অর্ধেকও বোঝেনি সে। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে যে ওটা মেয়েমানুষ নিয়ে। মনে মনে অবাক হয়। সামন্ত মহাসামন্ত অমাত্য প্রভৃতি রাজকুলের অংশীদারদের মতো সাধারণ প্রজারাও কেমন নারীলিপ্সু ও ভোগপ্রবণ হয়ে উঠেছে! তারপর ভাবে, হবেই বা না কেন, ওদেরও তো ওটা আছে। আর সবার ওটাই একই রকম অনুভূতি দেয়। রাজরাজাদেরটা তো ভিন্ন কিছু দেয় না। ওদের কথাগুলো নিশ্চয় বল্লভের কানেও গেছে। আর কিছু না শোনার জন্য ভিড়ের অন্যদিকটায় সরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানে গিয়ে যা শুনে তাতে লক্ষণের মন ভেঙে যায়।

দুই বুড়ো কথা বলছে, 'আবাদ যে দিলিনে এবার, কী খাবিনে হরি সেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও ভাবিসনি, সেনরাজারা পালি যাচ্চে না, যেতি যেতি পতে যা ফেলি যাবি, তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দুবছরের খোরাক হয়ি যাবি।'

'তোক কে কয়িছে রে সেনরাজা পালিচ্চে, কতাটি কী সত্যি?'

'ও মোর ভগমান, এও জানিসনি মহিম! দেশসুদ্দি মানুষ জানিলে। ছিলেপিলেরা গান বেনধিচে শুনিসনি?'

'তা তো শুনিচি। কিন্তুক কতাটো সইত্যি কিনে শুধিলিম তোক।'

'না হলে মানুষের মুকে আইসে?'

'ওরা পলিলে কিনে রে হরি?'

'তাইকি আমাক কহিছে সেনরাজা?'

'তুই বলচিস তো বটেক।'

'তুমিতু শালো বড় ফ্যাচোর ফ্যাচোর লাগিচ্চো মহিম। সুজেসাইপটে এককেন কতা বুজিচ্চো নাই কিনে? ও শালোরা এদ্দিন আমাগিরে ঠাপিচ্চে, একেন তুটকি না পুটকি, ওরা ওগির ঠাপাতি শুরু করিচ্চে। তাই পালিচ্চে।'

'আস্তি ক হরি। কেউ শুনি ফেললি এখন উল্টু করি একেনেই ঠাপাতি শুরু করবিনে তোক। বড়ুফুড়ু মানবি নে।'

'ও শালোগিরে ডরাই বুড়, নামির শিষে আমেরো একটি ষেণ আছি নে?'

'তুমিত শালো হরির চেন। একেন উরা কেদোয় পড়িচ্চে তেই মুখ দিয়ি প্যাঁদাচ্চো।'

'ধুশশালো, চুপ কইর। গায়েন শুনতি দি।'

'শুরু হতি দিবি তু।'

'তাইলি বসিবসি চোকদিই ওই মাগীক খা।'

এবার স্পষ্টতই বিরক্তি ফুটে ওঠে লক্ষণের ভেতর। দেশসুদ্ধ সব মানুষই কী শরীরসর্বস্ব হয়ে উঠেছে! অন্য কোনো ভাবনা নেই ওদের। এ তো একেবারে আদিম পর্যায়ের বিষয় আশয়। গান শোনার ইচ্ছেটা পুরোপুরি দূর হয়ে যায় মনের ভেতর থেকে। বল্লভকে নিয়ে সরে আসে জায়গাটা থেকে। দাঁড়িয়ে থেকে অনেকটা দুর্বল হয়ে উঠেছে ওর পা দুটো। কিছুটা পথ এগিয়ে আবার থেমে যায় লক্ষণ। গান শুরু হয়েছে। বাতাসে ভেসে আসা ঐ সুর আবিষ্ট করে ওকে।

একটু সময় দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। শরীর ধরে রাখার মতো শক্তি পায়ে নেই অথচ মন গেঁথে পড়েছে ওই সুরে। বল্লভকে জিজ্ঞেস করে কী করবে। ওখান থেকে সামান্য দূরে ঝাঁকড়া-পাতা বিশাল একটা গাছের নিচে কাণ্ড থেকে কাটা আর একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। বল্লভ ওকে জিজ্ঞেস করে ওখানে বসবে কিনা। বুঝতে পারছে না লক্ষণ কী করবে। গানের সুরটাও

ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। বল্লভ বলে, 'বসো ওখানে দাদুভাই, কেউ তো দেখছে না।'

'ঠিক আছে বল্লভ, বসব।' একটু থেমে বলে, 'আর দেখলেই বা কী, আমি তো রাজা নই এখন।'

'কেন রাজা নও। নিশ্চয় রাজা, দাদু।'

'না, আমি এখন শুধুই এক পলাতক।'

'না না দাদু, ওভাবে দেখ না তো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হয়তো যাবে। হয়তো যাবে না। কিন্তু এই কলঙ্কটা কখনোই যাবে না বল্লভ।'

'ওটা যে সত্যি নয় তা তো তুমি জানো দাদু।'

'কী আসে যায় তাতে। দেশসুদ্ধ মানুষ জানে, সেনরাজা পালিয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষও তাই জানবে।'

'কিন্তু এটা যে রটনা, তা কোনো না কোনো দিন নিশ্চয় আবিষ্কৃত হবে।'

'সেটা তো আবিষ্কারের বিষয়। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ইতিহাসের উপাদানগুলো কী কোথাও থেকে যাচ্ছে? এদেশের নদীজলে তো সবকিছুই ধুয়ে মুছে যায়।'

'ওরা যখন ভেবে দেখবে, আসলেই তুমি পালিয়েছ কিনা, তখন ওটার কারণও নিশ্চয় খুঁজে দেখবে। বল দেখি কোন কারণটা খুঁজে পাবে ওরা?'

'একটা কারণও কী তুই বলতে পারবি বল্লভ?'

'এখন যদি মিথ্যে করে দাঁড় করাই তাহলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

'মিথ্যে করেই বলো না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বল্লভ। তারপর বলে, 'না দাদু, মিথ্যে করেও তো কিছু খুঁজে পেলাম না।'

'তাহলে এই রটনাটা এল কী করে?'

'ভাবার একটা বিষয়ই বটে, ঠাকুরদা।'

'ওটা হচ্ছে প্রজাদের সঙ্গে আমাদের বৈরিতা। পিতাজির সময় থেকে ওদের সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, তারই চূড়ান্তরূপ এটা। আমাদের রাজপরিবারগুলো, সামন্ত মহাসামন্তরা, মন্ত্রী মহামন্ত্রীরা, সেনাপতিরা জনগণের উপর শুধু অত্যাচারই করেছে। বিনিময়ে সামান্য সুরক্ষাটুকুও দিতে পারেনি ওদের। পশ্চিমের আগ্রাসী সৈন্যরা যখন ওদের মেরে কেটে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, অন্তত তখনও যদি ওদের বাঁচাতে পারতাম তাহলে হয়তো এমন হতো না।'

'ঠিক এমনটাই বলা যায় না, দাদুমশায়। এখন ওসব নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনটাই এখন নেই। খারাপ আর হবে কী। চল উঠি, পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে।'

'ওঠ দাদু।'

এতটাই দুর্বল হয়েছে লক্ষণ সেন যে ওকে ধরে দাঁড় করাতে হয়। কোনো রকমে হেঁটে হেঁটে নৌকায় এসে বলে, 'যত তাড়াতাড়ি পারিস বল্লালপুরী নিয়ে চল আমাকে। ওখানে হয়তো দুদণ্ডের শন্তি থাকলে থাকতেও পারে।' ওর আদেশ মতো তখনই নৌকা ভাসাতে বলে বল্লভ সেন। বিশাল এক নৌকার বহর নেমে যায় পদ্মাবতীর ভাটি স্রোত ধরে। এই হয়তো শেষবার। এই নৌবহর কোনোদিনও আর স্রোতের উজানে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। বল্লভের মনও বিষাদে ছেয়ে আছে। লক্ষণ সেন জিজ্ঞেস করে, 'আরণ্য কোথায়?'

'ওদের জন্য ভেব না। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আমাদের পাহারায় রয়েছে ওর দল। তুমি নিশ্চিত থাকো দাদু। এদিকটায় মানুষজন খুব কম। লোকালয় গড়ে উঠেনি তেমন। ওখানে গান শুনতে জড়ো হয়েছে যারা, ওদের দেখেও মনে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মানুষজন ওরা।'

'তোর চোখ তো খুব ধারালো বল্লভ! অনেক কিছুই দেখেছিস তাহলে।'

পুবদেশীয় মৌসুমী বৃষ্টি এভাবে ঝরতে শুরু করেছে যে দুহাত দূরের কোনোকিছুও চোখে পড়ে না। পরের দিন নৌকা ছাড়া সম্ভব হয় না। আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে লক্ষণের এত বড় নৌবহর নদীতে নোঙর তুলতে পারে না। মানুষজনের ভেতর সন্দেহ তৈরি না হওয়ার জন্য পুরো নৌবহর বিস্তৃত থাকে কয়েক মাইল জুড়ে। প্রকৃতি স্বচ্ছ না থাকলে নৌবহরের যে-কোনো নৌকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্যাঁতসেঁতে জলহাওয়ায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। শরীরের তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে প্রমাদ বকুনি শুরু করে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে বৈদ্যের দল। অস্থিরভাবে ছোটাছুটি শুরু করে আরণ্য ও কেশব সেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এক বৈদ্যের বানানো বটিকায় লক্ষণ সেনের শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা নেমে আসে। লক্ষণ সেনের যে বয়স, শরীর পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আর নেই। কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রায় পক্ষকাল কাটাতে হয় নদীতে নৌকা নোঙর করে।

সেরে ওঠার দিনগুলোয় রাজ্যের যত চিন্তা এলোমেলোভাবে উঠে আসে ওর মাথার ভেতর। রাজ্য শাসনের কঠিন শৃঙ্খলের ভেতর ঠাঁসবুনোট সময়ের ফাঁকে সেসব ভেবে দেখার সময় পায়নি। বল্লালপুরীর প্রতিবেশী বজ্রযোগিনী গ্রামের জেতারির শিষ্য দীপঙ্করের নাম অনেক শুনেছে সে। বল্লালপুরীতে জন্ম

নেয়া লক্ষণ সেন যদি একটা বিশাল রাজ্যের রাজা, তাহলে ওই এলাকা থেকে আসা দীপঙ্কর একটা বিশাল ধর্মের রাজা।

মগধের বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। কল্পনা করতেও ভালো লাগে যে নিজেরই এক প্রতিবেশি, স্বজন এত বড় এক মহাপুরুষ হয়ে জন্মেছিলেন তারই রাজ্যের একটা অংশে। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাধ্যক্ষ মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষাগুরু ছিলেন তিনি। দীপঙ্করের নাম উচ্চারিত হলেও নাকি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে লামা ও চীনদেশের সম্রাট সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতেন। এই মানুষটাকে ও তাঁর কীর্তিকে বিস্তারিতভাবে জানা হলো না। এবার বল্লালপুরীতে গিয়ে, মনে মনে ভাবে, যদি যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তাহলে দীপঙ্কর ও তাঁর বৌদ্ধধর্মটা নিয়ে কিছু জানার চেষ্টা করবে।

কিছুটা সুস্থ বোধ করায় কেশবকে বলে নৌকার দরোজা জানালা সব খুলে দিতে। বাইরের উজ্জ্বল আলো ঢুকে রাজকীয় বজরার ভেতরটা ঝলকিত করে তোলে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ওর মন। এত আলো, এত আলো, হে ভগবান! নৌকার সামনে খোলা জায়গায় ওর আসন পেতে দিলে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে বসায় ওখানে। আহ্, কী প্রশান্তি! এদেশীয় আলোবাতাস এত স্নিগ্ধ, এত প্রাণজুড়ানো! আগেও কী উপভোগ করেছে এসব? কত দ্রুত ফুরিয়ে আসছে বিধাতার এই অপরিমেয় অনুদান। সামনের ওই নৌকার মাঝিটাও কী উপভোগ করছে এসব? নাকি সে বোঝেই না এর মূল্য? অমূল্য এসব ছেড়ে সারা জীবন সে কিনা ছুটেছে ধনুর্বাণ হাতে রাজ্যের পর রাজ্য জয়ের অভিযানে। শেষ পর্যন্ত কী পেয়েছে সে। এক পলাতকের কলঙ্ক!

বাঁপাশে বেশ বড় একটা জলজ তৃণগুল্মের সবুজ বিস্তার। ছোটখাটো একটা গ্রামের মতো বড়। ওখানে মনে হয় প্রচুর মাছের আবাস রয়েছে। ছোট ছোট নৌকায় বসে কিছু মানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ওখান থেকে। সবুজ ঝোপের উপর থেকে মাথা উঁচিয়ে একটা সাদাকালো গুইসাপ কিছু একটা লক্ষ্য করছে। ওর মাথা ঘোরানোর কায়দাটা খুব উপভোগ করে লক্ষণ সেন।

রাজকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা ডানদিকে ঘোরায়। তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। ওর দৃষ্টিশক্তি হয়তো খুব প্রখর না। কী দেখছে তা বুঝতে অনেকক্ষণ লেগে যায়। কোনো একটা কিছু প্রত্যক্ষ করতে হলে অনেকটা সময় ওটার ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হয় রেটিনায়। সাপ খেয়ে নাকি বাঁচে ওরা। হয়তো কোনো সাপের খোঁজেই আছে। একটু পরে ডানদিকের জলে নেমে যায় খুব দ্রুত। কোনো সাপের পেছনে তাড়া করেছে হয়তো বা।

সাদাকালো গুইসাপগুলো উভচর। বেশিরভাগ সময় জলেই থাকে। ডাঙারগুলো হলুদ ও কালোয় ফুটি তোলা। দুটো প্রজাতিই অদ্ভুত সুন্দর। নিতান্ত নিরীহ এরা। ডাঙারগুলো সম্ভবত তৃণভোজী অথবা দুএকটা সাপ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাঙও খেয়ে থাকে, মনে করতে পারে না এখন। কিন্তু কেন যে মাঝিমাল্লারা সুগোগ পেলেই নৌকার লগি অথবা বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে ওদের! এখন মনে পড়ে, ছোট থাকতে ওরাও বনবাদাড়ে এরকম গুইসাপ দেখলে ঢিল ছুড়ত। ওদের কালচে জিভটা একদম ভালো লাগত না। ঢিল ছুড়ে দু-চারটা ছোটখাটো গুইসাপ মেরেও ফেলত। এখন মনে মনে ঘৃণা করে মানুষের এই অকারণ প্রাণসংহারী প্রবৃত্তিটাকে।

মনে পড়ে সে যখন আরাকান অভিযানে বেরিয়েছিল, পুবের পাহাড়শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। হরিকেলের অনেকটা তখন সেনরাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল। ওখানের এক সেনাপতির কাছে শুনেছিল যে পাহাড়ে কিছু মানুষজন আছে, ওরা নাকি সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ প্রভৃতি খায়। বিষয়টা তখন অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এখন মনে হয় মানুষের খাদ্যাভ্যাসটা গড়ে ওঠে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ও সহজলভ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর। এটা অনুমোদিত, বা ওটা নিষিদ্ধ বলে কোনোকিছু নেই। মরুভূমিতে যা পাওয়া যায় না তুষারাবৃত শীতল অঞ্চলের মানুষগুলোকে সেসব খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

পৃথিবীতে একমাত্র মানুষেরাই জল স্থল ও অন্তরীক্ষে যা কিছু জন্মায় তার সবকটা স্তর থেকে কিছু না কিছু খায়। চীনদেশের মানুষরা সাপ ও ব্যাঙ খেতে পছন্দ করে। পুবের পাহাড়ের ওরা হয়তো ওদের থেকে খাবারের এদিকটা পেয়েছে। অথবা চীনদেশের ওরাই হয়তো এদের থেকে শিখেছে। মনে মনে ভাবে লক্ষণ, মানুষ খায় না কী?

পশ্চিম দেশীয় মানুষেরা নাকি শূকর খায়। এদেশের অন্ত্যজ কোনো কোনো গোত্রও শূকর খায়। ওরা তা ভাবতেও পারে না। এদিকে ওরা কচ্ছপ খায়। ওটাও কদাকার প্রাণী। পশ্চিম দেশের ওরা ভাবতেও পারে না যে এদেশের মানুষেরা কচ্ছপ খায়। শেষ পর্যন্ত লক্ষণ ভাবে, মানুষের খাবার নিয়ে এসব ভাবাই আসলে ঠিক না। মানুষ সর্বভূক, এজন্যই টিকে আছে, অথচ প্রাচীন অতীতের অনেক প্রাণী টিকে থাকতে পারেনি।

নদীটাকে আজ অনেক সুন্দর মনে হয়! আকাশ অনেক গাঢ় নীল। দ্রুত বেগে সাদা মেঘের দল উড়ে যায় একটার পর একটা। এত রোদ আকাশে যে ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পদ্মাবতীর বিস্তৃতি এখানে এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে যে কল্পনা করাও কঠিন যে কোথায় শেষ হয়েছে এটা। সামনে, ডানে ও বায়ের দৃশ্যগুলো এত বেশি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে যে দেখে আশ মেটে না। প্রাণভরে সবকিছু উপভোগ করে লক্ষণ সেন।

এত দীর্ঘ অবসর আর আসেনি এ জীবনে। বিস্তীর্ণ এই নদীটা কোথাও গিয়ে মিশেছে একেবারে আকাশের সঙ্গে। দিগন্তের কোথাও একটু সবুজ রেখা

দেখে অনুমান করা যায় যে ওখানে স্থল রয়েছে। আবার কাছাকাছি কোথাও দু-একটা গ্রাম এত বেশি সবুজ যে রঙের বৈচিত্র্য এক অপূর্ব বিন্যাস সৃষ্টি করে। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে চলে মেঘবৃষ্টিবিহীন আকাশে। কোথাও এত উঁচুতে উড়ে যায় ওরা যে ছোট ছোট অসংখ্য কালো বিন্দুর মতো মনে হয়। কত যে পাখি ওড়ে বঙ্গ-সমতটের এই আকাশে তার কোনো শেষ নেই। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আবার পাশের সবুজ জলজ ঝোপটার দিকে তাকায় লক্ষণ সেন। কোনো গুইসাপই এখন আর নেই ওখানে। মাছের বাসা বানানোর জন্য জেলেরা বাঁশ দিয়ে কিছুটা জায়গা ঘের দিয়ে রেখেছে। বাঁশের খুঁটিগুলোর উপর কয়েকটা মাছরাঙা পাখি চুপচাপ বসে আছে। কোনো নড়াচড়া নেই।

ওদের কোনো একটা হঠাৎ তীর বেগে জলের ভেতর ঝাঁপ দেয়। একটু পড়ে ছোট একটা মাছ ঠোঁটে নিয়ে উঠে আসে। আবার বসে থাকে চুপচাপ পরের শিকারের জন্য। পেট ভরে গেলে প্রেমযাপনে উড়ে যায় ওদের গাছের খোড়লে। ছোট থাকতে গাছের খোড়ল থেকে পাখির ছানা ধরে এনে পুষতে চেষ্টা করেছিল লক্ষণ। কোনোটাকেই বাঁচাতে পারেনি। এখন মনে হয় কী নিষ্ঠুর ছিল ওইসব খেলা। কষ্ট লাগে খুব।

জলা-জায়গাটার যেখানে পানি কম সেখানে হেঁটে বেড়ায় এক ঝাঁক সাদা বক। মৌন ঋষির মতো দাঁড়িয়ে আছে ওদের অনেকে। কোনো মাছ সামনে এলে চোখের পলকে ঠুকরে তুলে আনে জল থেকে। হট্টিটি ও কাদাখোঁচা পাখিগুলো কী খায় কে জানে। শুধু চিৎকার ও চেঁচামেচি করতে দেখে ওদের। এত চঞ্চল ওরা যে বক বা মাছরাঙ্গার মতো এক জায়গায় থাকে না কখনো।

অনেক দূরে দেখা যায় শতশত নৌকা পাল তুলে ভেসে যায়। এত বিচিত্র রঙের ও আকারের পালগুলো ও এত দূরে নৌকাগুলো যে মনে হয় আকাশে অনেক ঘুড়ি উড়ছে। জলের রং ওখানে আকাশনীলের কাছাকাছি। কত রকম নৌকা যে আছে এদেশে!, ছোট, বড়, লম্বা, বেঁটে। কত অদ্ভুত ও সুন্দর ওদের নাম! নায়রি, পাতাম, পদি, ডিঙি, বাছারি, ঘাসি, বাজিতপুরী, গয়না, কোষা, পানসি, সাম্পান, কুন্দা, বাইছ, ছিপ, সওদাগরী ... আর মনে করতে পারে না লক্ষণ সেন।

মনের গভীর গহনে অনেকটা সময় ডুবে থেকে কেশবকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'এই নদীটার নাম কীরে কেশব?'

'পিতাজি, এটা তো কোনো নদী না।'

'তবে?'

'এটা একটা বিল।'

'বলিস কী? আমি তো নদী ভেবে বসে আছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেবে থাকলেও ক্ষতি নেই পিতাজি। এক সময় পদ্মাবতীর খাত ছিল এটা। নদী দূরে সরে যাওয়ায় এখন বড়সড় বিল হয়েছে। দেখছ না, জলে কোনো স্রোত নেই।'

'তাই তো রে কেশব। লক্ষ্য করিনি কেন!' একটু ভেবে বলে, 'তাছাড়া, কীভাবে ভুলেও বা গেলাম এ বিলটার কথা। কত স্মৃতি যে রয়েছে এখানটা ঘিরে!'

এটুকু কথা বলতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায় লক্ষণের। অবস্থা বুঝে ওর কাছ থেকে সরে যায় কেশব। নয়তো কথা বলে যেতে থাকবে লক্ষণ সেন। তার চেয়ে বরং ভাবনার রাজ্যে ডুবে থাক।

বিলের এই অনাবিল দৃশ্য এ মুহূর্তে এত ভালো লাগে লক্ষণের যে দুচোখ ভরে দেখে। সেরা সাজ বলে হয়তো কোনোকিছু নেই প্রকৃতিতে। মুহুর্মুহু বদলে যায় সব। অসংখ্য চিত্র গড়ে উঠছে আবার ভেঙে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে। কোনটাকে অসুন্দর বলবে লক্ষণ? এই নদীর একই জলের কত রং! যেখানে নোঙর ফেলা হয়েছে নৌকাটা, সেখানের জল স্বচ্ছ। কোনো কোনো জায়গায় জলের নিচে জন্মানো জলজ শ্যাঁওলা ও গাছগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশের কাছাকাছি কোথাও জলের রং নীল আকাশের মতো হালকা। কোথাও আবার সাদা মেঘের ছায়া পড়ে জলই যেন মেঘ হয়ে উঠেছে। ডানদিকের অনেকটা জায়গায় সরাসরি সূর্যালোক পড়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে জেগেছে সোনালি আলোর বিচ্ছুরণ। সূর্য যখন ভেসে বেড়ানো কোনো মেঘের আড়ালে থাকে তখন ধূসর এক ছায়া জলের ওই অংশটায় বুলিয়ে যায় বিশাল এক তুলির ধূসর স্পর্শ। প্রকৃতির এসব সৌন্দর্য যদি কিছুটাও ধরে রাখা যেত! কবিতায় হয়তো এসব সৌন্দর্যের কিছু কিছু ধরে রাখা যায়। অনেক আগে কবিতা বিদায় নিয়েছে লক্ষণের জীবন থেকে। পিতাজির অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটা শেষ করতে গিয়ে বুঝেছে যে ওখানেই সব শেষ। কবিতা লেখার সময়, সুযোগ ও ঘোর আর কখনো আসবে না এ জীবনে। সেনরাজ্যে অসাধারণ সব কবি রয়েছে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগে, চিত্রশিল্পী নেই কেন? কিছুক্ষণ ভাবে। ঐ জিজ্ঞাসাটা মনের ভেতর ঘূর্ণি তোলে ওর। আগে কখনো মাথায় আসেনি কেন এটা!

এখন সে মনে করতে পারে, মগধের এক সামন্তরাজা একটা ঘোড়ার ছবি উপহার পাঠিয়েছিল ওকে। এত সুন্দর ঘোড়া জীবনে দেখেনি সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ চোখে দেখেছে ওই ছবিটা। শিল্পের নৈপুণ্য দেখেছে। ঘোড়াটার শরীর থেকে যেন ঠিকরে বেরোচ্ছিল শক্তি ও সুন্দর। ওর ভঙ্গিটা ছিল এমন যেন এক্ষুণি ঝড়ের বেগে ছুটে যাবে অসীমের সন্ধানে। প্রতিটা পেশি দ্রুত-বেগবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ছবিটার অঙ্কনশিল্পী নাকি কোনো এক তুর্কি।

মানুষের মাথা কাটা ছাড়াও অন্য অনেক গুণও যে রয়েছে ওদের তখন জেনেছিল লক্ষণ।

নিজে নিজেই আবার সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে। সমতটের স্যাঁতসেঁতে জলহাওয়া পাথরের ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ছবি আঁকার কাগজ ও রং টিকে থাকবে কী করে? বল্লালপুরীতে না হোক লক্ষণাবতীতে হয়তো একটা চিত্রশালা গড়ে তোলা যেতে পারে। চিত্রকরদের গড়ে তুলতে হবে প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে। লক্ষণাবতীতে কী আর যাওয়া হবে কখনো? আবার বিষাদে ছেয়ে যায় লক্ষণের অন্তর। বাইরে একটানা বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে। ভৃত্যকে ডেকে বলে, নৌকার বাইরের দিকে রোদের নিচে বিছানা পেতে দিতে। ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে লক্ষণ সেন।

খুব বেশিক্ষণ বোধ হয় ঘুমোয়নি। ঘুম ভেঙে দেখে প্রকৃতি তেমনই আছে। একটু তন্দ্রালু ভাব এসেছে দৃশ্যগুলোয়। একটা দার্শনিক ভাবনা এসে ভর করে ওর ভেতর। প্রকৃতির এ সৌন্দর্য তো আজ নতুন নয়। অনাদিকাল থেকে এসব ছিল এবং অনন্তকাল থাকবে। যে-পর্যন্ত না এ বিশ্ব কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

একদিন হয়তো যাবেও। পৃথিবীর এই সৌন্দর্য আগেও কী চোখে পড়েছে ওর? দূরের একটা নৌকায় এক জেলে ছিপ ফেলে বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে। কখন একটা বড় মাছ এসে টোপ গিলবে, ও কী এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যটা দেখছে এখন? একটা মাছের টোপ গেলার প্রত্যাশার বাইরে ওর মনোজগতে আরো কিছু কি আছে? হয়তো না। লক্ষণ যেমন দেখেনি জীবনের এতগুলো বছর। অথবা দেখার সুযোগ হয়নি। তাহলে সৌন্দর্যটা কী শুধু একটা বোধনের বিষয়! তুমি যদি বুঝতে চাও যে এটা সুন্দর, তবেই সুন্দর এটা। সুন্দর বলে তাহলে বিশেষ কিছু নেই?

তোমার মন যদি বলে এটা সুন্দর, তাহলে এটা তা। মনের ওই অবস্থাটাই সুন্দর। মনে মনে আক্ষেপ করে লক্ষণ, মনের ওই অবস্থাটা আরো আগে কেন তৈরি হয়নি। এটা নিয়ে আবার এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয় লক্ষণের ভেতর। এমন একটা সিদ্ধান্তে যে পৌঁছোল ওর মন, এটা কী প্রকৃত বিষয়টার কাছাকাছি, নাকি কোনো কূটাভাস? কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না সে। আরো জট পাকিয়ে যায় মাথার ভেতর। হঠাৎ মনে পড়ে আরণ্যের কথা। তাই তো, এ কয়দিন আরণ্যের কথা মনে পড়েনি কেন? চোখের সামনে ছিল না বলে? কেশবকে বলে, আরণ্যকে ডেকে পাঠাতে। কেশব বলে, আরণ্য গেছে রসদ সংগ্রহ করতে।

'কেন রে? এখনই রসদের প্রয়োজন পড়ল কেন?' কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিতাজি, মাসাধিক কাল নৌকায় আছি আমরা, রসদ ফুরোবে না?'

'এত দিন!'

'আজ্ঞে, পিতাজি।'

'কত দিন লাগবে রসদ জোগাতে?'

'পক্ষকাল তো লেগে যাবে।'

'এতদিন কেন?'

'ঘাসি নৌকাগুলো তো অল্প জলে যেতে পারে না। ছোট ছোট পাতাম দিয়ে রসদ এনে ওগুলো বোঝাই করতে হয়।'

'আমাদের সামন্তরা ঠিক মতো সহায়তা দেবে তো এখন?'

'তা দেবে পিতাজি। আপনার তাম্রশাসনগুলো তো ভুলে যায়নি ওরা। তাছাড়া পদ্মাবতীর পুব তীরের সবটাই তো আমাদের রাজ্যের ভেতর রয়েছে এখনো।'

'এটুকু রক্ষা করতে পারবি তো কেশব?'

'নিশ্চয় পিতাজি। আমাদের নৌবাহিনী পরাস্ত করতে পারে এমন শক্তি তুর্কিদের নেই।'

'তুর্কিদের নেই। কিন্তু তুর্কিরা তো শুধু তুর্কিই নেই।'

চুপ করে থাকে কেশব। এটার কোনো জবাব নেই ওর কাছে। তাছাড়া বৈদ্যকুলের উপদেশ, লক্ষণ সেনকে বেশি কথা বলতে দেয়া যাবে না। আরণ্যকে দূরে পাঠিয়ে দেয়ার এটাও একটা কারণ। আরণ্য কাছে থাকলে পিতাজি কথা বলতে চাইবেই।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর বৈদ্যদের সুচিকিৎসায় ও পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকার ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে লক্ষণ সেন। সুস্থতা ফিরে পেয়ে বোধ হয় চৈতন্যোদয় হয় ওর। একি করে ফেলেছে সে! বল্লালপুরী ফিরে যাচ্ছে কেন! কেশবের পরামর্শে? না, কোনোভাবেই সে বল্লালপুরী ফিরে যেতে পারে না। তাহলে পলায়নের কলঙ্কটাই ইতিহাসের সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। আরণ্যকে ডেকে পাঠায়। তখুনি আদেশ দেয় নৌকার গতিপথ বদলাতে। তাছাড়া লক্ষণাবতী তো ওকেই রক্ষা করতে হবে। মাধবের পক্ষে ওটা রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। আরণ্যও মেনে নেয় মহারাজের সিদ্ধান্তটা। লক্ষণ সেনের নৌবহর আবার পদ্মাবতীর উজান বেয়ে অগ্রসর হয় রাজধানী লক্ষণাবতীর দিকে।

১৭

লুটতরাজের ভাগ পাওয়া সৈন্যরা সম্পদ আহরণের লোভে দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। ওদের সঙ্গে যোগ দেয় লক্ষণ সেনের দলের পরাজিত সৈন্যরা। প্রকৃতপক্ষে মগধের সেনাবাহিনী পুরোপুরি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এদের অনেকে আবার পদ্মাবতী অতিক্রম করে বঙ্গে পাড়ি জমিয়েছে। সামন্ত ও ধনবান অনেকে সম্পত্তি রক্ষার আশায় নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে তুর্কি সেনাপতিদের দুয়ারে গিয়ে হাজির হতে থাকে। ধর্মান্তরিত হয়ে অনেকে সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ওদের দেখাদেখি কিছুটা সুবিধাভোগী সাধারণ মানুষজনের একটা অংশের ভেতরও ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অসহায় জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও লুটতরাজের মাত্রা কিছুতেই কমে না। সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষজনের সংখ্যা নিতান্তই কম। এদের অনেকের ভেতর আবার তুর্কিদলকে নারী ভেট দেয়ার প্রতিযোগিতা লেগে যায়। লক্ষণ সেনের রাজ্যশাসনের শেষ দিকে প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে অনেক স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী সামন্তরাজা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ওদের প্রমোদগৃহে শত শত সুন্দরী নারীর নিত্য আনাগোনা ছিল। এদের প্রায় সবাই কামশাস্ত্রের বিভিন্ন কলায় এতটাই মেতে উঠেছিল যে রাষ্ট্র ধর্ম সমাজ সংসার নিতান্তই তুচ্ছ ছিল ওদের কাছে। পশ্চিমের যে-সব দেশ থেকে ওই সৈন্যরা এসেছিল তাদের নারীর সংখ্যা কম থাকায় কেলিশাস্ত্র জানা দূরে থাক ওদের অনেকে ছিল সমকামী। ওরা যখন ওইসব সামন্ত নটিগৃহে আসে আর ওদের রমণীদের শাস্ত্র উল্লেখিত বিভিন্ন ভঙ্গি চাক্ষুষ করে তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গিতে একাধিক রমণী-শরীর ভোগ করার জন্য কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ আর করতে হয় না ওদের। এদেশীয় ভাড়াটে সৈন্যরাই ওদের হয়ে কাজ করে। আর ওরা এদেশীয় রমণীদের বিভিন্ন কামকলাভঙ্গি চুটিয়ে উপভোগ করে। এদের পেছনে পেছনে আবার একদল ধর্মান্তরকারী উপাসকদল এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হয়। মধুবাণী, অনেক রকম জাদু ও হাতসাফাই দেখিয়ে পশ্চাদপদ সমাজের বোকাসোকা সাধারণ মানুষগুলোকে চমৎকৃত করে ফেলে। সামন্তদের অত্যাচারে জর্জরিত ও বামুনদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে চরম অবহেলিত বৃহত্তর সমাজ যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ধর্মান্তর গ্রহণ করলে টিকে থাকা যায়। নিদেনপক্ষে কিছু করে-খাওয়া যায়। একটু বুদ্ধিমান হলে সম্পদ আহরণ করা যায়। নিম্নবর্গের মানুষের কাছে এটা ছিল একেবারে কল্পনাতীত। সমাজের নিচু শ্রেণির এসব মানুষ আগে কখনো কল্পনা করতে পারত না যে নিজের শ্রেণির বাইরে এসে কিছুটা মানুষের জীবন যাপন করতে পারবে। ওদের পুরোহিতদের ছায়া মাড়ালেও যেখানে শুদ্ধিশ্রাদ্ধ করতে হতো সেখানে ওরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। ওদের ধর্মকর্মও এত সোজা যে কয়েকটা অনুশাসন মানলেই হয়ে যায়।

লক্ষণের নৌকা পদ্মাবতীর উজান বেয়ে এগিয়ে যেতে চেয়ে প্রতি পদে বাধাগ্রস্ত হয়। নদীর প্রবল স্রোত, অশান্ত প্রকৃতি, ঢেউয়ের প্রচণ্ড উদ্দামতার ভেতর নৌকার নোঙর তোলাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দিনের পর দিন কাটাতে হয় নিরাপদ জায়গায় নৌকা ভিড়িয়ে। কেশব সেনের ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বল্লালপুরী ফিরে যাওয়া।

প্রতিকূল জলহাওয়ায় উত্তাল নদীতে এভাবে ভেসে বেড়াতে ভালো লাগে না আর। নিরাপদও মনে হয় না। আরণ্যের ইচ্ছেও তাই। বল্লালপুরীকেই সেনরাজ্যের রাজধানী মনে করে সে। যদিও আরণ্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে নতুন উপরাজধানী নগর লক্ষণাবতী। কিন্তু প্রকৃতাবস্থাটা লক্ষণ সেনকে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। বার্ধক্যের কারণে অনেক সময় যৌক্তিক বিষয়গুলোও ওর মাথায় ঢোকানো যায় না।

অন্য আরো অনেক দিক যোগ হয়েছে এর সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গেই যে এখন যুদ্ধটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে কেবল তাই না, রসদ সংগ্রহ করাও ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে। পদ্মাবতীর বিস্তার কমতে শুরু করেছে। ফলে পুরো নৌবহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। নিরাপত্তা বোধ না করায় কৃষিজীবী শ্রেণিটাও এবার নতুন ফসল বোনার দিকে এগোয়নি।

খাদ্যের সমস্যা যেমনই হোক, জীবনের নিরাপত্তাই ওদের জন্য প্রধান। যাদের ঘরে সোমত্ত কন্যা আছে তাদের তো কথাই নেই। সামান্য ক্ষুদকুড়ো খেয়ে বা না খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারে ওরা। কিন্তু ধনীমানী শ্রেণির মানুষদের খাবারে অভাব দেখা দিলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ওরা। যে যেভাবে পারে খাবার সংগ্রহ করে ও ভবিষ্যতের জন্য মজুদ করে।

লক্ষণ সেনের নওদা ছেড়ে আসার প্রভাব গঙ্গার পশ্চিম দিকে যতটা বিস্তার লাভ করেছে পুবদিকে তার একাংশও হয়নি। আরণ্যের ইচ্ছে পুণ্ড্রনগরে গিয়ে

নতুনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করে ও রাজ্যটাকে সুসংহত করে শক্তিশালীভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়। এর পেছনে খুব ভালো একটা যুক্তিও দেখে সে। পুণ্ড্রনগরের একটা প্রাকৃতিক সুরক্ষা আছে।

পশ্চিমের আক্রমণকারীদের এখানে আসতে হলে শুধু যে সাগরসম গঙ্গা অতিক্রম করতে হবে, তাই না, আত্রাই, পুনর্ভবা, ঢেঁপা প্রভৃতি নদী ও অনেক কটা ছোট ছোট শাখা নদী ও খাল পেরিয়ে আসতে হবে। লক্ষণ সেনের নৌসেনাদের সঙ্গে কোনোভাবেই জলযুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে পারবে না পশ্চিমের আগ্রাসী শক্তি। এসবের কোনোকিছুই বোঝানো সম্ভব হয় না লক্ষণ সেনকে। গোঁ ধরে বসে আছে, রাজধানী লক্ষণাবতীতেই সে পুনর্গঠিত হয়ে জীবনের শেষ যুদ্ধটা করবে। এটাই তার অন্তিম ইচ্ছে।

ইতোমধ্যে আরণ্যের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছোয় যে বখতিয়ারের সমগ্র বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে লক্ষণাবতী দখল নেয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছে। কৌশলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ আর খোলা না থাকায় মহারাজের অনুমতি না নিয়েই নৌবহর মহানন্দা পর্যন্ত না নিয়ে বড়াল নদীতে প্রবেশ করিয়ে দেয় ওরা। বিষয়টা বুঝতে পেরে মৌন থাকে কেশব সেন। কিন্তু বরেন্দ্রর নদীগুলো লক্ষণের হাতের তালুর মতো পরিচিত।

ঘুম থেকে উঠেই জিজ্ঞেস করে বড়ালে কেন ঢোকা হয়েছে। আর কোনো গতি না দেখে কিছুটা কালক্ষয় করার জন্য আরণ্য বলে, বিকেলে এ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য মহারাজের সঙ্গে পরামর্শে বসতে হবে। লক্ষণাবতীতে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকেও ঘুরপথে যেতে হবে যেন বখতিয়ারের সৈন্যরা বিষয়টা বুঝতে না পারে। ইতোমধ্যে নৌসেনাও সংগ্রহ করে ফেলেছে ওরা।

বিষয়টা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকে লক্ষণ সেন। অস্থির সময় কাটায় বিকেল পর্যন্ত। দুপুরের খাবারের পরই ডেকে পাঠায় আরণ্যকে। লক্ষণকে দেখে শারীরিকভাবে অনেক সুস্থ মনে হয়। হয়তো মনের জোর কিছুটা ফিরে পেয়েছে। শেষবারের মতো জ্বলে উঠার জন্য বোধহয় প্রস্তুতি নিয়েছে মনে মনে। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'বল এবার, সেনাপতি আরণ্য।'

'মহারাজ, সরাসরিই বলি, যুদ্ধটা কী এড়িয়ে যেতে পারি না?'

'কেন আরণ্য?'

'গত কটামাস ঠিকভাবে ঘুমোতেই পারিনি, মহারাজ। বুড়ো হয়েছি, শরীর জীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখনো চিন্তাশক্তি ততটা ক্ষয়ে যায়নি।'

'ভয় পেয়েছ?'

'এ বয়সে ভয়ের আর কী আছে মহারাজ?'

'জয়েরই বা কী আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না মহারাজ, ভয় বা জয়, কোনোটাই আর নেই সামনে।'

'তবে?'

'পরাজয়ের সম্ভাবনাটা কী এড়িয়ে যাওয়া যায়, কোনোভাবে?'

'জীবনে কী কখনো পরাজিত হয়েছে লক্ষণ সেন?'

'সেজন্যই তো ঝুঁকিটা নিতে পারছি না। এ কলঙ্কটা যেন আমাদের গায়ে না লাগে।'

'কিন্তু আরণ্য, পলায়নের কলঙ্কটা তো এরই মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছ।'

'আজ্ঞে মহারাজ, সেটা মুছে ফেলতে পারে একমাত্র একটা জয়।'

'তাহলে ওই সুযোগটাই নিচ্ছ না কেন?'

'সমস্যা তো ওখানেই মহারাজ। ওখানটায়ই নিশ্চিত হতে পারছি না। নিজেও জানেন যে পলায়ন করেননি আপনি। কিন্তু ভগবান না করুন, জীবনের এই শেষবেলা পরাজয়টা যদি এসে যায় তাহলে ওই কলঙ্কটা নিশ্চিত হয়ে যাবে।'

'পরাজিত না হলেও এই কলঙ্ক ঘুচবে না আরণ্য। আর এটাকে পরাজয় বলে মেনে নিচ্ছ নাই বা কেন? ওদের হাতে একের পর এক রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আসছ। সামনাসামনি যুদ্ধে দাঁড়াতে পারছ না। এটা কী পরাজয় না আরণ্য?'

কী জবাব দেবে আরণ্য? বেকায়দায় পড়ে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিচুস্বরে বলে, 'আজ্ঞে মহারাজ, এটাও পরাজয়।'

'তাহলে এই কটা তুর্কি তস্করের হাতে পরাজিত সেনরাজাদের ঐতিহাসিক হস্তীবাহিনী, বিশাল অশ্ববাহিনী, লক্ষ লক্ষ পদাতিক ও তীরন্দাজ!'

'এটাই বাস্তবতা। এক-দশমাংশ আগ্রাসী আরবযোদ্ধার হাতে পারস্যের মহাপরাক্রমশালী সাসারীয় সম্রাটের কলঙ্কজনক পরাজয়ের বিষয়টা এক বার মনে করুন, মহারাজ। মাত্র কয়েকশো বছর আগের ইতিহাস!'

'আমাদের পরাজয়ের কারণটা কী, তোমার দৃষ্টিতে?'

'বেশ কটা, মহারাজ।'

'মূল বিষয়টা কী, সামন্তরাজাদের, না প্রজাদের ঘিরে।'

'মহারাজ, সৈন্যরা যুদ্ধ করে অস্ত্র দিয়ে, শক্তিমত্তা দিয়ে, সত্যি বলতে কী সামন্ত মহাসামন্ত প্রজাসাধারণ ওদের কাছে খড়কুটো। যাদের তুর্কি তস্কর বলছেন, প্রকৃতপক্ষে ওরা একটা দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল। এই সেলজুক-তুর্কিরা সুপ্রাচীন ও শক্তিশালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পদানত করেছিল। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। ওদের শক্তিমত্তা খাটো করে দেখার কিছু নেই মহারাজ।'

'এসব কী আমি জানি না আরণ্য?'

'নিশ্চয় জানেন মহারাজ।'

'মনের ক্ষোভটা একটু প্রকাশ করি তোমার কাছে, কিছু মনে কোরো না আরণ্য।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, বিষয়টা বুঝি আমি।'

'ঠিক আছে আরণ্য, বল।'

'ওদের ইতিহাসটা অনেক দীর্ঘ, মহারাজ সবই জানেন।'

'তবুও বল আরণ্য। ওদের শক্তির উৎসটা কোথায়?'

'প্রথমত, ওদের মনোবল। প্রথমদিকে আরবদের ধর্মীয় সাফল্য ওদের মনোবল এতটাই দৃঢ় করে তুলেছিল যে সেটার রেশ এখনো রয়ে গেছে। ওরা মনে করে যে এসব সাফল্যের পেছনে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ওদের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস। ওরা মনে করে ওদের সঙ্গে সবসময় থাকে সৃষ্টিকর্তার সহায়তা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, ওদের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র, এবং এটাই মূল কারণ।'

'যুদ্ধ কৌশলটা কী?'

'ঝটিকা আক্রমণ। শত্রুপক্ষ কোনোকিছু বুঝে উঠার আগেই ওদের কাবু করে ফেলা।'

'তারপর?'

'শত্রুপক্ষকে জানা যুদ্ধজয়ের পথে অর্ধেক এগিয়ে যাওয়া।'

'আর অস্ত্রশস্ত্র?'

'ওদের তূণীরের শক্তি অকল্পনীয়। এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের ধনুকের কার্যকারিতা, ও তূণীর থেকে নেয়া বাণ যত দূরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে তা বিশ্বাস করাও কঠিন। বিশ্বের অন্য কোনো সৈন্যবাহিনীর ছোড়া তীর অথবা বাণ তার কাছাকাছিও যেতে পারে না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে তীর ছুড়ে বিপক্ষ দলকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে ওরা।'

'তোমার কী মনে আছে লক্ষণ সেনের ধনুর্বাণ গঙ্গার অপরতীরে গিয়ে পৌঁছাত?'

'ওই শক্তিটা কী এখন কারো আছে, মহারাজ?'

'জানি না আরণ্য।'

'তাছাড়া ওদের অশ্ববাহিনী অত্যন্ত দ্রুতগামী। আমাদের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে ওদের ঘোড়াগুলোর আকার মিলিয়ে দেখুন। আমাদের ঘোড়াগুলো যেটুকু সময়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ওদেরগুলো অর্ধেক সময়ে তার চেয়েও বেশি এগিয়ে আসে।'

'সৈন্যসংখ্যা ওদের থেকে আমাদের শতগুণ বেশি আরণ্য, ভেবে দেখেছ?'

'একটা সোজা হিসাব দেই মহারাজ। যে-দূরত্ব থেকে ওরা আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে পারে ওই দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের সৈন্য ওদের কাছে পৌঁছানোর আগে ওদের একজন সৈন্য কমপক্ষে দশটা তীর ছুড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। ওদের প্রতিটা তীরই অব্যর্থ। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকাংশ প্রতিপক্ষকে নাগালে পাওয়ার আগেই ওদের ছোড়া তীরে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হস্তীবাহিনীও তীরের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ওদের আর কোনোভাবেই সামলানো যায় না। ফলে পদাতিক বাহিনী তো যুদ্ধটা করতেই পারে না।'

'এর সবই আমার কানে এসেছে। ওদের ঐসব অস্ত্র ও ঘোড়া কেনার ব্যবস্থা কর আরণ্য।'

'মহারাজের যে কোষাগার, তা হয়তো সেসবের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ওদের মনোবলটা কিনবেন কী দিয়ে। আমাদের ভেতর এই চিত্তশক্তিটা কী কোনোভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে? রাজ্যের ধর্মাধিকারী পুরোহিত মহাশয়রা আত্মীকশক্তি গড়ে তোলার সুযোগটা কী রেখেছে মহারাজ?'

'বটে, একটা প্রশ্নই করেছ আরণ্য।'

'তাছাড়া অনেক ভেল্কিও জানে ওই তুর্কিরা।'

'কী রকম?'

'ওটা তো আরেক গল্প মহারাজ। শুনবেন?'

'শুনব আরণ্য। অনেককিছু চলে গেলেও ধৈর্যটা এখনো আছে আমার।'

'মগধে থাকতে অনেক গল্প শুনেছি ওদের ভেল্কিবাজির।'

'একটা বল।'

'মহারাজ তো জানেনই, শৈশবে পিতাজি গত হওয়ায় পুরোহিত মশায়েরা অশুচি পালনের কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে পারেনি। মনের ভেতর নিশ্চয় একটা আক্ষেপ ছিল ওদের। তা একদিন করলাম কী, হপ্তাখানেক দাড়িগোঁফ না কেটে সূচিস্পর্শহীন একপ্রস্থ বস্ত্রে, বগলে একটা গোটানো মাদুর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সিদ্ধান্ত নিলাম ছদ্মবেশে তুর্কিদের ঘাঁটির কাছাকাছি গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসি ওদের অবস্থা।'

'একটু বাধা দিলাম আরণ্য, ছদ্মবেশে যেতে হয়েছে কেন, ওদের কাছে যেতে কী কোনো বাধা নিষেধ আছে? শুনেছি ওরা বরং আমন্ত্রণ জানায় মানুষজনকে।'

'না মহারাজ, সমস্যা আমার এই দশাসই দেহটা নিয়ে। এটা দেখে সবাই আমাকে সৈনিক মনে করে, অথবা কোনো সামন্তের লাঠিয়াল।'

একটু রগড় করে লক্ষণ, 'সেনাপতি মনে করে না? যাহোক, গল্পটা বল।'

'আজ্ঞে, এক দিনের অশুচি পালনের অভিনয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'এভাবে বলা উচিত না আমার, তবে ভাগ্য ভালো যে তোমার পিতা দীর্ঘায়ু হলে কম পক্ষে চল্লিশ দিন অশুচি পালন করতে হতো তোমাকে।'

'অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ আমরা, দীর্ঘদিন ওটা পালন করতে তো হতোই, মহারাজ।'

'আমাদেরও কিন্তু ব্রাহ্মণদের চেয়ে কয়েকদিন বেশি পালন করতে হয়। অবশ্য তোমার মনে হয় এত বেশিদিন পালন করতে হতো না। তুমি তো এখন ক্ষত্রিয়।'

'না মহারাজ, শূদ্র কখনো ক্ষত্রিয় হতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছে করলে ওটা পারে।'

'শাস্ত্রীয় ওসব জঞ্জাল এখন থাক আরণ্য। তোমার অভিজ্ঞতাটা বল। আর বাধা দেব না।'

'ছোট্ট একটা শাখানদীর তীরে হাট বসেছিল সেদিন। দুজন তুর্কিসেনা ঘোড়ায় চড়ে হাটের দিকে যাচ্ছিল। ভাবলাম ওদের পিছু নেই, দেখি কী করে। কয়েকজন গস্থাম্য রমণী নদীতে স্নান করতে নেমেছিল শেষ দুপুরে। জানেনই তো মহারাজ, নদীতে স্নান করার সময় গ্রামের মেয়েদের অনেকে বক্ষ উন্মুক্ত রাখে। এদেশের মানুষের তো এসব চোখ-সওয়া। ওই তুর্কি জানোয়ারেরা তো বোধ হয় জীবনেও দেখেনি এসব।'

'দেখবে কোত্থেকে, ওরা তো স্নানই করে না।'

'তাও হয়তো না মহারাজ। শুনেছি ওদের স্নানাগার পৃথিবীখ্যাত।'

'ওটা হয়তো স্নানাগার, যেটায় ওদের অভিজাত ও ধনবানেরা বছরে এক-দুবার যায়।'

'তা হবে হয়তো।'

'যাহোক, বল।'

'তুর্কি দুজনের মনে হয় মাথায় চক্কর দেয়। ঘোড়ার মুখ নদীর দিকে ঘুরিয়ে দেয়ায় মেয়েরা ভয় পেয়ে ওভাবেই দৌড়াতে শুরু করে। কমবয়সী, উন্নত ও বিশালবক্ষা দুজনকে ধরে ফেলে ওরা। আমাকে দেখে কাছে ডাকে ওরা। ঘোড়াটা একটা গাছে বেঁধে খুব করে শাসিয়ে বলে, এখানে পাহারায় থাক। বিপদ দেখলে চিৎকার দিয়ে ডাকবি। চারদিকে তখন অন্য কোনো মানুষজন নেই। পাঁজাকোলা করে ওদের একজনকে নিয়ে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়ে এক তুর্কিসেনা। ঐ রমণীর অসহায় চিৎকার শোনা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার, মহারাজ।'

বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আরণ্যের চোখ। একটু থেমে বলে, 'দুজনে এক সঙ্গে যেতে পারে না তাই দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপর রমণীটিকে বাধ্য করে মুখমেহন করতে। রাগে ও ঘৃণায় রক্ত ফুটতে থাকে আমার। দ্রুত ঘরে ফিরে আসি। ভাগ্য ভালো যে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ওদের ধরে ফেলতে সক্ষম হই। সবার সামনে ধুলোয় মিশিয়ে দেই ওদের।'

'এই অবস্থা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরো খারাপ মহারাজ। রাগের মাথায় কী করেছি বুঝতে পারিনি। এরপর ওদের পুরো দল এসে আশপাশের তিনটা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।'

'মনটা খারাপ করে দিলে আরণ্য।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ। এটা বলা উচিত হয়নি আমার।'

'ঠিক আছে আরণ্য, নৌকায় গিয়ে বিশ্রাম নাও। তুমিও তো আমারই মতো বৃদ্ধ। অবশ্য, অথর্ব নও।'

'প্রণাম মহারাজ।'

আরণ্য চলে যাওয়ার পর গভীর ভাবনার আবর্তে ডুবে যায় লক্ষণ সেন। একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হতো। আজকাল ঘুম আসতে চায় না। এক ধরনের তন্দ্রার ভেতর সময় কেটে যায়। রাজবৈদ্যরা এটার কোনো চিকিৎসা দিতে সক্ষম হচ্ছে না। বুঝে উঠতে পারে না কী করবে সে। এখনো ওর মাথায় ঢুকছে না যে সরাসরি লক্ষণাবতীর দিকে না গিয়ে বড়ালের স্রোত ধরেছে কেন ওরা? মনে মনে ভাবে, ওরা হয়তো কোনো কিছু গোপন করছে। নিশ্চয় আরো কিছু অশুভ সংবাদ অপেক্ষায় রয়েছে। লক্ষণাবতীকে রক্ষা করার জন্য মাধবের হাতে কতটা শক্তি আছে এই মুহূর্তে তাও অনুমান করতে পারে না লক্ষণ সেন।

আরণ্যের একটা কথা খুব মনে ধরেছে ওর, শক্তি ও অর্থ। হ্যাঁ, একটা আরেকটার পরিপূরকই বটে। অর্থ তো এখনো যথেষ্ট আছে লক্ষণ সেনের। তাহলে শক্তিটা কেন অর্জন করতে পারছে না। হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় এসে যায়। সময়, ওটা কী আছে ওর হাতে? নেই, নেই, হা ভগবান, ওটাই নেই এখন আমার।

এত দীর্ঘ জীবনও কেন খাটো মনে হয়! আর দশটা বছর কী আয়ু দিতে পারলে না ভগবান। যা কিছু গেছে তার সবই হয়তো ফিরিয়ে আনা যেত। শুধু দশটা বছর এ জীবনের সঙ্গে যোগ করা গেলে। এত মূল্যবান হয়ে দেখা দেবে সময় এর আগে কখনো বুঝতে পারেনি লক্ষণ সেন। কোনোকিছু দিয়েও এটা কেনা সম্ভব না। হতাশায় ঢলে পড়ে লক্ষণ।

আরেকটা বিষয় বলেছিল আরণ্য, একটা স্থায়ী রাজধানী ও দুর্গনগর গড়ে তোলার বিষয়। পশ্চিমের ওরা দুশতক কিংবা আরো অনেক আগে থেকে পাথরের দুর্গ গড়ে তোলা শুরু করেছিল। আমাদেরও উচিত ছিল দুর্গ গড়ে তোলা। দুর্গ যদি গড়ে তোলা হতো তাহলে হাতেগোনা কটা প্রতারকের হাতে এভাবে নিগৃহীত হতে হতো না। ভেবেছিলাম পাথরের দেয়াল সরানো যায় না। মানুষের দেয়াল সরিয়ে নেয়া যায়। এই সরিয়ে নেয়াটা যে পালানোর নামান্তর ওটা মাথায় আসেনি! শুধু কী তাই, পাথরের দেয়াল প্রয়োজনের সময় কখনো অর্থ দাবি করে না। কিন্তু মানুষের দেয়াল টিকিয়ে রাখতে প্রতিমুহূর্তে অর্থ ব্যয়

করতে হয়। এই সোজা হিসাবটা রাজা লক্ষণ সেন বোঝেনি, অথচ শূদ্র প্রজা আরণ্য বুঝে গেল!

কারণটাও খুঁজে পায় লক্ষণ সেন। আরণ্যের সুযোগ হয়েছে বিষয়গুলো দুদিক থেকে দেখার। প্রজা ও রাজা, উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটো দিকেই ওর অবস্থান ছিল।

বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে আরণ্য। এখন এই মহাবিপদের সময় কেউই তো পাশে নেই, আরণ্য ছাড়া। মাথা কাজ করছে না এখন আর, ধরেছেও ভীষণ, অথচ কোনোভাবেই মাথা থেকে এসব সরাতে পারছে না। মন থেকে এগুলো একটু দূরে সরিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় বড়ালের তীরে চোখ রাখে। কত সুন্দর এই নদীটা! কী গাঢ় সবুজ এই নদীর দুকূল। এত সুন্দর দেশটা! এত ভালো এদেশের মানুষেরা। রাজ্য নিয়ে রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে চলেছে। আর এজন্য কী অবর্ণনীয় দুর্যোগ বয়ে বেড়াচ্ছে এই অভাগা মানুষগুলো। কোনো যুদ্ধেই তো ওদের অংশ নেই। যুদ্ধে অংশই নেয় না ওরা। ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে রাজারা যুদ্ধ করে আর এদের ধন-প্রাণ-মান সহায় সম্পদ সব বিলীন হয়ে যায়। কেন এই রাজ্য, এই রাজত্ব!

কিছুটা ঘুমিয়ে ও পুরোটা জেগে রাত কাটিয়ে দেয় লক্ষণ সেন। সকালে ডেকে পাঠায় আরণ্যকে। 'আরণ্য, বড়ালতীরের একটা গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে আমাকে?' একটু ভাবনায় পড়ে আরণ্য। যে অরাজকতা এখন দেশের ভেতর, কে কোন দিক থেকে কী করে বসবে তার নিশ্চয়তা কী। মহারাজকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেয়ার সামর্থ্য কি এখন রয়েছে আরণ্যের। নিজের জীবনই এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে, 'তোমাকে নিশ্চয় অশুচি পোশাকটা পরতে হবে না এখানে। আর আমারও রাজপোশাকের প্রয়োজন নেই। দুই বুড়ো লাঠি ঠুকে ঠুকে বেরোই না হয়।'

'ঠিক আছে মহারাজ।'

ছোট একটা কোষা নৌকা বেছে নিয়ে নদীর তীর ধরে অনেকটা এগিয়ে প্রায় সুনসান নিরিবিলি একটা অঞ্চল দেখে নেমে যায় দুজনে। কেশবকে পরামর্শ দিয়ে রাখে আরণ্য, দুচোখ যেন খোলা রাখে। একটু হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। সবুজ ছায়া দেয়া একটা গাছ দেখিয়ে বলে, 'ওটার নিচে একটু বসতে পারি আরণ্য?' 'নিশ্চয় মহারাজ।' কচি দূর্বাঘাসের উপর বসে পড়ে দুজনে।

'রাজ্য সংক্রান্ত কোনো কথা তুললে থামিয়ে দিয়ো আমাকে আরণ্য। আর ভালো লাগে না এসব।'

'ঠিক আছে মহারাজ। চলুন কবিতা বিষয়ে কথা বলি।'

'কবিতা, ভুলে গেছি তো সেসব, আরণ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও ভুলে গেছি, মহারাজ।'

'তাহলে এস ধর্ম নিয়ে কথা বলি। বুড়ো বয়সে এটাই মানায় ভালো।'

'ধর্ম নিয়ে আমি কথা বলব, ধর্মাবতার?'

'কেন নয় আরণ্য? তুমি তো কোনো ধর্মবেত্তার সঙ্গে কথা বলছ না। শাস্ত্রীয় কূটতর্কও করতে যাচ্ছি না আমরা।'

'আপনি তো কেবল ক্ষত্রিয়ই নন মহারাজ, ব্রাহ্মণও।'

'না, ব্রাহ্মণত্ব এখন নেই আমাদের। শাস্ত্রের কিছুই জানি না।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, ব্রাহ্মণেরাই বা কতটা জানে শাস্ত্রের।'

'একটা কথা বলেছ বটে, আরণ্য। এদেশের ব্রাহ্মণেরা কিছু শাস্ত্রাচারের বাইরে তেমন কিছুই জানে না। ধর্মের দার্শনিক দিকের কোনো ধারণা ওদের নেই।'

'একথা বলা বা স্বীকার করার ধৃষ্টতা আমার নেই মহারাজ।'

'আরণ্য, তুমি একজন কবি। কিছু সময়ের জন্য ভগবান খুব সামান্য কবিত্বশক্তি দিয়েছিলেন আমাকে। তাই কবির মনোরাজ্যের কিছুটা অন্তত বুঝি।
'

'সামান্য এক চারণকে কবি বলা মনে হয় ঠিক না মহারাজ।'

'তোমার সবটাই উৎসর্গ, আরণ্য। তোমার কবিত্বকে উৎসর্গ করেছ জীবনের জন্য, প্রেমের জন্য উৎসর্গ করেছিলে জীবনকে, যৌবনকে উৎসর্গ করেছ বন্ধুত্বের জন্য...

'এভাবে কখনো ভেবে দেখিনি, মহারাজ। জীবন যেদিকে নিয়ে গেছে সেদিকেই গেছি।'

'যাক আরণ্য, তুমি তো নিজেকে প্রজাগোত্র বলে পরিচয় দিতে ভালোবাস, এই প্রজাদের প্রকৃত ধর্মটা কী বল তো? এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেও প্রজাদেরই জানা হলো না আমার।'

আরণ্যের মনে পড়ে হরিকেলের পথে অবনী মাঝির সঙ্গে এ বিষয়ে ওর কথোপকথনের স্মৃতি।

'প্রজার আবার ধর্ম কী মহারাজ?'

একটু অবাক হয় লক্ষণ। মাথা নেড়ে বলে, 'বুঝিনি।'

'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম মহারাজ।'

'আমার রাজ্যের সবাই কী বৈষ্ণব?'

'না মহারাজ, তবে সুবিধেপ্রাপ্তরা প্রায় সবাই বৈষ্ণব। যারা অন্য ধর্মাবলম্বী, তারা আগের রাজাদের ধর্মানুসারী। আপনারা তেমন জোর জবরদস্তি করেননি বা সব জায়গায় করতে পারেননি, তাই ওরা ওগুলো ছেড়ে আপনাদেরটা আর

নেয়নি। আপনারা চাইলে নিশ্চয় ওরা সবাই বৈষ্ণব হয়ে যেত। রাজার ধর্ম মেনে চললে প্রজার মঙ্গল হয় অর্থাৎ প্রজারাও ধর্মের সুবিধে কিছুটা পায়।'

'ধর্ম জিনিসটা কী আরণ্য?'

'বিশ্বাসের বেশি আর কী মহারাজ। অনেক ধরনের আবেগ আছে মানুষের, অনেক ধরনের প্রবণতা, ঐ বিশ্বাসটাও এক ধরনের আবেগ বা প্রবণতা। যে রং আপনার ভালো লাগে বা যে খাবারে স্বাদ পান, তা অন্যের কাছে একই রকম নাও হতে পারে।'

'জোর করে কোনো কিছু কী ভালো লাগাতে পার আরণ্য, বিশেষ করে ধর্মের মতো একটা বিষয়?'

'জোর করে না পারলে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বা এরকম কোনো না কোনোভাবে।'

'তোমরা, মানে এই কবিরা কী সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী?'

'চিরন্তন সত্য বা মিথ্যা বলে কিছু নেই মহারাজ। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে। অথবা গতকালের মিথ্যে আজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। এটা নির্ভরশীল সময় ও অনুষঙ্গের উপর।'

'কখনো সোজা কথা বল না তোমরা।'

'সোজা কথা বললে কাঁধে মাথা থাকে না মহারাজ। আপনি অভয় দিয়েছিলেন তাই সাহস করে এসব বলছি। তাও এখন আপনার অন্তরে করুণা থাকায়। আপনার যুবাবস্থায় কথাগুলো বললে আজ নিশ্চয় এসব আমার বলতে পারার কথা না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮

শেষ পর্যন্ত প্রকৃতাবস্থাটা বুঝতে পারে লক্ষণ সেন। বিনা বাধায় হাত ছাড়া হয়ে গেছে লক্ষণাবতী। একটা রাজ্যের রাজধানী বেদখল হয়ে যাওয়ার অর্থ রাজার পরাজয়, রাজ্যটারই পরাজয়। এটাকে মেনে না নেয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না লক্ষণ সেনের। আরণ্যকে বলে, 'কোনোভাবে কি একবার কাশীতে নিয়ে যেতে পার আমাকে?'

অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে ওই ভাবনাটা থেকে বিরত রাখে ওকে আরণ্য। অন্য অর্থে একটা ভালো দিক দেখা দিয়েছে যে আজকাল অনেক কিছুই ভুলে যায় সে। এখন একটা গোঁ ধরেছে, তো একটু পরে অন্যটা। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথাটা ওর এত পরিষ্কার হয়ে যায় যে যুদ্ধাবস্থার মতোই প্রখর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনায় নিবিষ্ট হয়।

বড়াল, আত্রাই, করোতোয়া, ঢেঁপা, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদী ও অনেক শাখানদীর বেড়াজালে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষণকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে বল্লালপুরী ফিরে যাওয়াই ভালো। তার আগে লক্ষণ সেন পূর্বপুরুষ সামন্ত সেনের প্রতিষ্ঠা করা ছোট্ট রাজ্য দক্ষিণ রাঢ়ে একবার যেতে চায়। ওটা হয়তো সম্ভব হতে পারে ভেবে আরণ্য নৌবহরকে আদেশ দেয় ভাগীরথীর পূর্বতীর ধরে ভাটিতে নেমে যেতে। বড়াল নদীর দুতীরের দৃশ্যগুলো লক্ষণের চোখে এখনো গেঁথে রয়েছে। এর নিচু তীর দুটোর সবুজ বিস্তৃতি, মাঝে মাঝে দু-একটা বড় ঝাঁকড়া গাছ, কোথাও একসারি তাল গাছ, বাতাসের মিষ্টি ছোঁয়া, সবই যেন ওর আত্মার সঙ্গে মিশে রয়েছে। যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। পিতাজি যখন গৌড় অভিযানে পাঠিয়েছিল, এই বড়াল, মহানন্দা, পুনর্ভবা, তঙ্গন, আত্রাই, করতোয়া, এসব নদী ও নদীতীরের মানুষগুলোকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছে। যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধযাত্রার পথ তৈরি করেছে এসব জায়গায় রেকি

করে। সৈন্য পরিচালনার জন্য এসব নদী পথে ঘুরে বেরিয়েছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এত বেশি করে মনে পড়ে এখন ঐ সব দিনের কথা! পিতাজির কথা খুব মনে পড়ে। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'পিতাজির দেহাবসানের কত বছর হলো আরণ্য, মনে করতে পার?'

'আজ্ঞে মহারাজ। প্রায় এক কুড়ি বছর তো হবে।'

'আমার জন্মের সময় পিতাজির বয়স কত ছিল জান?'

'বলুন মহারাজ।'

'তাও ওই এক কুড়ির কাছাকাছি।'

'তিনিও দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন মহারাজ।'

'ঐ হিসেবে আমার যাবার সময় হয়নি? এত বেশিকাল বেঁচে আছি কেন আরণ্য?'

'এভাবে দেখার দরকার নেই মহারাজ। আমারও তো যাবার সময় হয়েছে। বরং আরো অনেক আগে হয়েছে।'

ভাগীরথীতে এসে নদীর দুতীরের ভূভাগের দৃশ্যপট বদলে যায়। প্রকৃতির প্রতিটা অংশই যেন নদীনির্ভর। প্রতিটা নদীর চরিত্র ও প্রকৃতি ভিন্ন। দুকূলের দৃশ্য ভিন্ন। মানুষ ও পশুপাখি ভিন্ন। স্থলের প্রকৃতি পুরোপুরি জলের উপর নির্ভরশীল। শুকনো, রুক্ষ মরুময় অবস্থানের মানুষগুলোও রুদ্র প্রকৃতির। সবুজ ও কোমল মাটির মানুষেরা শান্ত, নিরীহ, সঙ্গপ্রিয়। বঙ্গ-সমতটের মানুষের সঙ্গে রাঢ়ের মানুষের চরিত্রগত পার্থক্যটা ধরতে পারে লক্ষণ সেন।

কর্ণসুবর্ণের যেখানে এসে গঙ্গা দুভাগ হয়েছে সেখানে দুটো দিনের জন্য যাত্রাবিরতি নেয় লক্ষণ সেন। কত স্মৃতি মিশে আছে এসব নদীতীরে! এরপর ভাটিস্রোত ধরে দ্রুত নেমে আসে ওরা ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত। এই সেই ময়ূরাক্ষী যেখানে ভেসে যৌবনের অনেক প্রমোদরাত কাটিয়েছে। ময়ূরাক্ষী নদী ধরে কিছুটা পশ্চিমে যেতে চাইলে সায় দেয় না আরণ্য। এত বেশি অরাজক অবস্থা এখানে এখন যে যে-কোনো সময় উৎকট কোনো ঝামেলা এসে জুটে যেতে পারে। এসবে যেতে চায় না আরণ্য। মহারাজের শিশুসুলভ ইচ্ছে পূরণ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজধানী বিক্রমপুরে ফিরে যেতে চায় সে।

সপ্তগ্রামের কাছাকাছি এসে ওরা নৌকা ভিড়ায় ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। পশ্চিম তীরের খোঁজখবর যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তা ভয়াবহ। ওখানের মানুষজন পালিয়ে পুবদিকে চলে আসছে। অনেক আগেই লক্ষণ সেনের অনুগত সামন্তরা সেসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ওদের কেউ কেউ আগ্রাসী তুর্কিদের সঙ্গে আপোস করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। খাড়িকা ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একই অবস্থা। এসব এলাকায় সেনরাজার কোনো নিয়ন্ত্রণ আর নেই বলা চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তগ্রাম ছেড়ে কিছুটা দক্ষিণে নেমে আসার পর ভাগীরথীর পুবতীরে আবার নৌবহর থামায় ওরা। পশ্চিমদিক থেকে অজয় নদ যেখানে এসে মিশেছে সেখানের জল এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে চোখে আর কিছু পড়ে না। আকাশ পরিষ্কার থাকায় ঝকঝকে সূর্য নদীর জলে কোটি কোটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

বড় এক টুকরো মেঘের ছায়া হঠাৎ ভেসে এসে কখনো ঢেকে ফেলে চারদিকের জল ও স্থল। কিছুক্ষণ পর আবার মিলিয়ে যায় সেসব। নদীর বুকে চলতে থাকা অবিরাম আলোর খেলা দুচোখ মেলে দেখে আরণ্য। অসংখ্য পাল তোলা নৌকা নদীতে। বেশিরভাগই অজয় নদী দিয়ে নেমে আসছে ভাগীরথীর দিকে। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে লক্ষণ, 'নদীতে এত নৌকা কেন আরণ্য? কোথা থেকে আসছে ওরা?'

'আসছে না মহারাজ, পালিয়ে যাচ্ছে।'

'আমাদেরই দলে?'

'ওভাবে না দেখলেও চলে মহারাজ।'

'গাধাটাকে ঘোড়া বললে ওটা তো আর ঘোড়া হয়ে যায় না, আরণ্য। যা সত্য তাই বলি না কেন? রাজ্যের সবাই বলছে সেনরাজা পালিয়েছে, আর আমরা অন্যটা বললে হবে?'

'রাজারা পালায় না প্রভু। পশ্চাদপসরণ করে।'

'রাজাদের জন্য বেশ গালভরা একটা শব্দ বানিয়েছ তোমরা। যাই বল, সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কী?'

'না মহারাজ, আমি এটাকে একটা কৌশল হিসেবেই দেখছি। ওখান থেকে চলে এসে এখন রাজ্যের বাকি অংশটা অবশ্যই রক্ষা করতে পারব আমরা এবং সম্ভব হলে, ভবিষ্যতে হারানো রাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করতে পারব। ইতিহাসের এক পরীক্ষিত গতি ও প্রকৃতি এটা। আগেও এরকম হয়েছে অনেকবার। রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারলে পরাজয়ের বিষয়টা তখন আর সেভাবে দেখা হয় না।'

'তোমার আশা যেন সফল হয় আরণ্য। ঐ পর্যন্ত আয়ু মনে হয় না ভগবান দেবেন আমাকে।'

'আশা করি দেবেন। না দিলেও আপনার পুত্রপৌত্রাদি রয়েছে মহারাজ।'

'ঐ আশায়ই থাক তাহলে আরণ্য। ওদের ঐ যোগ্যতা থাকলে আজকের এ অবস্থায় আসতে হতো না আমাদের।'

কিছু বলার নেই আরণ্যের। চুপ করে থাকে সে। আবার বলে লক্ষণ, 'আমাদের পরাজয়ের কারণগুলো কী ভেবে দেখেছ আরণ্য?'

'না মহারাজ। রাজধানী ফিরে গিয়ে আপনার যুদ্ধবিশারদদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এ বিষয়ে। সামান্য এক পদ্যরচয়িতা আমি।'

'আবার সেই একই কথা বলছ? এসব যুদ্ধবিশারদেরা যদি সত্যিই বিশারদ হতো তাহলে তো পরাজয় হতো না আমাদের।'

'তাহলে আপনার তান্ত্রিকদের জিজ্ঞেস করুন। ওরা তো মন্ত্র দিয়ে সব জয় করে ফেলতে পারে। আপনার সেনাপতিদের দোষ দিয়ে লাভ কী। ওরা যখন তান্ত্রিকদের ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হয় তখন যুদ্ধটা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভেতর থাকে না। যুদ্ধের ফলাফল আপনার জ্যোতিষেরা আগেই যদি ঠিক করে রাখে তাহলে যোদ্ধাদের আর করণীয় কী থাকে।'

'কী বলতে চাও তুমি আরণ্য! তান্ত্রিক ও জ্যোতিষদের ভুল গণনার কারণে আমরা পরাজিত হয়েছি?'

'অপরাধ যদি ক্ষমা করেন তাহলে বলার অনুমতি দিতে পারেন।'

'বল, তুমি বল।'

'এই তান্ত্রিক ও জ্যোতিষের দলটাই হচ্ছে ভণ্ড। এদের গণনার আবার ভুল-শুদ্ধ কী?'

'শাস্ত্র অস্বীকার করছ তুমি?'

'আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছি মহারাজ।'

'ঠিক আছে আরণ্য। জানি না এই বৃদ্ধ বয়সে আর কী জানতে বা শিখতে হবে আমাকে! সারাজীবন ধর্মকে সত্য জেনে এসেছি। সবার উপরে স্থান দিয়েছি এটাকে। অন্তরের গভীরে লালন করে এসেছি সত্যধর্ম, সেসবের প্রতিফলন রয়েছে আমার সকল কর্মে, যদি ওসব ভুলও হয়ে থাকে, ওখান থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ আর নেই এ জীবনে!'

'যা জানার, যা শেখার, তা হয়ে গেছে আপনার মহারাজ। এখন রাজধানীতে ফিরে পুত্রপৌত্রাদিদের উপদেশ দিতে পারেন শিক্ষা গ্রহণ করতে।'

'তোমার পরামর্শ মনে থাকবে আরণ্য।'

দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বিরূপ জলহাওয়ায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। আরণ্যের শরীরের অবস্থাও ভালো না। কেশব সেনও সঙ্গে নেই। মাধবকে নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে বরেন্দ্রর অবশিষ্ট অংশ, বঙ্গ ও সমতট এসব অঞ্চল যেভাবেই হোক রক্ষা করার সব রকম ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। ছোটাছুটিতে সে কখন কোথায় থাকে, অনেক সময় জানাও যায় না।

মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অবস্থান থেকে খবর পাঠায় মহারাজকে। রাজ্যটার ভার যে ওর কাঁধেই যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। কেশবকে পাঠানো হয়েছে বিক্রমপুরে নিশ্চিত ও দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন শোধরানোর পালা। লক্ষণ সেন জীবিত থাকা অবস্থায় এই ঘুরে দাঁড়ানোটা অন্তত দেখে যেতে চায়।

নাব্যাবক্ষশিকায় পৌঁছে আরণ্য সিদ্ধান্ত নেয়, আর দক্ষিণে নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজধানী বিক্রমপুরে ফিরে যেতে। মাঝিমাল্লাদের আদেশ দেয় শাখা নদীগুলো দিয়ে আড়াআড়ি পুবে নৌবহর চালিয়ে নেয়ার জন্য। খুব যে একটা সময় বাঁচে এতে, তা মনে হয় না। গত প্রায় একটা বছর এক রকম জলের উপর ভেসে রয়েছে বলা যায়। একটু সুস্থ হলে লক্ষণকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলে আরণ্য।

এত সহজে এটা মেনে নেবে লক্ষণ সেন তা বুঝতে পারেনি আরণ্য। বয়সের কারণে হয়তো বুঝতেই পারে না কোনটায় সম্মতি দিচ্ছে আর কোনটায় বেঁকে বসছে।

বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে যতটা উদ্বেগের ভেতর ছিল আরণ্য তা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। এখন শুধু মহারাজের স্বাস্থ্যটা নিয়ে যত দুশ্চিন্তা। এদিকের কোমল জলহাওয়া মনে হয় কিছুটা প্রাণ এনে দিয়েছে লক্ষণ সেনকে। বিকেলের দিকে প্রতিদিন বেশ কিছু সময় কথা বলে কাটায় সে। মনের গভীরে থাকা ব্যথাটা এখন আর লুকোতে পারে না। এক বিকেলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে আরণ্যকে, 'সেনদের অধীনে একটা স্বাধীন রাজ্য তো ছিল আমাদের আরণ্য, নাকি ছিল না?'

হঠাৎ এ প্রশ্নটা কেন করেছে লক্ষণ সেন তা বোঝার চেষ্টা করে আরণ্য। একটু ভেবে বলে, 'মহারাজ, স্বাধীনতা শব্দটার মধ্যেই ওটার জবাব রয়েছে। প্রজাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ কিছুটা ভিন্ন।'

'কী রকম?'

'বিগত একশো বছর প্রজারা হয়তো সেনদের অধীনে ছিল, পরের একশো বা কয়েকশো বছর আরো দূরের কোনো গোষ্ঠী বা গোত্রের অধীন থাকবে। তারপর আবার অন্য কারো, এভাবেই তো চলে এসেছে। এখানে প্রজাদের স্বাধীনতা কোথায়?'

বিষয়টা লক্ষণ সেনকে বোঝাতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারে না আরণ্য। লক্ষণ সেন জিজ্ঞেস করে, 'আমার রাজ্যের প্রজারা কী বুঝতে পেরেছে যে ওরা স্বাধীনতা হারাতে বসেছে?'

'স্বাধীনতা শব্দটা যদিও একটা সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত অর্থ বহন করে কিন্তু এটার প্রতিক্রিয়া বা পরিণাম মনে হয় আপেক্ষিক ও একটু গোলমেলে।'

'কেমন?'

'সবার কাছে এটা একই অর্থ নিয়ে আসে না। নিজের স্বাধীনতার জন্য অন্যের স্বাধীনতা হরণ করতে হয়। তার অর্থ, একই সময়ে একই জায়গায় ভিন্ন

মানুষের কাছে এটার অর্থ ভিন্ন রকম। মহারাজের কাছে এটা যে-রকম মনে হচ্ছে, প্রজাদের কাছে ওটা একই রকম মনে হওয়ার কারণ নাও থাকতে পারে।'

'তাহলে কী বলতে চাও প্রজারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না?'

'খুব বোঝে। ওদের কাছে স্বাধীনতা হচ্ছে আর্থিক ও অন্যভাবে কত কম অত্যাচারিত হয়ে জীবন যাপন করা যায়। স্বজাতির বা নিজগোত্রের অথবা নিজেদের অঞ্চলের কারো অধীন থাকলে ওরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও কম নিগৃহীত হবে, এমন আশা করে। এটাই বোধ হয় ওদের স্বাধীনতা।'

'তুমি তো সব কিছুর অর্থ পাল্টে দিচ্ছ আরণ্য।'

'কিছুই পাল্টাচ্ছি না আমি মহারাজ। ঐ ক্ষমতা আমার নেই। রাজা, রাজ্য, প্রজা সবই ক্ষমতাশালীদের আজ্ঞাধীন। আমি এক সামান্য পদ্যকার, অতি নগণ্য এক শব্দশ্রমিক!'

'এখন তো পদ্য রচনা করছ না তুমি, আরণ্য। আমার মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছ।'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ। ওরকম কোনো ইচ্ছে আমার নেই। প্রজাদের স্বাধীনতা বিষয়টা যেহেতু উঠিয়েছেন, তাই ওটার সামান্য ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি। একটা রাজ্যের ইতিহাস একজন রাজা বা কিছু প্রজার জীবনকালের মধ্যে সীমিত থাকে না। ধরুন আমাদের এই রাজ্যটা, এটার রাজা এখন আপনি, একশো-দুশো-পাঁচশো বছর আগে কে বা কারা এটার রাজা ছিল? বর্মনদের কাছ থেকে যখন আপনারা এই জায়গাটা ও এখানে বসবাসকারী মানুষদের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তখন প্রজারা কী স্বাধীনতা পেয়েছিল, না হারিয়েছিল?'

'এটার জবাব তো আমার কাছে নেই আরণ্য।'

'অথচ আমার কাছে আছে। এখানেই পার্থক্য। যাহোক, কোন সব মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ রাজ্য, এটার সীমানা কী ছিল, রাজধানী কোথায় ছিল, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে না দক্ষিণে?'

'তুমিই বল।'

'মহারাজ, আমার কিছু বলার নেই এখানে। গুণীজনেরা যা বলে গেছেন তা শোনাতে পারি।'

'তাই শোনাও।'

'রাজা যত বড়, রাজ্য তত বড়। রাজা যত ভালো, রাজ্য তত ভালো। রাজার গুণে রাজ্য। রাজ্যের কোনো পরিচয় নেই। অন্তত এখনো গড়ে উঠেনি। রাজার নামেই রাজ্যের পরিচয়। প্রজারা এখানে একেবারেই গৌণ। ঐজন্যই বলছি মহারাজ, প্রজাদের জন্য ভেবে মনোকষ্ট পাবেন না।'

'ভেবে বলেছ কথাটা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে আরণ্য?'

'ওটার অন্য কারণ থাকতে পারে মহারাজ।'

'আর কী কারণ থাকতে পারে?'

'অভয় দিচ্ছেন মহারাজ?'

'নিশ্চয়, নির্ভয়ে বল তুমি আরণ্য।'

'মহারাজের কষ্ট হচ্ছে নিজেদের রাজ্যটা আংশিক হারাতে হলো বলে।'

'তাই মনে কর তুমি?'

'আজ্ঞে প্রভু।'

কুমার নদীতে নৌকা এসে পৌঁছুলে লক্ষণের পূর্বস্মৃতিগুলো চারদিক থেকে সোনালি আলোকলতার মতো জড়িয়ে ধরে ওকে। কত শত নৌবিহার, আনন্দভ্রমণ করেছে এ নদীর বুকে! এই নদীজলের প্রতিটা বিন্দুকে মনে হয়েছে শত রূপে আনন্দ দেয়া সহস্র প্রমোদবারি। আজ মনে হয় অশেষ দুঃখের অনিঃশেষ অশ্রুজল। দুঃখের নদীতে ভেসে ভেসে এখন হারিয়ে যাচ্ছে কোন অজানায়, ভগবান জানেন। আবার কথা বলতে শুরু করে লক্ষণ সেন, 'তোমার কী মনে হয় আরণ্য, আমাদের সেনাদলের এই অধপাতের কারণ কী? লক্ষাধিক পাইক ও তীরন্দাজের কথা না হয় ছেড়েই দিলে, এমনকি হাজার হাজার ঘোরসওয়ার সৈনিকদের কথাও বাদ দাও, এই যে শত শত হাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিশাল হস্তীবাহিনী, ওটা যদি শুধু হেঁটেও যেত ওদের দিকে তাহলে এই কয়েক হাজার বিধর্মীর হাড়মাংসও খুঁজে পাওয়ার কথা না।'

'মহারাজ নিজেও জানেন যে আমাদের প্রায় কেউই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।'

'কেন?'

'যুদ্ধ করার আগেই পরাজিত হয়ে বসেছিলাম আমরা।'

'এটা হলো কীভাবে?'

'আপনার সমরবিশেষজ্ঞ বিভাগ জানাতে পারবে এটা মহারাজ। এ বিষয়ে কিছু বলা আমার উচিত হবে না।'

'যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন এটার প্রতিকার কী?'

'খুব সহজে পরাজিত হয়েছি আমরা। কিন্তু আবার জয়ী হওয়াটা হবে ঠিক তার বিপরীত।'

'তাই মনে কর?'

'আজ্ঞে মহারাজ। আবার সৈন্য সংগঠিত করে ওদের পরাজিত করা অসম্ভবের প্রায় কাছাকাছি। প্রতিপক্ষের আছে লুটতরাজ করা অঢেল অর্থ। সব সম্পদ কোষাগারে রেখে দেয় না ওরা। যতটা নিতে পারে নেয়। বাকিটা সৈন্যদের

মধ্যে বিলিয়ে দেয়। সৈন্যরাও লুটতরাজ করে সম্পদ আহরণ করতে পারে। ওদের ধর্মে আছে বৈধভাবে চারটে নারী নিজেদের জন্য রাখতে পারে। তাছাড়া লুটেরগুলো তো আছেই। এই লোভ ছেড়ে সৈন্যরা আমাদের দিকে আসবে কেন মহারাজ?'

'দেশপ্রেম বলে সৈন্যদের কিছু কী থাকবে না আরণ্য?'

'এই ধারণাটাই তো ওদের নেই। সৈন্যদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা। যারা বেশি বেতনভাতা, সুযোগসুবিধা দেবে ওদের জন্যই যুদ্ধ করবে। তুর্কিরা যেসব সুযোগসুবিধা দিচ্ছে, মহারাজ কী ওগুলো দিতে পারবেন?'

'ভাবনায় ফেললে আরণ্য।'

'ভেবে লাভ নেই মহারাজ।'

'তাহলে রাজ্যোদ্ধারের কোনো আশা নেই আমাদের?'

'বরং বাকিটুকু রক্ষা করার চিন্তা করা ভালো।'

চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে লক্ষণ সেন। চার কুড়ি বছর পেরোনোর পর মানুষের মাথায় থাকে কী আর! মৃত্যুচিন্তা থাকলে হয়তো কিছুটা থাকতে পারে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে আসে নদীর বুকে। খুব ইচ্ছে হয় লক্ষণের এখন এই বৃষ্টিতে একটু ভিজে। আরণ্যের কাছে মনের ইচ্ছে প্রকাশ করায় সে বলে, 'ঠিক আছে মহারাজ, আমিও ভিজব, বৃষ্টি বাড়ুক আরেকটু।'

সমতটের এই বৃষ্টি যে কত মধুর! মনে মনে আক্ষেপ করে লক্ষণ, হায় ভগবান, কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেল জীবনের দিনগুলো! নৌকার ভেতর বসে জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় বৃষ্টি দেখে। ঠাণ্ডা লাগে বেশ। গায়ে কাপড় জড়িয়ে নেয়। ভেতরে অন্ধকার। পিদিম জ্বালিয়ে নিয়ে আসে এক ভৃত্য। ওটা নিভিয়ে দিতে বলে লক্ষণ। অন্ধকারের ভেতর ঘরঘরে গলায় আরণ্যকে বলে, 'ওরা যে প্রচার করছে সেনরাজা পালিয়েছে, এটার প্রতিক্রিয়া তো ভয়াবহ। এটা থেকে জনগণের মনোভাব ফেরানোর জন্য হলেও তো গৌড় রাজ্যটা আবার আমাদের দখলে আনতে হবে।'

'গৌড় তো কখনোই আমাদের ছিল না মহারাজ। পালদের কাছ থেকে কিছুটা হাতিয়ে নিয়েছিলাম। পালরা যদি এখনো বহাল থাকত অথবা শক্তিশালী থাকত, তাহলে হয়তো ইতিহাসটা অন্যরকম হতো। কথায় বলে না মহারাজ, যাদের বাড়িঘর তাদেরই সেটা দখলে রাখতে হয়। ওই বাড়ির মালিক তখন কাছে ছিল না বলে হয়তো হাতবদল হয়েছে।'

'এটাকে হাতবদল বলবে তুমি আরণ্য?'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, অন্যভাবে বলা উচিত ছিল আমার।'

'অন্য কীভাবে বলতে পারতে?'

'অপরাধ ক্ষমা করবেন মহারাজ। ভারতবর্ষের কোনা কিন্তু তিনটা। ঐতিহাসিককাল থেকে এই তিন কোনা ঠোকাঠুকি করে চলেছে। যদি এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনা তিনটা অর্থাৎ দক্ষিণের চোলরাজারা, পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার রাজারা, আর পুবের পালরা ও আপনারা মিলেমিশে উত্তর পূর্ব কোনাটায় থাকতে পারতেন, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি না করতেন, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিরই সাধ্য ছিল না ভারতবর্ষের দিকে হাত বাড়ায়। যা করা উচিত ছিল তা না করে কী করেছি আমরা? যখন দেখেছি এই তিন কোনার কোনো একটা কোনা আক্রান্ত হয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করে আরো তলিয়ে যাওয়ার জন্য সব কিছু করেছি। ফলে হয়েছেটা কী? সবটাই যেতে বসেছে। মনে হয় না এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে।'

'তাহলে কী আমরা স্বাধীনতাটা হারাতে বসেছি?'

'মহারাজ আবার স্বাধীনতায়ই ফিরে এলেন! ঠিক আছে, যদি ওটাকে স্বাধীনতা হারানোই বলেন তাহলে আমাদের এই পূর্বভারতের স্বাধীনতা হারানোর শুরুটা আপনার হাতেই হলো। ইতিহাসের এই নির্মম সত্যটা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর উপায় কী মহারাজ?'

'নওদা ছেড়ে আসার সময় যতটা না কষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়ে এখন অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছি আরণ্য। এ আলোচনা এখানেই থাক আপাতত।'

'যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তাহলে আভূমি নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি মহারাজ।'

'হয়তো আমার ভালোই লাগত যদি বলতে পারতাম যে যা বলেছ তা অসত্য।'

ফল্গুগ্রামে পৌঁছে আবার বেঁকে বসে লক্ষণ সেন। বিক্রমপুর যেতে চায় না সে। প্রকৃতিরও রুদ্র অবস্থা। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমতটের এ ঋতুতে স্থলভাগে অবস্থান করাই সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সেখানে দীর্ঘকাল জলের উপর ভেসে কাটানোর পর মানুষের শরীর ও মন ঠিক থাকে কীভাবে। মাঝে মাঝে আরণ্যের মনে হয় যে ওরা কোনো বেদে বা জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে কিনা। বৃষ্টি বাদলের ফাঁকে ফাঁকে যখন সুযোগ পেয়েছে স্থলভাগে কাটিয়েছে কিছু সময়। কিন্তু কদিন ধরে নৌকা থেকে মাথা বের করা যায় না। আকাশে সূর্য নেই, কোনো দিন ছিল কিনা মনে করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ভাটি বাংলার এই বর্ষা ঋতুর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো অংশের হয়তো মিল নেই। মৌসুমী এমন বৃষ্টি আর কোথাও ঝরে কিনা তা জানে না আরণ্য। এ যেন বৃষ্টি নয়, আকাশ থেকে জলের একটা বিশাল ঘড়া উল্টো করে ঢেলে দেয়া। নৌকার ভেতর এমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে যে সবকিছুতে কেমন একটা ভ্যাঁপসা গন্ধ। মহারাজের শরীর ঠিক রাখবে না নিজে সুস্থ থাকবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না সে। আর এ সময়ে কিনা গোঁ ধরে বসে আছে মহারাজ!

ভাগ্য কিছুটা ভালো বলতে হবে। পরের দিন চনচনিয়ে রোদ ওঠে। পদ্মাবতীর এক নির্জন চরে মহারাজের বজরা নোঙর করে স্থলে উঠে যায় ওরা।

বাঁশ ও চাটাই দিয়ে বানানো তাঁবু ফেলে মহারাজের থাকার ব্যবস্থা করে। নৌকার দরজা জানালা সব খোলা রেখে ভেতরটা শুকিয়ে নেয়। কাপড়চোপড় সব রোদে মেলে দিয়ে শুকানোর সুযোগ পাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের পর মহারাজকে কিছুটা চাঙ্গা মনে হলে সরাসরি প্রশ্ন করে আরণ্য, 'রাজধানীতে ফিরে যেতে চাইছেন না কেন মহারাজ?'

'পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে কখনো ফিরেছি ওখানে আরণ্য?'

'এমন ভাবছেন কেন মহারাজ। কার কাছে পরাজিত হয়েছেন আপনি?'

'যে রাজা তার রাজধানী ফেলে চলে আসে সে কী পরাজিত না আরণ্য?'

'লক্ষণাবতী ছিল আপনার উপরাজধানী।'

'না আরণ্য, ওটাকেই আমি পরবর্তী সেনরাজাদের জয়স্কন্ধাবার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছি। বিক্রমপুর ছিল আমার পিতার রাজধানী। পূর্বপুরুষদের রাজধানী।'

চুপ করে থাকে আরণ্য। জিজ্ঞেস করে লক্ষণ সেন, 'শর গণনা জান আরণ্য?'

একটু অবাক হয় সে। হেসে বলে, 'বাল্যাবস্থায় শিখেছিলাম মহারাজ। এখনো মনে হয় জানি।'

'গুনে দেখ তো সেনরাজ্যটা কয় পুরুষে গড়াল।'

সত্যি সত্যি কর গুনে বলে আরণ্য, 'আপনি পর্যন্ত পাঁচ পুরুষ।'

'তুমি কী হরি সেন দেবকে বাদ দিয়েছ?'

'তিনি কী সেনরাজ্যটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? যদ্দূর জেনেছি সামন্ত সেন দেব...'

ওকে বাধা দিয়ে বলে লক্ষণ সেন, 'না, হরি সেনদেব স্বাধীন সামন্তরাজা ছিলেন।'

'যদ্দূর জানি পালরাজাদের...'

আবার বাধা দেয় লক্ষণ সেন।

'হ্যাঁ, পালরাজাদের অধীন একটা অঞ্চলের স্বাধীন সামন্তরাজা ছিলেন তিনি। তাকেই আমাদের কুলপঞ্জীতে সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধরি।'

'জানা ছিল না মহারাজ।'

'তাকেই আমাদের পূর্বপুরুষ, স্বাধীন রাজা হিসেবে গণ্য করি।'

একটু ভাবনায় পড়ে আরণ্য। মনের ভেতর যে কথাটা এসেছে তা বলবে কিনা বুঝতে পারে না। বুড়ো হলে মানুষের সাহস যেমন থাকে না ভয়ও তেমনি কমে যায়। বলে ফেলে, 'পৃথিবীতে কোনো স্বাধীন রাজ্য নেই মহারাজ। সবাই কোনো না কোনো রাজ্যের অধীন, অথবা স্বরাজ্যের।'

মাঝে মাঝে তুমি বড় হেঁয়ালি কর আরণ্য। আরেকটু বুঝিয়ে বল, স্বরাজ্যের অধীন বলতে কী বুঝিয়েছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগেও এসব নিয়ে অনেক কথা বলেছি আপনার সঙ্গে, মহারাজ। যাহোক, রাজার অধীন দুটোই, রাজ্য ও প্রজা। প্রজা ছাড়া রাজ্য হয় না, রাজ্য ছাড়া প্রজার অস্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন হতে হলে দুটোরই হতে হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো প্রজা আছে যে রাজার অধীন নয়? তাহলে স্বাধীন শব্দটার অর্থ একজন প্রজার কাছে কী অর্থ বহন করে মহারাজ? রাজার কাছে হয়তো এটার একটা অর্থ আছে।'

'তুমি কী বলতে চাও একজন প্রজার কাছে স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই?'

'সামষ্টিক একটা অর্থ থাকতেও পারে।'

'গোলমাল করে দিয়েছে আরণ্য।'

'ওটা থাক মহারাজ। দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বিষয়কে ভিন্ন দেখাতেই পারে।'

'ঠিক আছে আরণ্য, ওটা থাক। আরেকটা বার কর গুনো তাহলে, দেখি তোমার গণনাটা ঠিক আছে কিনা।'

'কী মহারাজ?'

'আমাদের সেনরাজ্যটা কপুরুষে এসে দাঁড়াল।

একটু অবাক হয় আরণ্য। এ বিষয়ে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই না কথা বলল ওরা! চট করে বলে এবার, 'সাত পুরুষ।'

'কীভাবে?'

'মাধব সেন আমাদের পরবর্তী রাজা হচ্ছেন না? তিনিই তো রাজ্যটার হাল ধরে আছেন।'

'তাই কি?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'তাহলে সাত পুরুষে এসে রাজ্যটা শেষ হয়ে গেল!'

'না মহারাজ। একটা রাজ্য গড়ে উঠতে যেমন সাত পুরুষ লাগে, শেষ হতেও লাগে সাত পুরুষ। যুবরাজ মাধব সেনের পরও কম পক্ষে আরো সাত পুরুষ ধরে গড়াবে ওটা।'

'তাই মনে কর আরণ্য? সেনদের রাজ্যটা চৌদ্দ পুরুষে গড়াবে?'

'আজ্ঞে, তাই মনে করি মহারাজ।'

'আগামী দিনের ইতিহাসবিদেরা কী এই চৌদ্দটা পুরুষের সন্ধান পাবে?'

'নিশ্চয় পাবে মহারাজ।'

'কীভাবে পাবে? আমরা কী কোনো ইতিহাস লিখি?'

'কেন ওটা গড়ে উঠেনি আমিও বুঝতে পারি না মহারাজ।'

'ঠিক আছে আরণ্য, ওটা থাক। বল তো এই সাত পুরুষ, চৌদ্দ পুরুষের হিসাবটা এল কোত্থেকে?'

'ওটা আপনার শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতেরা বলতে পারবে মহারাজ।'

'খবরদার আরণ্য, ওদের টিকিটাও আর দেখতে চাই না আমি। এই বুড়ো বয়সে আমাকে রাগিয়ে তোলো না।'

'ক্ষমা করবেন, মহারাজ।'

সত্যিই উত্তেজিত হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। ওকে একটু স্বাভাবিক করার জন্য একটা পুরোনো সুখস্মৃতি মনে করার চেষ্টা করে আরণ্য। জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের বরুণের কথা মনে আছে মহারাজ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে আরণ্য। আমার যুবাবয়সে একটা কুমারীপূজার আয়োজন করতে চেয়েছিল সে। ওকে খবর পাঠাও তো, ওর আমন্ত্রণে আমি প্রস্তুত এখন। একটা বড়সড় আয়োজন করতে বল ওকে।'

মহারাজের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। খুব ভালো লাগে আরণ্যের। একটু অবাক হয় সে। মহারাজ কী ভুলে গেছে যে প্রায় দেড়যুগ আগে গত হয়েছে বরুণ। ওর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মহারাজও যোগ দিয়েছিল। থাক, এটা আর মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। বলে, 'আগামী শুক্লাতিথীতে অনুষ্ঠানটা হোক তাহলে, মহারাজ।'

'হ্যাঁ, আরণ্য। আগামী শুক্লাতিথীতে। তুমিও যোগ দেবে ঐ কুমারীতন্ত্রে।'

ভাঙা গলায় আবার হেসে ওঠে লক্ষণ সেন। আরণ্যও যোগ দেয় ঐ হাসিতে। লক্ষণের চোখের কোণে বাষ্প জমে ওঠে। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'স্বাধীনতা হারিয়েও হাসতে পারে মানুষ, আরণ্য?'

'না মহারাজ, ওটা পেতে বা রক্ষা করতে যে জানে, সে ওটা হারায় না।'

'যে হারায় সে হয়তো বোঝেই না যে সে কী হারায়।'

'ওটাই ঠিক, মহারাজ। মানুষ হয়তো বোঝেই না।'

'আমার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতে চাইছে, আরণ্য।

'রাজাদের চোখে অশ্রু থাকে না, থাকে রুধির, মহারাজ।'

'তুমি তো কবি আরণ্য, বল না কেন, রুধিরাশ্রু।'

'ভালো বলেছেন মহারাজ।'

'আবার একটা হাসির কথা বল তো আরণ্য। একটা প্রকৃত হাসির কথা। একটু হাসতে চাই, আরণ্য।'

'মহারাজকে কী মনে করিয়ে দেব যৌবনের কোনো এক দিনের কথা, যেদিন আমাকে হাসতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে, আরণ্য। সেদিন হয়তো কিছু একটা হারিয়ে গিয়েছিল তোমার জীবন থেকে।'

চুপ করে থাকে আরণ্য। কথা আর এগোয় না। কোনো একটা কিছু না, সেদিন পুরো জীবনটাই হারিয়ে গেছিল আরণ্যের। এখন যা যাপন করে চলেছে তা শুধু একটা মানুষ নামের জন্তুর জীবন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯

হেমন্ত শুরু না হতেই বঙ্গ-সমতটের আকাশে ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করেছে নানা বর্ণ ও রঙের পাখিরা। হয়তো আর কদিনের ভেতর উত্তরের অতিথি পাখিরাও আসতে শুরু করবে। শীত ঋতু মনে হয় কিছু আগে এসে গেছে উত্তরের দেশগুলোয়। মানুষের চেয়ে পশুপাখিরা অনেক বেশি বোঝে প্রকৃতির ভাষা। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উড়ে এসেছে দল বেঁধে। হালকা নীল আকাশে রুদ্রাক্ষের মালার মতো ঝাঁকের পর ঝাঁক ভেসে আসে। এদেশে এবার ফসলও হয়েছে খুব ভালো। ঝড় ও বৃষ্টি কম হওয়ায় ক্ষেতের ফসল মার খায়নি। বন্যায় তলিয়ে যায়নি পাকা ধান। মগধ-মিথিলা-রাঢ়ের প্রভাব দক্ষিণের এদিকটায় তেমন আলোড়ন তোলেনি।

শেষ পর্যন্ত সবার পরামর্শ মেনে নিয়েছে লক্ষণ সেন। লক্ষণাবতী যাওয়ার ইচ্ছেটা চাপা দিয়ে রাখে কিছুদিনের জন্য। শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার, যদি কোনোভাবে সম্ভব হয় ওটা। বৈদ্যদের পরামর্শে কিছুদিন সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি কোথাও লোনা বাতাসে অবসর কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে। আরণ্যের ইচ্ছে হরিকেলের ওই ছোট্ট দ্বীপের নারিকেল কুঞ্জে যাওয়া। সুফিসাধু খুররম শাহের নামে ওর ভক্তরা ওটার নাম দিয়েছে খুররমপুর। লোকমুখে এখন ওটা হয়ে গেছে খড়মপুর।

চন্দ্রদ্বীপের গাঢ় সবুজ উপকূল চোখ জুড়িয়ে দেয় লক্ষণ সেনের। নৌবহর ভিড়াতে বলে ওখানে। বৈদ্যের দল খুব আপত্তি করে না। মেঘনার মোহনায় নদীর বিস্তার এত বেশি যে সমুদ্রের সঙ্গে পার্থক্য করা যায় না। শীত এসে গেছে তাই নদীর বিস্তৃতি কিছুটা কমেছে। অন্য তীরের আভাস সামান্য হলেও পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। প্রচুর ফসল ও ফলমূল জন্মে এই দ্বীপ দেশটায়। এখানের সুগন্ধি চাল ও মাছ এত সুস্বাদু যে একবার যারা এখানে এসেছে, সহজে ছেড়ে যেতে চায় না।

রাজকীয় বজরার আরামকেদারায় বসে আকাশের পাখিগুলোর সাদামাটা নিয়তির কথা ভেবে আরো বিষণ্ন হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। এই পাখিরাও একদিন ফিরে যাবে নিজের দেশে। লক্ষণের হয়তো আর কখনোই ফেরা হবে না। শরীরের যা অবস্থা মনে হয় এটাই অন্তিম যাত্রা। পরক্ষণে ভাবে, কোনটা ওর দেশ? বিক্রমপুর, বিজয়পুর, লক্ষণাবতী, রাঢ়, বরেন্দ্র, মগধ, মিথিলা... নাকি পূর্বপুরুষের কর্ণাট? সারা জীবন তো কেটে গেল হাতি বা ঘোড়ার পিঠে, নয়তো নৌকায় ভেসে!

ঝকঝকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে পাকা আম নিয়ে আসে মাধবের বড় মেয়ে প্রণতি। একটু অবাক হয় লক্ষণ সেন। বছরের এ সময়ে আম এল কোথা থেকে! খাওয়ার জন্য মন নেচে ওঠে। কোথায় আম পেয়েছে জিজ্ঞেস করলে প্রণতি বলে, 'দাদুমশায়, এগুলো তো আপনার হাতে লাগানো আশ্বিনী আম বাগান থেকে তুলে আনা। প্রচুর ফলেছিল এবার, বল্লালপুরী থেকে বড় এক নৌকা এসেছে। সবাই খাচ্ছে। বেশ মজা। বৈদ্যদের বারণ থাকায় এত মিষ্টি আম আপনাকে দেয়া হচ্ছে না।'

বল্লালপুরীর আম বাগান! একটা কালো ছায়া নেমে আসে লক্ষণের চোখে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলে ওটা। প্রণতিকে বলে, 'দে, দে প্রণতি। বৈদ্যের দল দেখার আগেই দুটো মুখে দিয়ে নি। পথ্য পাঁচন আর তেতো জল গিলিয়ে আমার সবকিছুই তেতো করে তুলেছে ওরা।'

'মিষ্টি খেলে নাকি মেহ বেড়ে যাবে আপনার, সেজন্যই তো বারণ করে, দাদুমশায়।'

'বাড়ুক, আর কত!'

'আমি খাইয়ে দেই দাদু?'

'দে।'

প্রণতির মাথায় হাত রাখে লক্ষণ সেন। পরিবারের সদস্যদের দিকে চোখ মেলে তাকাবার সময়ও পায়নি এ জীবনটাতে। দেখতে কী সুন্দর হয়েছে মেয়েটা! কবে এতটা বড় হয়ে উঠেছে চোখেই পড়েনি। দেবীপ্রতিমার মতো নিটোল ওর সৌন্দর্য। কী মিষ্টি মেয়ে! মধুর মতো মিষ্টি এই আমগুলো ওর হাতের ছোঁয়ায় স্বর্গের অমৃতফল হয়ে উঠেছে। ভগবান, এত কিছু থেকে বঞ্চিত রেখেছ আমাকে!

আমের থালা নিয়ে কখন চলে গেছে প্রণতি খেয়াল করেনি। পাঁচনের পেয়ালা নিয়ে রাজবৈদ্য এলে এবার বেঁকে বসে লক্ষণ সেন। অবস্থা খারাপ দেখে রাজমহিষীকে পাঠিয়ে দেয় সে। কথা বলার ফাঁকে ওটা গিলিয়ে দিতে সক্ষম হয় বসুদেবী। অনেকক্ষণ বসে থেকে কোমরে ব্যথা হওয়ায় শুইয়ে দিতে বলে ওকে। শুয়ে শুয়ে খোলা আকাশ দেখে লক্ষণ সেন। আরণ্যকেও আসতে বলতে পারে না যে একটু কথা বলবে। কদিন ধরে ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে খুব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাতে পারছে না একটুও। বুকে কী সব মালিশ করছে বৈদ্যের দল কোনো কাজ নাকি হচ্ছে না। দক্ষিণের লোনা বাতাস নাকি ফুসফুসের জন্য ভালো। তাই প্রতিদিন ভাটির দিকে নৌকা বেয়ে চলেছে লক্ষণের নৌবহর। শুয়ে বসে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। আর না পেরে বল্লভকে ডেকে বলে, 'দাদু, আমাকে একটু আরণ্যের বজরায় নিয়ে যাবি?'

'ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করে নেই দাদুমশায়?'

'ঠিক আছে, যা। বৈদ্য বেটাদের জিজ্ঞেস করতে যাসনে আবার।'

হেসে ভেতরে চলে যায় বল্লভ। একটু পরে বেরিয়ে আসে বসুদেবী। বলে, 'মহারাজের সঙ্গে আমিও আসতে পারি?'

'না আসাই তো ভালো।'

'পৃথ্বীশ সঙ্গে যাক তাহলে?'

'বল্লভ তো আছেই।'

'মহারাজ কী বুঝতে পারছেন, এক বজরা থেকে আরেক বজরায় উঠানামার কাজ কতটা? এটা থেকে নামতে হবে। ছোট পানসিতে করে আবার ওটায় চড়তে হবে।'

'বুঝতে পারছি মহারানি, বসুদেবী। ওটুকু শক্তি এখনো আছে মনে হয়।'

'মহারাজকে দেখে তা মনে হয় না।'

'পারব বসুদেবী।'

'জলে পড়ে গেলে?'

হেসে ওঠে লক্ষণ সেন।

'ঠিক আছে, পৃথ্বীশকে সঙ্গে দাও। চাইলে আরো দুজন পৃথ্বীশ বানিয়ে দাও।'

লক্ষণের বালকসুলভ উত্তেজনায় হাসি ফুটে ওঠে রাজমহিষীর মুখেও।

'অপরাধ নেবেন না মহারাজ।'

'না, নেইনি।'

বল্লভকে কী সব বুঝিয়েসুজিয়ে ভেতরে চলে যায় রাজমহিষী। আরণ্যের নৌকায় চড়তে গিয়ে সত্যিই হাঁপিয়ে ওঠে লক্ষণ সেন। ওকে দেখে লাফিয়ে উঠতে যায় আরণ্য। জোর করে ওকে শুইয়ে দেয় বৈদ্য হরিচরণ। লক্ষণও হাতের ইশারায় শুয়ে থাকতে বলে ওকে। নৌকার ভেতরের অবস্থা দেখে লক্ষণের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভ্যাঁপসা দুর্গন্ধ ভেতরে। কীসব তেল মালিশ করেছে আরণ্যের বুকে ও পিঠে। দরজা জানালা বন্ধ রেখে আরো অসুস্থ অবস্থা তৈরি করেছে। সুস্থ মানুষকেও অসুস্থ করে তোলার জন্য যথেষ্ট এমন পরিবেশ। বৈদ্যদের নিষেধ উড়িয়ে দিয়ে দরজা জানালা সব খুলে দিতে বলে ভৃত্যদের। আরণ্যকে ধরে নৌকার বাইরে পাটাতনে রোদের নিচে শোয়ানোর আদেশ দেয়। নৌকার দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে যদি বসতে চায় তারও

ব্যবস্থা করে। বাইরে এখনো চমৎকার রোদ। লক্ষণকে দেখেই যেন আরণ্যের অর্ধেক অসুখ ভালো হয়ে গেছে। নৌকার বাইরে এসে আর শুয়ে থাকতে চায় না সে। বালিশে হেলান দিয়ে বসে। প্রথম দিকে খুব কাশতে থাকে। তারপর কাশির ধকল কিছুটা কমে এলে খোলা বাতাসে সত্যিই কিছুটা ভালো হয়ে ওঠে আরণ্য। শ্বাস টেনে টেনে কথা বলার চেষ্টা করে। এটায় বাধা দেয় লক্ষণ সেন। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস একটু সহনীয় হয়ে উঠলে ভৃত্যদের সরে যেতে আদেশ দেয় লক্ষণ সেন। পাশে গিয়ে বসে আরণ্যের। হাতে হাত রেখে দুবৃদ্ধ শুকনো চোখে বসে থাকে নদীর জলের দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে। ধীরে বয়ে যাওয়া শীতের শীর্ণ নদীর জল ঝকঝকে স্বচ্ছ। অনেক জায়গায় নদীর তলায় জমে থাকা সাদা বালুর কণাগুলোও দেখা যায়। নদীর এ অংশটার জল এত পরিষ্কার যে মাঝিরা এখান থেকে খাবার জল উঠিয়ে নেয়। মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে। এক-দুদিন পর উপরের অংশের জল অন্য কলসিতে ঢেলে নেয়। সমুদ্রের জোয়ারের জল এখানে এসে মিশে যাওয়ায় জলের স্বাদ কিছুটা নোনতা।

টুকরো টুকরো মেঘ ঘুরে বেড়ায় হালকা নীল আকাশে। সাধারণত এসব মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে না। শান্ত ও শীতল কুহেলিকা ঘেরা একটা দিন। জলের স্তর অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় নৌকা থেকে ওপারে স্থল দেখা যায় না। নদীর তীরটাকে মনে হয় খাড়া উঁচু এক পাহাড়। অথচ ওখানে উঠে দাঁড়ালে দেখা যাবে বিস্তীর্ণ এক সাদা বালুর জগৎ। অন্য তীর ক্রমশ ঢালু হয়ে মিশে আছে নদীর সঙ্গে। গত বর্ষায় প্রবল জলের স্রোত ভেঙেচুরে এটাকে এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। কৃষকেরা একটা রবি শস্য ফলিয়ে নিচ্ছে অনায়াসে। যেখানে ফসল নেই, গরুমহিষ চড়ে বেড়ায় নতুন গজিয়ে উঠা কচি দূর্বাঘাসের খোঁজে। প্রকৃতির এসব নিত্য খেয়ালিপনা দুচোখ ভরে দেখে নেয় দুই বৃদ্ধ। শুকনো বাতাসে ও অনেকক্ষণ কাশির দমক সামলিয়ে আরণ্যের ফুসফুস কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে যেন। লক্ষণ সেনকে জিজ্ঞেস করে, 'একটু কথা বলার চেষ্টা করে দেখব মহারাজ?'

'ধীরে ধীরে আরণ্য।' মাথা দুলিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঠিক আছে মহারাজ।'

'আমারও যে কত কথা জমা হয়ে রয়েছে আরণ্য! কখনো বুঝতে পারিনি যে এত কথা বলার রয়েছে তোমার সঙ্গে।'

'আমারও।'

'জানি না এটার কী কারণ!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে। খুব একটা কাজের কথা মনে পড়েছে এভাবে একটু এগিয়ে এসে লক্ষণ বলে, 'জান আরণ্য, এখন একা একা কথা বলি তোমার সঙ্গে। নৌকা বোঝাই মানুষজন, অথচ চুপচাপ বসে থাকি বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা ভাবে আমি মনে হয় কিছু ভাবছি। আসলে আরণ্য, তোমার সঙ্গে হয়তো কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করছি তখন।'

মনে মনে বলে আরণ্য, 'আমি সেসব শুনতে পাই মহারাজ।'

ঘোলা চোখে স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে থাকে আরণ্য। মনে মনে ভাবে, সেও কী বলবে যে মাঝে মাঝে একই রকম করে নিজেও। ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বলে, 'মহারাজ, আমাদের চিকিৎসাবিদ্যাটা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'হরিকেলের সুফিসাধুর সঙ্গে কথা বলে।'

দীর্ঘ বাক্য বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে আরণ্য। বিষয়টা লক্ষ্য করে লক্ষণ সেন। ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'শুধু চিকিৎসা নয়, অনেক কিছুতে পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বরং আমাদের সমাজে এক স্থবিরতা তৈরি করেছি সবাই মিলে। এ নিয়ে অন্য দিন কথা বলব। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

'হব আর কখনো, মহারাজ?'

'হবে আরণ্য, অবশ্যই হবে।'

'একটা পানীয়ের আদেশ দেবেন আপনার ভৃত্যদের, মহারাজ?'

একটু অবাক হয় লক্ষণ সেন। তাকায় আরণ্যের মুখের দিকে। বুঝতে পেরে একটু হাসার চেষ্টা করে আরণ্য। বলে, 'না মহারাজ, অন্য কিছু না। আপনার বৈদ্যেরা দিচ্ছে না আমাকে বলে মেহ বেড়ে যাবে।'

'কী ওটা?'

'গরম জলে তুলসী পাতার রস। মধু ও সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে।'

'ওটা যদি বিষ হয়, তাও দেব তোমাকে। আমাদের বাঁচা আর মরায় পার্থক্য কী আরণ্য?'

ভৃত্যকে ডেকে বলে দুপাত্র গরম জল, লঙ্কা গুঁড়ো, মধু ও তুলসী পাতার রস মিশিয়ে এক্ষুণি এনে দিতে। আরণ্য জিজ্ঞেস করে, 'দুপাত্র কেন?'

'একপাত্র আমার জন্য।'

হেমন্তের রোদের মতো ঝলকে ওঠে আরণ্যের চোখ। ধীরে ধীরে বলে, 'হাসাবেন না মহারাজ। আমার ছাতি ফেটে যাবে।'

'এক সময় হাসাতে বলেছ। আর এখন না হাসাতে।'

'এটাই জীবন, মহারাজ।'

চমৎকার যে-সব দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকে মানুষেরা, আজ যেন তার একটা। এত সুন্দর আকাশ, ঝিরঝিরে হাওয়া, মিষ্টি রোদ, আকাশে ভেসে বেড়ানো পাখির ঝাঁক, নদীতে মাছের ঘাঁই তোলা, শান্ত জলের উপরিতলে ঝাঁকবাঁধা ছোট ছোট মাছের ঝিলমিল চাটি দেয়া ঢেউয়ের অকস্মাৎ জেগে উঠে আবার মিলিয়ে যাওয়া, গভীর জলে হুঁশ করে শুশুকের ডিগবাজি, অল্প জলের ধারে ধ্যানি ঋষির মতো দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বকের সারি, লাল-পা সারসের দল,

সব মিলিয়ে প্রকৃতির মধুরতম দিনগুলোর একটা বয়ে চলেছে চন্দ্রদ্বীপের এ অংশটায়।

অনেকক্ষণ পর আরণ্য বলে, 'একটা আবেদন মহারাজ।'

'বল আরণ্য, বল। আবেদন নয়, কী করতে হবে বল।'

'নৌকায় আর ভালো লাগছে না। ডাঙ্গায় কটা দিন কাটাতে চাই।'

'নিশ্চয় কাটাবে আরণ্য।'

লক্ষণ তখুনি ডেকে পাঠায় সেনাপতিকে। আদেশ দেয় এখানের মহামাণ্ডলিককে ডেকে পাঠিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব উঁচু ও খোলামেলা জায়গায় অস্থায়ী রাজাবাস নির্মাণের জন্য। সেনাপতি চলে গেলে আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু খাবে আরণ্য?'

মাথা দোলায় আরণ্য।

'সেই তো পথ্য আর পাচন। ওসব না খেয়ে যে কদিন বাঁচা যায় তাই ভালো, মহারাজ।'

'একেবারে মনের কথাটা বলেছ আরণ্য। ভাত মাছ খাবে? ডাল, সবজি...'

মহারাজের দিকে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকে আরণ্য। যেন খুব কৌতুকের একটা কথা বলেছে। বুঝতে পেরে লক্ষণ বলে, 'তামাশা না আরণ্য, সত্যি বলছি।'

চোখে হাসি ফুটিয়ে মাথা দোলায় আরণ্য।

ভৃত্যকে ডেকে রাজপরিবারের পাচকদলকে আসতে বলে। আরণ্যের নৌকার হেঁশেলে মাছ ভাত সব রান্না করতে আদেশ দেয়। পাচকদল প্রমাদ গোনে। 'আজ্ঞে মহারাজ' বলে তাড়াতাড়ি রাজমহিষীর কাছে গিয়ে বিস্তারিত বলে। এদিকে বৈদ্যের দল আগে থেকেই হন্যে হয়ে পড়ে রয়েছে রাজমহিষীর দুয়ারে। কী করবে বুঝতে না পেরে বলে, 'দূরে সরে যাও তোমরা। রাজামশায় হয়তো খেপেছে। একটু পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিষয়টা যে এত সোজা না পাচকদল মহারাজের আদেশ থেকেই টের পেয়েছে। ওরা বলে, 'আজ্ঞে রানিমা, আমাদের শূলে চড়ানোর আদেশটা তাহলে ঠেকানো যাবে না।'

রাগে গজগজ করে রাজমহিষী বলে, 'তাহলে যা খুশি তোমাদের রেঁধে দাওগে। পারলে আমার মাথাটা নিয়ে তোমাদের রাজামশায়কে ঘণ্ট করে দিয়ো। এমনিতেই বৈদ্যদের জ্বালায় সকাল থেকে অস্থির হয়ে রয়েছি, তার উপর তোমরা এসে চেপেছ।'

'ভগবান রক্ষা করুন' বলে পাচকদল কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে উপস্থিত হয় আরণ্যের নৌকায়। লক্ষণ সেনের আদেশ মতো রান্নাবান্না শেষ করে ওদের জন্য খাবার পরিবেশন করে। দুজনে মিলে পেট ভরে, চেটেপুটে খায় সবকিছু। ওদের খাবার পাট শেষ হলে দুসারি আসন পাততে আদেশ দেয় লক্ষণ সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৃত্যেরা সব সাজিয়ে শেষ করলে বৈদ্যের দলটাকে সব পাঁচন পথ্য নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেয়। নৌকায় এসে ওরা বেশ খুশি হয়ে ওঠে। সুখাদ্যের ঘ্রাণ ও খাবারের আসন পাতা দেখে অনুমান করে মহারাজ বোধ হয় খাওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ওদের। জোড় হাতে সামনে এসে দাঁড়ালে পাচকদলকে আদেশ দেয় এক সারি আসনে খাবারের থালা সাজাতে। ওদের খাবার সাজানো শেষ হলে বৈদ্যদের আদেশ দেয় পথ্যপাঁচন অন্য সারিতে সাজিয়ে রাখতে। এবার দুদলকে আদেশ দেয় খেতে বসার জন্য। পাচকদল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মহারাজ কী সত্যিই খেপেছে! কিছুটা ইতস্তত করে বৈদ্যের দল খাবার সারির দিকে এগোলে লক্ষণ বলে, 'না না, তোমরা এদিকটায়।'

রাজাজ্ঞা পালন ভিন্ন তো গতি নেই। লক্ষণের সামনে বসে পাচকদল ঐসব সুখাদ্য খেতে শুরু করে। আর বৈদ্যের দল নাক কুঁচকে পথ্যপাঁচন সামনে নিয়ে বসে থাকে। লক্ষণ সেন জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো, তোমরা খাচ্ছ না যে?' ভয়ে কিছু বলার সাহস পায় না ওরা। ওদের একজন কাঁচুমাচু করে বলে, 'মহারাজ, আমরা তো অসুস্থ নই।' লক্ষণ সেন হেসে বলে, 'তা জানি কিন্তু আমি তো অসুস্থ। ওসব খেয়ে আমার অসুস্থতা কাটছে না যে, তোমরা খেলেই দেখবে দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছি আমি।'

তেতো জলের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করার পর আসন ছেড়ে উঠার অনুমতি দেয় লক্ষণ সেন। ওরা চলে যাওয়ার পর আরণ্য বলে, 'মহারাজ, ক্ষতি হলো আমার। ওরা ভাববে আমার পরামর্শে এসব করিয়েছেন আপনি। ওরা কী আর সুচিকিৎসা করবে আমার?'

'মোটেও ভেব না আরণ্য। প্রয়োজন হলে অবশ্যই তোমার চিকিৎসা হবে। আমার রাজ্যে বৈদ্যের অভাব নেই।'

'তা হয়তো নেই, মহারাজ।'

'তাছাড়া, তোমার চিকিৎসা তো নিজেই করতে পার তুমি। বলেছিলে না একদিন, মনের জোরটাই আসল?'

'আজ্ঞে মহারাজ, ওটা দিয়েই এ পর্যন্ত এসেছি। আর পারছিনে।'

চুপ করে থাকে আরণ্য। বিষয়টা একটু অবাক হওয়ার মতো। সাধারণ খাবার, ভাত মাছ খেয়ে দিব্যি সুস্থ বোধ করে ওরা। বিকেলের দিকে আরণ্য জিজ্ঞেস করে, 'ডাঙ্গায় নামতে পারব একটু মহারাজ?'

'আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই বুঝতে পারছি না।'

'এক কাজ করব মহারাজ, বজরার সামনে এই খোলা জায়গায় একটু হাঁটার চেষ্টা করে দেখব?'

'দাঁড়াও দেখি, ওদের ডাকি।'

ভৃত্যের দল এসে উপস্থিত হলে ওদের ধরে একটু হাঁটাতে আদেশ দেয়। একটু পরে ওদের সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারে ওরা। দুজন সেনাপতি ও

বল্লভকে আসার আদেশ দেয় লক্ষণ সেন। ওরা এলে সে বলে, 'আমাদের দুজনকে একটু ডাঙ্গায় নিয়ে যেতে পারবি বল্লভ?'

একটু চমকে ওঠে বল্লভ। এই শরীরে ডাঙ্গায় নামতে চায় ওরা! লক্ষণ সেনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। ছোট্ট এক শিশু যেন বায়না ধরেছে।

'একেবারে খোকা হয়ে উঠেছ, দুজনেই তোমরা।'

সেনাপতিদের সঙ্গে কিছু একটা পরামর্শ করে সে। তারপর প্রথমে একটা ঘাসি নৌকা ভিড়ায় ওদের বজরার সঙ্গে। ওটা থেকে আবার একটা কোষা নৌকায় চড়িয়ে তীরে উঠায় ওদের। চরের বালু তখনো সূর্যতাপে তেতে রয়েছে। পা থেকে জুতো খুলে ফেলে দুজনে। অনেকক্ষণ বালুতে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লক্ষণ সেন বলে, 'আহ্, কী আরাম যে বল্লভ! জুতো খুলে দেখ।'

একটু হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে দুজনে। পালকিতে উঠিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে আসে ওদের। ওখানে এসে অবাক হয় লক্ষণ সেন। দুপুরে মাত্র আদেশ দিয়েছে রাজাবাস নির্মাণের জন্য। এরই মধ্যে বাঁশের কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে। দূরে দেখা যায় সারি সারি ঘর। ওগুলো সম্ভবত পাহারাদার সৈন্যদের জন্য বানানো হচ্ছে। মাঝখানে বেশ বড় কয়েকটা ঘর। মাঁচা তৈরি করে মাটি থেকে অনেকটা উপরে বাঁশের মেঝে তৈরি করা হয়েছে। এসব দেখে আবার নতুন বায়না ধরে লক্ষণ সেন।

'আজ রাত থেকেই কী এখানে কাটানো শুরু করা যায় বল্লভ?'

'তা কীভাবে সম্ভব দাদুমশায়, চাল উঠাতে হবে না?'

'এক কাজ করলে হয় না, ঐ যে ছোট ঘরগুলো দেখা যায়, তার দু-একটা ছেয়ে নিলে?'

'আগামীকাল আসলে হয় না দাদুমশায়?'

'আগামীকাল তো অন্য একটা দিন বল্লভ। কী নিশ্চয়তা আছে যে ওটা আসবে আমার জীবনে?'

'আচ্ছা দেখি দাদুমশায়' বলে হনহনিয়ে হাঁটা দেয় বল্লভ। চাল ছাওয়ার লোকজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় কয়েকটা ঘরের চালে। লক্ষণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, 'ভাবতেও পারিনি আরণ্য, তোমার ইচ্ছেটা এত সহজে পূরণ হবে।'

আরণ্য বলতে চায়, ওটা ওর ইচ্ছেয় হয়নি, রাজার আদেশে সব সম্ভব হয়েছে। মনে হয়তো ব্যথা পাবে লক্ষণ সেন, তাই চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, 'অনেক কৃতজ্ঞতা, প্রভু।'

সন্ধ্যা নেমে আসে। মশাল জ্বালিয়ে কিছুটা রাত অবধি কাজ করে শ্রমিকেরা। ছোট দুটো দোচালা ঘরে লক্ষণ ও আরণ্যের ঘুমোনোর ব্যবস্থা করেছে বল্লভ। বড় ঘরটার ভেতর রাতের খাবার আয়োজন করেছে। দুজনের কারোই খাওয়ার ইচ্ছে নেই। এবার বৈদ্যদের ডেকে এনে নিজে থেকেই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ্য ও পাঁচন দেয়ার জন্য। সঙ্গে একটু আফিম মিশিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়। অনেক আগে থেকেই ঘুম উধাও হয়ে গেছে লক্ষণের দুচোখ থেকে। ওদের জন্য আনা খাবার এবার বৈদ্যদের খাইয়ে দেয়। খুশি হয়ে নিজেদের নৌকায় ফিরে যায় ওরা।

বনমোরগের ডাকে ভোরের তন্দ্রা ভাঙে লক্ষণ সেনের। প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু মনে পড়ে। তারপর একটু অবাক হয়ে ভাবে, কাল বিকেলে আশপাশে কোনো লোকালয় চোখে পড়েনি। সেনাপতিরাও জানিয়েছিল যে এখানে লোকালয় গড়ে উঠেনি এখনো। একটু খটকায় পড়ে লক্ষণ সেন। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ভাবে বনমোরগের কথা। পাখিরা নাকি রাতে চোখে দেখে না। ভোরের আলোর আভাস আকাশে দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। আর ডেকে ডেকে আগমনী দিনের সংবাদটা জানিয়ে দেয় অন্য সব প্রাণীদের। নাকি প্রকৃতির চলমানতা অব্যাহত রাখার জন্য ডাকতে থাকে বনমুরগিদের নিষিক্ত হওয়ার জন্য। যাকগে, যা খুশি। এখন উঠতে হবে বিছানা ছেড়ে। কিন্তু শরীরে কেমন যেন ব্যথা বোধ করে। মাথা উঁচু করে দেখে আশপাশে কিছু দেখা যায় কিনা। না, এখনো আলো ফোটেনি। শুয়ে শুয়ে বনমোরগের চিৎকার শোনে। আফিমের ঘোরে হয়তো কিছুটা তন্দ্রা এসেছিল আবার। ওটা সরে যাওয়ার পর দিন শুরুর অন্যান্য শব্দ আবার কানে আসতে থাকে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর আভা দেখা দেয়। ভৃত্য ডাকলে দরজা খুলে ঢোকে ওদের একজন। ওকে ধরে বসিয়ে দেয় বিছানায়।

ঐ দিনের শুরু এত ঝকঝকে যে বুড়ো হাড়েও উদ্দীপনা জেগে ওঠে। সকালের খাবারদাবার সেরে আশপাশটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে লক্ষণ সেন। আরণ্য সঙ্গী হতে পারবে কিনা অথবা ওকে সঙ্গে নেয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না সে। বল্লভকে জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়, 'এক কাজ করি দাদুমশায়, সঙ্গে পালকি বেহারা থাকুক। যতক্ষণ হাঁটতে পার হাঁট, ক্লান্ত হলে পালকিতে ঘুরে বেড়াও।'

'কেমন দেখাবে ওটা?'

'কে দেখছে এখানে তোমাদের?'

'আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো কী বলে?'

প্রকৃতির ঐ পরিবর্তন বোধ হয় দুবুড়োকে অনেকটা চাঙা করে তুলেছে। টুকটুক করে হেঁটে বেড়ায় দুজনে। একটু দূরে দূরে থেকে ভৃত্যের দল অনুসরণ করে ওদের। কিছুটা ক্লান্ত হলে নিবিড় ছায়া দেয়া একটা গাছের নিচে বসে ওরা। রোদে শুকনো বাতাস ও নদী থেকে ভেসে আসা শীতলতা মিলে মিশে এমন এক প্রাণ জুড়ানো পরিবেশ, যা সমুদ্রের লোনা হাওয়া থেকেও মনে হয় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। এত ভালো লাগে ওদের যে মনে হয় পুরোনো দিন

ফিরে পেয়েছে আবার। আরণ্যের কাশির দমক কমেছে। বেশ ভালোভাবে কথা বলতে পারে এখন।

গতকাল লক্ষ্য করেনি লক্ষণ যে ঐ জায়গার পেছনে রয়েছে একটা প্রায় গভীর জঙ্গুলে জায়গা। গত রাতে তাহলে ওখান থেকে ডেকেছিল ঐ বনমোরগেরা? মনে মনে ভাবে লক্ষণ, তাহলে তো সন্ধ্যায় শেয়ালের ডাক শুনতে পারার কথা ছিল। এখন আর মনে করতে পারে না। হয়তো ডেকেছিল ওরা, কানেও ঢুকেছিল সেসব, কিন্তু মনে ঢোকেনি। মোরগ যেখানে থাকে শেয়াল সেখানে থাকবেই। প্রকৃতির নিয়ম। হরিণ না জন্মালে বাঘ বেঁচে থাকে কী খেয়ে? প্রজা না থাকলে রাজা হওয়া যায় কীভাবে?

কী সব আবোলতাবোল ভাবছে সে! রাজ্যভাবনাটা কোনোভাবেই আর মাথায় আনা যাবে না। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার শরীর এখন কেমন আরণ্য?'

'অনেক ভালো মহারাজ।'

'মন?'

'মনও ভালো।'

'দুটোই, বাহ্।'

'মানুষের শরীর না থাকলে মনের অস্তিত্ব কী আছে মহারাজ?'

'শরীর দৃশ্যমান কিন্তু মন তো অদৃশ্য। ওখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না?'

'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দৃশ্যমান, ঈশ্বর তো অদৃশ্য।'

একটু ভাবে লক্ষণ সেন। আবার জিজ্ঞেস করে, 'মানুষের জন্য একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন কেন, বল তো আরণ্য?'

'জানি না মহারাজ।'

'ভেবে বল।'

'বিপদে না পড়লে বোঝা যায় না মানুষের জন্য একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রয়েছে কেন। ঈশ্বর ছাড়া একজন অসহায় মানুষের মন আরো অসহায় হয়ে পড়ে। ঈশ্বর কাজে আসে একজন অসহায় মানুষের মনে শক্তি জোগাতে।'

'শুধু কী তাই?'

'হয়তো আরো কিছু আছে। তবে প্রত্যেকেরই ঈশ্বরকে ভাবা উচিত তার নিজের মনের মতো করে।'

'কেন আরণ্য?'

'এই স্বাধীনতাটুকু থাকা উচিত। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল মহারাজ। হরিকেলের সুফিসাধুর সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল আমার। এটা বলেছেন ঈশ্বর, ওটা বলেছেন তিনি, এটা করতে নিষেধ করেছেন, আমি ঈশ্বরের হয়ে বলছি, আমি ঈশ্বরের অমুক-তমুক, এসব বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়সঙ্গত না। এটা একান্তই আমার বিবেচনা। আমি বলি না যে আপনিও এমন ভাবুন, তাহলে তো ঐ মহামানবদের সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য থাকে না। আপনার ঈশ্বর কেমন হবে তা আপনাকেই ভেবে দেখতে হবে মহারাজ।'

'আমার কোনো ঈশ্বর নেই।'

'পরাজিত হওয়ার পর এটা বুঝলেন?'

'না হলে আমার এত প্রার্থনা, এত ঈশ্বরপূজার পুরস্কার কী আজকের এই অবস্থা?'

'না, ঈশ্বর পূজা বা না পূজার পরিণাম এটা না মহারাজ। এটা ঘটনা-পরম্পরা, এখানে মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। বিষয়গুলোকে এর চেয়ে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা আপনার ছিল না, অপরাধ নেবেন না মহারাজ, ফলে এসব আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আপনার সদিচ্ছার তো কোনো অভাব ছিল না।'

কিছু যেন বলতে চায় লক্ষণ সেন কিন্তু মুখে কথা উঠে আসে না। চুপ করে থাকে। আবার বলে আরণ্য, 'মহারাজ, শুরুতে সব ধর্মই নিপীড়িত মানুষের কাছে আশা ও শেষ ভরসা হিসেবে দেখা দেয়। এসব নিয়েও আসে নিপীড়িত গোষ্ঠীর মানুষেরা। পরে এসবই আবার মোল্লাপুরোহিতদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে ওঠে। শাসকেরা এই পুরোহিতগোষ্ঠীকে শোষণের সামান্য ভাগ দিয়ে নিজেরা দুহাতে লুটপাট করে খায়। সমাজ ও প্রগতির জন্য প্রতি সমাজেই এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেসব সমাজ এ বাধা অতিক্রম করে আসতে পেরেছে ওরাই এগিয়ে গেছে। সবার আগে এই বাধা পেরিয়ে আসতে পেরেছে ইয়োরোপীয় সমাজ। ফলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে অন্যদের অনেক পেছনে ফেলে। গূঢ় কোনো তত্ত্ব নয় এটা। জলের মতো সোজা। কিন্তু এর প্রয়োগটা হচ্ছে কঠিন।'

বিষণ্নতার ভেতর ডুবে যায় লক্ষণ সেন। বছরের এমন চমৎকার দিনগুলোকে নষ্ট হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়া যায় না। বলে, 'বলেছিলাম না আরণ্য, রাজ্যের বিষয়ে কোনো কথা উঠালেই থামিয়ে দিয়ো।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

আর কিছু বলে না আরণ্য। লক্ষণও চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে, 'একটা কবিতা শোনাও আরণ্য।'

'জীবনে আর কোনো কবিতা নেই, মহারাজ।'

অবাক হয় লক্ষণ। এমন এক রোগ কবিতা যা কখনো মানুষকে ছেড়ে যায় না। বলে, 'বল দেখি আরণ্য, তোমার মন এখন কোথায়?'

'মন দেহনির্ভর, মহারাজ।

দেহ সরিসঅ তিত্থ মই সুহঅ ণ দীট্ঠঅ।

শরীরের মতো এমন কোনো তীর্থ কি কোথাও দেখেছেন, মহারাজ?'

'না আরণ্য। এক কাজ করি, চল কোনো তীর্থে ঘুরে আসি।'

'মহারাজ, একটা দোহার কিছুটা অংশ শোনাই?'

'শোনাও আরণ্য।'

কিন্তহ্ দীবেঁ কিন্তহ্ নিবেজ্জে
কিন্তহ্ কিজুঁই মন্তহ সেঘঁ
কিন্তহ্ তিত্থ তপোবনে জাই
মোকখ কি লবভই পাণী হ্ণাই।

(কী হবে দীপ জ্বালিয়ে, আর নৈবদ্যে, মন্ত্রের সাধনাই বা কী কাজে আসবে, তীর্থ তপোবনে গিয়ে, আর পুণ্যস্নান করে কী মোক্ষ লাভ হবে!)

আবার বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরের খাবার সময় হয়েছে আরণ্য?'

'খাওয়ার পর হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, মহারাজ।'

'তাই তো, দেখো দেখি, কী লজ্জার কথা!'

'না মহারাজ। আমিও ভুলে যাই আজকাল।'

তেমন আর কোনো কথা হয় না সেদিন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য শরীর ও মন ভরে শুষে নেয় দুজনে। হঠাৎ এক টুকরো মেঘ নিচে নেমে এসে নদীর ওপারের ফসল ক্ষেত ছুঁয়ে আবার উপরে উঠে যায়। মাঝে মাঝে ধূসর ছায়ার একটা স্রোত বয়ে যায় চরাচরের উপর দিয়ে। প্রকৃতির আনুকূল্য পেয়ে লক্ষণের শরীর সত্যিই সুস্থ হয়ে ওঠে। বৈদ্যদের অত্যাচার না থাকায় খেতে পারছে পেট ভরে। যখনই সুযোগ পায়, আরণ্যের সঙ্গে কিছু সময় কাটায়। মাধব ও কেশবের হাতে রাজ্যের প্রায় পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, নামেই শুধু রাজা এখন লক্ষণ সেন। মনে মনে যতই প্রতিজ্ঞা করুক যে রাজ্য সংক্রান্ত কোনো কথা বলবে না আর আরণ্যের সঙ্গে কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য শাসনের বিষয়গুলোই উঠে আসে। নির্জন এক চরের বালুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আরণ্যেকে জিজ্ঞেস করে, 'মনে করতে পার আরণ্য, জীবনে কতগুলো যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাকে?'

'এসব বিষয়ে কথা না বলার আদেশ দিয়েছিলেন মহারাজ।'

'ওটা স্থগিত রইল এখন, আরণ্য।' হাসতে হাসতে বলে লক্ষণ সেন।

'আসলে যুদ্ধগুলো ছিল আপনার সাফল্যের ইতিহাস। সেজন্য ঘুরে ফিরে ওগুলো মনে উঠে আসে আপনার।'

'হয়তো তাই আরণ্য।'

'প্রতিটা যুদ্ধজয় কী দিয়েছে আপনাকে মহারাজ, সাফল্যের উল্লাস ছাড়া?'

'শুধু কী তাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেবে দেখুন মহারাজ।' একটু পর আবার বলে, 'কখনো কী ভেবে দেখেছেন ওই উল্লাসটুকুর জন্য কত প্রাণ বলি দিতে হয়েছে?'

'তার চেয়ে বরং কোনো একটা যুদ্ধে আমার মৃত্যু হওয়া ভালো ছিল।'

'তাহলে কী যুদ্ধ থেমে থাকত?' জিজ্ঞেস করে আরণ্য। একটু ভাবে লক্ষণ সেন। আবার বলে আরণ্য, 'মৃত্যু কখন আসবে তা কেউ জানে না মহারাজ। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও একটা জয়োল্লাস পাওনা থাকতে পারে আপনার। প্রাপ্তি লিপ্সাটা যদি ত্যাগ করেন এক্ষুনি তাহলে আর করণীয় কী থাকবে আপনার।'

'পরলোকের অপেক্ষা করতে পারি।'

'পরলোকে দেবতাদের সঙ্গে অমৃতসুধা পান রাজাদের জন্য দেবতারা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ওটা অবশ্য আপনি ভাবতেই পারেন। প্রজাদের ভাবনা তো আর ওরকম হবে না। আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা জানালাম মহারাজ।'

'খুব বেশি ভিন্ন আর কী?'

'প্রজাদের জন্য দেবরাজ্যে অমৃতসুধা পানের বিষয়টা নেই। দেবতারা কখনো প্রজাগোত্রের না। পুরীষ পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে কঠিন পাথর ভাঙার মতো কায়িক পরিশ্রমের কাজ করেছে এমন কোনো দেবতা আছে মহারাজ?'

'দেবতাদের কল্পনা তো মানুষেরাই করেছে, নাকি?'

'অজ্ঞতা ও ভীতি থেকে মানুষ বাধ্য হয়ে ঈশ্বর-কল্পনা বা আবিষ্কার করেছে। কোনো রাজা কী চেষ্টা করেছে প্রজাদের ভীতি থেকে রক্ষা করতে, অজ্ঞতা দূর করতে, বরং ভয় দেখিয়ে এবং জ্ঞানের ধারে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে রাজ্য শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছে।'

'তুমি শুধু এক কবিই নও আরণ্য, গভীর দর্শনের একটা বিষয়ও রয়েছে তোমার ভেতর।'

'না মহারাজ, সামান্য এক চারণকবি আমি, আর কতবার বলব!'

'কবিরা নাকি কিছুটা বেশি দূরে দেখতে পায়। যাহোক, বল।'

'জীবনের অতি সামান্য এই অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুমান করি আজকে যারা সম্পত্তি রক্ষার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করছে, ভবিষ্যতে এরাই দেখবেন ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে দরিদ্র জনগণ, যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করছে বা করছে না, তাদের সবার উপর শোষণ পীড়ন নির্যাতন অব্যাহত রাখবে। ওরাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে সমাজে। এ পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জয়ের কোনো ইতিহাস নেই মহারাজ। পৃথিবীতে দুটো মাত্র শ্রেণি। শোষক ও শোষিত। এর অবসান হবে না কোনোদিন, দিন ও রাত যতদিন থাকবে। ধর্ম গোত্র দেশ জাতি সবই ওই দুটো শ্রেণির মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য।'

'বড় ভাবনায় ফেললে আরণ্য। এ অবস্থা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই? ভালো মানুষের কাছে সুযোগগুলো কী কখনোই আসবে না?'

'ভালো মানুষেরা সবসময়ই মন্দ মানুষের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়, এটাই পৃথিবীর নিয়ম, মহারাজ।'

'তাহলে তো আমিও মন্দ মানুষের দলে আরণ্য?'

'এটা বলার স্পর্ধা আমার নেই প্রভু। পৃথিবীতে খুব কম রাজা আছে যাদের ইতিহাস কালো কালিতে লেখা। প্রায় সবারই ইতিহাস লেখা হয় বা লেখানো হয় সোনার হরফে।'

'বিষয়টা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেল আরণ্য।'

'মহারাজ, মানুষ অনেক পরে বুঝে যে কোনোকিছু পুরোপুরি বুঝতে নেই।'

'এসব কথা আগে কখনো বলোনি কেন আরণ্য?'

'তাহলে আপনার ঐ হাতটা রাখার জন্য আরণ্যের কাঁধটা কি থাকত, মহারাজ?'

সন্ধ্যা না হতে ঘরে ফিরে আসে ওরা। বেশ ক্লান্তি বোধ করছে দুজনে। অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। নদীর একটা খোলা জায়গায় অল্প জল দুপুরের রোদে তেতে গরম হয়ে ছিল। উষ্ণ প্রস্রবণের মতো অনেকটা। দুজনে মিলে স্নান করে ওখানে। বেশ হালকা লাগছে। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। যে শেয়ালগুলোর ডাক প্রথম রাতে শোনেনি বা শুনলেও মনে করতে পারেনি, তা যেন আজ খুব বেশি করে শুনছে। মনে মনে ভাবে শেয়ালগুলো এত ডাকাডাকি করছে কেন আজ? ওদের কী কোনো উৎসব আছে? প্রাণীকুলে মানুষ ছাড়া অন্য কারো কী কোনো উৎসব আছে? মনে করে আদিম মানুষদের ফসল উৎসব, শিকার উৎসবের বর্ণনা, যার মধ্যে উলুধ্বনি ছিল একটা, মানুষের মধ্যে এখনো রয়ে গেছে ওটা। প্রকৃতি জগতে এক মাত্র মানুষেরই বিবর্তন ঘটেছে। যতটা বুদ্ধি নিয়ে একটা শেয়াল জন্মায়, মরার সময় নিশ্চয় প্রায় ততটুকুই থাকে। কিন্তু একজন মানুষ পূর্ণ বয়সে মরার সময় অনেক প্রাজ্ঞ হয়ে মরে। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে লক্ষণ সেন।

পরদিন সকালে আরণ্যকে দেখে একটু ভাবনায় পড়ে লক্ষণ। চোখের কোল ফোলা, শরীর জুড়ে বার্ধক্যের চিহ্ন। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করে, 'শরীর ভালো তো আরণ্য?'

'আজ্ঞে মহারাজ।' একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলতে গেলে নিচের ঠোঁটটা বুড়ো ঘোড়ার ঠোঁটের মতো ঝুলে পড়ে।

'থাক আরণ্য। আজ আর বকবক করতে হবে না। চল কোথাও গিয়ে বসি।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোদের আঁচে কিছুটা প্রাণ ফিরে পায় আরণ্য। রাতে মনে হয় খুব কষ্ট হয় ওর। কাশির দমকে নাকি ঘুমাতেই পারে না। জিজ্ঞেস করে ওকে, 'রোদে পিঠ পেতে একটু ঘুমোবে আরণ্য?'

'ঠিক আছে মহারাজ।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যদের আদেশ দেয় চাটাই ও বিছানা পেতে দিতে। শোয়ার পর সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে আরণ্য। পাশে বসে থাকে লক্ষণ সেন। ঘণ্টাখানেক হবে হয়তো। চোখ মেলে বুঝতে চেষ্টা করে সে কোথায় আছে। তারপর উঠে বসে।

'কী অন্যায় মহারাজ। এ বয়সে বেঁচে আছি কেন তাও বুঝি না।'

'কী বলছ আরণ্য। এসব চিন্তা মাথায়ও এনো না। খাবে কিছু?'

'গরম জলে তুলসী পাতার ঐ রসটা খুব কাজে লাগে আমার।'

'এক্ষুণি পাবে, আর কিছু?'

'না মহারাজ।' একটু ভেবে আবার বলে, 'আরেকটা খুব উত্তেজক পানীয়ের কথা মনে পড়েছে। এক তিব্বতি ভিক্ষু কিছু শুকনো পাতার গুঁড়ো দিয়েছিল আমাকে, গরম জলে ভিজিয়ে পান করার জন্য। শরীরের মেজমেজ ভাবটা একেবারে কেটে যেত।'

'পাতাটার নাম কী বল।'

'উঁ হুঁ, নাম তো মনে আসছে না মহারাজ। আর সেসব জোগাড় করাও এখন সম্ভব না। এমনিই বললাম।'

'সেই তো, আমাদের সেসব দিন কী আর আছে আরণ্য!'

'জানি না মহারাজ।'

'ওসব থাক, মজার কিছু বল। মনে আছে একদিন তুর্কিদের জাদুটাদু নিয়ে কী যেন বলছিলে, শেষ করতে পারনি?'

একটু সময় চুপ করে থাকে আরণ্য। বলে, 'তুর্কি জাদু, মনে করতে পারছি না তো।'

'বলেছিলে না, কী সব বাঁদরনাচ, তুর্কিনাচ।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে মহারাজ। তুর্কিদের টেনে আনলে সেই তো আবার রাজ্যটাজ্য এসে যাবে।'

'ওদের নাচটাচ নিয়ে বল নাহয়।'

'বাঁদরনাচ আর তুর্কিনাচে পার্থক্য কী মহারাজ?'

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় হেসে ওঠে লক্ষণ সেন।

'ঠিক আছে, বলছি মহারাজ।'

'বল আরণ্য।'

'খেয়াল রাখবেন, আমি যেন হেসে না উঠি, দম সামলাতে পারব না তাহলে।'

'এ বয়সে আর হাসি কান্না, যাকগে বল।'

'গট্টীদ্বারে থাকতে তুর্কিদের জাদুখেলা ও হাত সাফাইয়ের এত গল্প শুনেছি যে ইচ্ছে হয়েছিল কিছু দেখি ওদের। সাধারণত হাটবাজারে এসব দেখায় ওরা। সবজি বিক্রেতা সেজে এক দিন গেলাম এক হাটে।'

'এটুকু বলার পর নিশ্বাস নেয়ার জন্য থামে আরণ্য। সত্যিই খুব বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছে সে। লক্ষণ বলে, 'থাক না হয়।'

'অসুবিধে নেই মহারাজ। ওদের তলোয়ারবাজিটা বলি প্রথমে। বাঁদর নাচ আর তুর্কি নাচ বলে যত হাসাহাসি করি না কেন ওদের তলোয়ারের ধারে কাছে ঘেঁষা সত্যি অসম্ভব। বৃষ্টি-তলোয়ার খেলা দেখানোর জন্য ঘোষণা দিয়ে দর্শক আকর্ষণ করছিল ওরা। একটা তাঁবু খাটিয়ে এক তলোয়ারবাজ অপেক্ষায় ছিল বৃষ্টির জন্য। যেই বৃষ্টি নামে, অমনি দুহাতে দুটো তলোয়ার নিয়ে বৃষ্টিতে নেমে পড়ে সে। এমনভাবে ওগুলো শরীরের চারপাশে ঘোরাতে থাকে ও নাচতে থাকে সে যে এক ফোঁটা জলও ওর শরীর স্পর্শ করতে পারেনি। কিছুক্ষণ পর তাঁবুতে যখন ফিরে আসে সে, সবাই দেখে একেবারে শুকনো খটখটে ওর কাপড়চোপড়।'

একটু ভেবে বলে লক্ষণ সেন, 'তুর্কি সৈন্যদের সঙ্গে তলোয়ার চালিয়ে আমাদের যোদ্ধারা কুলিয়ে উঠবে কীভাবে তাহলে!'

'যোদ্ধাদের কথা বাদই রাখুন মহারাজ। এরা সাধারণ খেলোয়াড়। তারপর হাত সাফাইয়ের খেলার বিষয়টা শুনবেন?'

'শোনাও।'

আবার একটু জিরিয়ে নেয় আরণ্য। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তারপর ধীরে ধীরে বলা শুরু করে, 'টিঙটিঙে এক লোক হাত সাফাইয়ের কী এক খেলা যে দেখাল মহারাজ! একটা বলি, সাদা একটা কড়ি হাতে নিয়ে সে দর্শকদের বলে: দেখ, এটাকে দশটা বানাতে পারি আমি। তোমাদের মধ্যে যারা গরিব, তাদের সবার একটা কড়িকে দশটা কড়ি বানিয়ে দিতে পারি। যে-কোনো একজন আস। অনেকেই আসতে চায়। ওদের মধ্য থেকে বেছে মুণ্ডিতমস্তক ছেলে-বয়সী একজনকে বেছে নেয় সে। হাতের কড়িটা দেখিয়ে বলে: এই দেখ একটা কড়ি আমার হাতে, দেখ কীভাবে দশটা হয়। ছেলেটার পরিষ্কার কামানো মাথা নুইয়ে ধরে বলে, আছে কিছু এখানে? সবাই বলে, না। তখন হাতের কড়িটা দেখিয়ে খপ করে উপুর করে ধরে ওটা ওর মাথায়। তারপর খালি হাত দেখিয়ে বলে, এখন ওটা ওর মাথার ভেতর ঢুকে গেছে। একটু পড়েই দশটা হয়ে বেরোবে। সবাই খুব উৎসুক হয়ে ওঠে। তারপর ওর ডান কান ধরে কাত করে মাথা ঝাঁকিয়ে পাঁচটা কড়ি ফেলে মাটিতে। ছেলেটাকে কুড়িয়ে নিতে বলে, জিজ্ঞেস করে, আসল কড়ি তো এগুলো? ছেলেটা সায় দিলে আবার বাম কান ঝাঁকিয়ে পাঁচটা কড়ি মাটিতে ফেলে। খুব অবাক হয় সবাই। সবশেষে বলে যারা খেলাটা দেখে খুশি হয়েছে আর এক কড়িকে দশ কড়ি বানাতে চায়, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকসোটায় একটা করে কড়ি যেন ফেলে যায়। এখন যদি কারো কাছে না থাকে আগামী হাট বারে এসেও দিতে পারে। এবং সত্যি সত্যি পরের হাট বারে অনেকে ওর বাকসে কড়ি ফেলে যায়।'

'মজার খেলা তো!'

'মাত্র একটা বললাম, এরকম শত শত খেলা জানে ওরা। দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।'

'আরেকটা বলবে?'

'গরম জলের ওই পানীয়টা আরেকবার পাব মহারাজ?'

'অবশ্যই পাবে।'

পানীয়ের সঙ্গে কিছু তাজা ফলমূল পরিবেশন করে ভৃত্যেরা। ওসব খেয়ে অনেক চাঙা হয়ে ওঠে ওরা। লক্ষণ সেন বলে, 'এবেলা আর কিছু বলবে আরণ্য?'

'বলি মহারাজ, ওবেলার ভরসা কী?'

'এভাবে বলে না আরণ্য। যাহোক, বল।'

'এ গল্পটা একটু বিটকেলে, বলব কিনা ভাবছি।'

'এ বয়সে আর লজ্জার কী আছে আরণ্য?'

'তাও ঠিক।' একটু দম নেয় আরণ্য। তারপর বলে, 'দিনের শেষ খেলা ছিল ওটা। বড়দের জন্য। ছোটদের সব তাঁবুর বাইরে বের করে দেয়। তারপর আধবুড়ো এক জাদুকর মঞ্চে উঠে বলে, এই জাদুটা একটু লজ্জা পাওয়ার। যাদের লজ্জা বেশি তারা উঠে যেতে পারে। কেউ উঠে যায় না দেখে বলে সে, ঠিক আছে দেখুন, এখানে তো সবাই পুরুষ মানুষ। তারপর একটু হাসিহাসি মুখ নিয়ে বলে সবারই ওটা আছে। কিন্তু ঠিক মতো কাজ করে না। একটু নড়ে চড়ে বসে অনেকে। তারপর বলে, আমি একটা অষুধ বিক্রি করি। কাচের একটা বড় বয়েম দেখিয়ে বলে, এটাতে একটা ওষুধ আছে, যা খেলে শক্তি বাড়ে।'

লোকজনের মধ্যে কৌতূহল দেখা দেয়। একটু দেখবেন খেয়ে? সবাই আগ্রহ প্রকাশ করলে সে আবার বলে, বিষয়টা কী, মনে হয় সবারটা কম কাজ করে? বয়েম থেকে একটা বাটিতে কিছুটা ওষুধ নিয়ে একটা কাঠি দিয়ে অনেকের হাতের তালুতে দেয়। চেটে খায় সবাই।

'তুমি নিয়েছিলে আরণ্য?'

'সত্যি বলতে কী, নিয়েছিলাম মহারাজ।'

'খেতে কেমন?'

'মধুর চাক ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে জিভে দিলে যেমন ঝাঁজালো লাগে, তার চেয়েও বেশি ঝাঁজালো ও মিষ্টি।'

'যাহোক, তারপর বল।'

'তারপর বলে, এই ওষুধটা কীভাবে কাজ করে বুঝবেন কেমন করে? একটু ভাবনায় পড়ে সবাই। লোকটা বলে আমি একটা জাদু জানি। যারা দুকড়ি দিয়ে এ ওষুধ কিনবেন, তাদের জন্য জাদুটা দেখাব। না কিনলেও অসুবিধে নেই, হাতে হাতে ফল পাবেন, এবার জাদুটা দেখাই। জাদু দিয়ে আপনাদের ওটা সামান্য বড় করে দিতে পারি, শক্তিশালী করে দিতে পারি, আবার নাই করে দিতে পারি। এই যে দেখেন একটা খালি হাঁড়ি, ঢাকনা খুলে দেখায় সে। আর এই দেখুন একটা বালুঘড়ি। এই বালুগুলো নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত আপনাদের ওগুলো নাই করে দেব আমি। যারা দুকড়ি এই হাড়িতে ফেলবেন তারা আবার ফিরে পাবেন ওটা। না দিলে... ওটা আপনাদের বিষয়। মানুষগুলো ভালোভাবে বুঝে উঠার আগেই বালুঘড়িটা উল্টে দেয় সে। বলে, আপনাদের সব ইয়ে এখন এই হাঁড়িটার ভেতর। বিশ্বাস হচ্ছে না? ওখানটায় হাত দিয়ে দেখুন, আছে কিনা। ভয়ে কেউ হাত নাড়াতে পারে না। সবাই একেবারে বোবা হয়ে গেছে। ওখানে উপস্থিত না থাকলে বোঝানো কষ্টকর পরিস্থিতিটা কেমন ছিল। তারপর পেছনের একটা লোককে ডেকে বলে, এই যে ভাই, সামনে আসেন, আপনার উপর জাদু দেই নাই। আপনারটা সঙ্গেই আছে। তারপর হাঁড়িটাকে উপরে তুলে ধরতে বলে। দুহাতে চেষ্টা করে একটুও নড়াতে পারে না সে। তারপর সামনের আরেকজনকে ডেকে বলে, আপনিও আসেন, আপনার উপরও জাদু নাই। দুজনে মিলেও হাঁড়িটা উপরে ওঠাতে পারে না। মিটিমিটি হেসে বলে লোকটা, আপনাদের ওগুলো এত ভারি কেন ভাই? সবাই তখন বালুঘড়িটার দিকে দেখে। খুব সামান্যই নিচে পড়েছে। ভয়ে ওদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কথাবার্তাও বন্ধ। একটু পরে ঐ জাদুকর বলে, ঠিক আছে ভাইয়েরা, আপনাদেরকে বেশিক্ষণ আতঙ্কের ভেতর রেখে আমার কোনো লাভ নাই। তাঁবুর ভেতরে ঢোকার সময় যে যেদিক দিয়ে পারেন, ঢুকেছেন। যাওয়ার সময় এই হাঁড়িটার ভেতর দুটো কড়ি ফেলে যার যারটা নিয়ে বেরিয়ে যাবেন সবাই। দেখবেন আবার নিজেরটা ছেড়ে বড়টার দিকে হাত বাড়াবেন না। এবার একটু ঢোক গেলার অবসর পায় মানুষগুলো। মাথাটা একটু চুলকে ঐ জাদুকর আবার বলে, থাক, বাছাবাছির ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই, যার যারটা আমিই ফেরত দিয়ে দেব। তবে না বলা পর্যন্ত ওখানে হাত দিয়ে দেখতে যাবেন না কেউ। কড়ি ফেলে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সবাই। দুটো করে কড়ি ফেলে দর্শকেরা বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে আগের লোক দুটোকে বলে বড় হাঁড়িটা বাইরে নিয়ে উল্টে দিতে। সবাই দেখে অনেক কড়ি বেরিয়ে এসেছে, ইয়ে-টিয়ে কিছু নেই ওখানে। যে হাঁড়িটাতে কড়ি ফেলেছিল ওটা শূন্য। খেলা শেষে জাদুকর বলে, আপনাদের সবার ওটা ফিরে পেয়েছেন ভাইয়েরা। এবার বাড়ি ফিরে ওগুলো হাতিয়ে দেখুন গিয়ে। চোখে কৌতুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি ফুটিয়ে বলে, খবরদার, এখানে কেউ হাতাহাতির চেষ্টা করবেন না, তাহলে আবার নাই। সবাই তখন দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল লক্ষণ সেন। এবার আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। অনেক চেষ্টা করে হাসি আটকে রাখে আরণ্য। বলে, 'মহারাজ, আমাকে না হাসানোর কথা ছিল?'

হাসিতে আরো ফেটে পড়ে লক্ষণ সেন। বলে, 'আমি হাসাচ্ছি তোমাকে, না তুমি আমাকে?'

হাসির গমক থামলে বলে, 'এবার বাড়ি যাও আরণ্য। ঐ জাদুকরের পরামর্শটা তুমিও মনে রেখ।'

যাওয়ার সময় বলে আরণ্য, 'মহারাজ একটু ভেবে দেখবেন, বোকা সোকা এই মানুষগুলো কোনদিকে যাবে, আমাদের, না ওদের?'

'মাঝে মাঝে তুমি এত আঁটো করে কথা বল আরণ্য!'

আঁটো না হলে কোনোকিছুতেই মজা নেই, মহারাজ!

হো হো করে আবার হেসে ওঠে লক্ষণ সেন। প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরে সে। আরণ্যের প্রশ্নটা মাথার ভেতর রাখতেও চায় না। যাক ওরা, যার যে-দিকে খুশি। ক্ষুধা পেয়েছে বেশ। এখানকার প্রকৃতিই যেন মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়। দুপুরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে সে। কিছুটা আলসেমি পেয়েছে। তন্দ্রার ঘোর এসেছে সামান্য। বিছানায় গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। চোখ মেলে দেখে বল্লভ বসে আছে একটা আসনে। মুখে যেন কালো ছায়া জড়িয়ে রয়েছে। মনের ভেতর একটা সন্দেহ ঝলকে ওঠে। বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, 'সব ঠিক আছে তো বল্লভ?'

'আজ্ঞে দাদুমশায়, একটু বেরোতে পারবেন এবেলা?'

'কী হয়েছে?'

'আরণ্য দাদুর শরীরটা ভালো না।'

'যাচ্ছি এক্ষুণি, বৈদ্যদের ডাক।'

'ওদের পাঠানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমাকে নেয়ার ব্যবস্থা কর। মনে হয় না হাঁটতে পারব এখন।'

'পালকি-বেহারা দরজায় দাঁড়ানো দাদুমশায়।'

'ঠিক আছে, চল।'

'মুখে একটু জল দিয়ে নিন দাদুমশায়।'

'তাড়াতাড়ি দে তাহলে।'

আরণ্যের ঘরে পৌঁছে বিশ্বাস হয় না লক্ষণ সেনের যে বিছানায় যাকে প্রায়মৃত দেখছে সে আরণ্য! এই এক প্রহর আগেও যে ছিল হাসিতে উচ্ছল, এত দ্রুত পাল্টে যায় কী করে সে! টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, মুখের একটা দিক

বেঁকে গেছে, গাজলা বেরোচ্ছে, কোনো ওষুধ মুখে দেয়া যাচ্ছে না। 'হায় ভগবান, কী করি এখন?' ভাবে লক্ষণ সেন। বৈদ্যের দলকে সারাক্ষণ আরণ্যের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়ে ঘরে ফিরে আসে। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। দুদিন প্রায় অচেতন থাকার পর কিছুটা জীবন ফিরে পেতে শুরু করে আরণ্য। লক্ষণ সেন পাশে বসলে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে সে। শরীরের ডান দিক অবশ হয়ে পড়েছে। মুখেরও ঐ দিকটা অবশ হয়ে পড়ায় কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর লক্ষণ বুঝতে পারে সে হয়তো পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্রী সংগীতার কথা বলছে। জিজ্ঞেস করায় চোখ-ইশারা করে জানায় 'হ্যাঁ।'

ভাবনায় পড়ে লক্ষণ সেন। প্রদ্যুম্ন এখন হরিকেলের দক্ষিণ দ্বীপের মহামাণ্ডলিক। আরণ্যকে এ অবস্থায় ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ওখানে খবর পাঠিয়ে ওদের নিয়ে ফিরে আসতে চার পাঁচ দিন লেগে যাবে। বৈদ্যদের কাছে জানতে চায় ওর অবস্থা কী। ওরা সবাই বলে, যে-কোনো মুহূর্তে ওর অন্তিমনিশ্বাস-বায়ু বেরিয়ে যেতে পারে। সেনাপতিকে ডেকে লক্ষণ আদেশ দেয় সবচেয়ে দ্রুতগামী বাইচের কয়েকটা নৌকা পাঠিয়ে প্রদ্যুম্ন ও সংগীতাকে নিয়ে আসার জন্য। বৈদ্যদের অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রমে কিছুটা সেরে ওঠে আরণ্য। দু-একটা শব্দ বোঝাতে পারে লক্ষণ সেনকে। ওর শেষ ইচ্ছে খড়মপুরের যে শ্মশানঘাটে প্রভাবতীকে দাহ করা হয়েছিল সেখানে যেন ওকেও দাহ করা হয়। প্রদ্যুম্ন ও সংগীতাকে একটিবার দেখানো হয়।

অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝতে পারে লক্ষণ সেন যে এখানে যদি মারা যায় আরণ্য তাহলে শবদেহ ঐ পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছানো যাবে না। দ্রুততম নৌকায়ও ওখানটা কয়েক দিনের পথ। ভালো হয় যদি ওকে নিয়ে এখনই যাত্রা শুরু করা যায়। কিন্তু এটা কী আরণ্যকে বলা সম্ভব?

একটু ইতস্তত লক্ষণ জিজ্ঞেস করে, 'খড়মপুর যাবে আরণ্য?'

সে ঘাড় কাত করায় সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ সেন আদেশ দেয় যাত্রার আয়োজন করার জন্য। পরদিন যাত্রা শুরু করে ওরা। এদিকে প্রদ্যুম্নও সম্ভবত যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। নদীপথে ওদের পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় আরেক দুশ্চিন্তায় পড়ে লক্ষণ সেন। নৌসেনাপতিকে আদেশ দেয় জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটা দিকে নৌকার সন্ধান যেন করে ওরা। একদিন পর প্রদ্যুম্নদের নৌকা পেয়ে যায় ওরা। লক্ষণ সেনের কাছে খবর পৌঁছা মাত্র কাছাকাছি কোনো সামন্তরাজার কাছে খবর পাঠাতে বলে। ওর ইচ্ছে ডাঙ্গায় উঠে যায়। দক্ষিণ চন্দ্রদ্বীপের মাণ্ডলিক অর্জুন সেন খবর পেয়ে নিজেই ছুটে আসে। ওদের আতিথ্য গ্রহণ করে লক্ষণ সেন।

দুপুরে দেখা হয় আরণ্য ও প্রদ্যুম্নদের। অনেকটা ভালো দেখায় এখন আরণ্যকে। সংগীতাকে দেখে চমকে ওঠে আরণ্য। বিষয়টা বুঝতে পারে লক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন। একেবারে একই রকম, প্রভাবতী! এত মিল হয় কীভাবে মানুষের! ইশারায় জানায় সংগীতার হাতটা ওর বুকে রাখতে। অনেক কষ্টে আরণ্য উচ্চারণ করে প্রভা। চোখের জল ধরে রাখতে পারে না সংগীতা। আরণ্যের বুকে মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে থাকে। লক্ষণ সেনের হাতটা চেয়ে সংগীতার হাত তুলে দেয় ওর হাতে। লক্ষণ সেন বুঝে নেয় কী বলতে চায় আরণ্য। প্রভাবতীর মৃত্যুর পর প্রদ্যুম্নকেও লক্ষণ সেনের হাতে তুলে দিয়েছিল আরণ্য।

ঐ রাতে আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় আরণ্যের। ভোরের আলো ফোটার আগেই আরণ্যের জীবনবাতি নিভে যায়। খড়মপুর এখনো দুদিনের পথ। প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞেস করে সে জানে কিনা প্রভাবতীকে কোন শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। 'হ্যাঁ' বলায় প্রদ্যুম্নকে আবার ঐ ছিপ নৌকাগুলো নিয়ে দ্রুততম সময়ে আরণ্যের শব ওখানে নিয়ে যেতে বলে। পেছন পেছন আসে লক্ষণ সেনের নৌবহর।

পরদিন শ্মশানঘাটের কাছে এসে যখন পৌঁছে লক্ষণ সেনের নৌবহর, আরণ্যের চিতা সাজিয়ে সবাই অপেক্ষায় রয়েছে তখন। মাঝনদীতে নোঙর ফেলার আদেশ দেয় সে। প্রদ্যুম্নকে খবর পাঠায় মুখাগ্নি করতে। আরণ্যের চিতার আগুন দেখে সহ্য করা লক্ষণ সেনের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব। গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। পুত্র শোক নাকি মানুষের সব চেয়ে বড় ব্যথা দেয়া। কিন্তু আরণ্যকে হারানোর কষ্ট ও বেদনা লক্ষণের কাছে যেন তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। এই বন্ধুহীন পৃথিবীতে একজন বন্ধু পাওয়া সত্যি কঠিন। স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পৌত্র সবই হয়তো পাওয়া যায়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া সত্যি প্রায় অসম্ভব। জীবনের সুখদুঃখগুলো ভাগ করে নেয়ার জন্য আর কেউ রইল না লক্ষণের জীবনে। আরণ্যের চিতা জ্বলে ওঠে। রাজাদেশে রাজকীয় মর্যাদায় চিতা সাজানো হয়েছে। আকাশ ছুঁয়েছে আগুনের টকটকে লাল শিখা। লক্ষণ জানে, ধর্ম-বিষয়ে আরণ্যের মনে দ্বিধা ছিল। কিন্তু লক্ষণ এখনো পুরোপুরি আস্থা রাখে ধর্মে। মনে মনে ওর উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র জপ করে লক্ষণ সেন:

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রাহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ...

(সূর্যদেব আমাদের কল্যাণ করুন। বরুণ অনুকূল হোন। অর্যমন প্রসন্ন হোন। ইন্দ্র অনুকূল হোন। বৃহস্পতি প্রসন্ন হোন। বিষ্ণুদেব অনুকূল হোন। নমস্কার ব্রহ্ম। নমস্কার বায়ু। ...)

২০

শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে কয়েকদিন লেগে যায়। দক্ষিণদ্বীপে এই প্রথম এসেছে মহারাজ লক্ষণ সেন। ওখানের মহামাণ্ডলিক যেহেতু প্রদ্যুম্ন তাই ওর আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। একেবারে বাকহারা হয়ে পড়েছে লক্ষণ সেন। কারো সঙ্গে এক-দুটা বাক্য উচ্চারণ করার ইচ্ছেটাও অবশিষ্ট নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথা দুলিয়ে সম্মতি অথবা অসম্মতি জানিয়ে দেয়। সৎকার-পরবর্তী অনুষ্ঠান সব শেষ হলে নৌকা ভাসাতে আদেশ দেয় লক্ষণ সেন। প্রদ্যুম্নর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে সংগীতাকে। বল্লভকে বলে লক্ষণ সেনের বজরায় রাজমহিষীর কক্ষের সঙ্গে আরেকটা কক্ষে সংগীতার থাকার ব্যবস্থা করতে।

ভোরের দিকে কিছুটা কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সূর্য উঠার পর নৌকা ছাড়তে হয়। নদীতে স্রোত কম। জলের গভীরতা কমে যাওয়ায় নৌবহরের বিশালাকার নৌকাগুলোকে অনেক ঘুরপথে যেতে হয়। নদীর বুকে অসংখ্য চর জাগতে শুরু করেছে। নতুন নতুন চরের হদিস অভিজ্ঞ মাল্লাদেরও জানা থাকে না। কোথাও কোথাও চরে আটকে যায় ওদের কোনো কোনো নৌকা।

এক নাগাড়ে বেশ কদিন চলার পর বল্লালপুরীর কাছাকাছি এলে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করে, 'মহারাজ কি বল্লালপুরী অবস্থান নেবেন?'

এক কথায় 'না' বলে দেয়ায় আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না সে। বল্লভ এসে যখন আবার জিজ্ঞেস করে, 'দাদুমশায়, ঠাকুরমা বলেছেন বল্লালপুরী যাবেন কিনা?' জলের দিকে চোখ রেখে লক্ষণ সেন বলে, 'তোর ঠাকুরমাকে বল গিয়ে বল্লালপুরী যেতে চাইলে সে যেতে পারে।' শেষ পর্যন্ত রাজমহিষী এসে যখন আবার জিজ্ঞেস করে লক্ষণ সেন বলে, 'আমি তো বলেছি ওদের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে যাচ্ছি না। তোমাদের যার খুশি চলে যেতে পার ওখানে।' ফিরে এসে দরোজায় খিল আটকে পড়ে থাকেন রাজমহিষী।

লক্ষণ সেনের আচরণে এত বেশি শীতলতা ও দার্ঢ্য এসেছে যে কারো সাহস হয় না ওকে কিছু বুঝিয়ে বলতে যাবে। ফলে নৌবহর পদ্মাবতীর উজান স্রোত ধরে এগিয়ে যেতে থাকে দিনের পর দিন। নদী শীর্ণ হয়ে উঠায় এবং কোনো কোনো তীর ভেঙে চর পড়ায় কখনো দাঁড় টেনে আবার কখনো গুন টেনে নৌকা উজিয়ে নিতে হয়। এবার এত বেশি ঘন কুয়াশা দেখা দিয়েছে যে নৌবহরের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে। কোনো একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছানোর আদেশ দিচ্ছে না লক্ষণ সেন। শুধু বলে পদ্মাবতীর স্রোত ধরে উজান বেয়ে যেতে।

নৌসেনাপতিও সেটা মেনে চলে। যেসব দিন কিছুটা আলোকিত থাকে, ঐ দিনগুলোয় বজরার বাইরে আসন পেতে জলের দিকে স্থির চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে লক্ষণ সেন। নয়তো ভেতরে গিয়ে শুয়ে বসে কাটায়। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। এভাবে কী জীবন এগোয়! বারকমণ্ডলের কাছাকাছি পৌঁছে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। ওখানের মহামাণ্ডলিককে ডেকে পাঠায় সে। ওর আবাসস্থানের কাছে অস্থায়ী রাজাবাস নির্মাণের জন্য আদেশ দেয়। দুদিন পর মহামাণ্ডলিক অনির্বাণ সেন হাতি সাজিয়ে মহারাজকে এগিয়ে নিতে আসে। মনে মনে খুশি হয় লক্ষণ সেন। ধরাধরি করে হাওদায় চড়ানো হয় ওকে।

নদীতীর থেকে খুব বেশি দূরে নয় অস্থায়ী রাজাবাস। পথে যেতে যেতে ছোট শিশু থেকে বুড়োদেরও দেখে লাল ও হলুদ ফুলে সাজানো মালা গলায় পরে আছে। কোনো উৎসব আছে কী আজ, না মহারাজকে বরণ করে নেয়ার জন্য সেজেগুজে রাস্তার দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা বুঝতে পারে না লক্ষণ। যুবতি ও নারীদের খোঁপায় ও চুলে শিউলি ও জুঁইফুলের মালা। পুরুষদের কপালে চন্দনতিলক আঁকা।

মহারাজের হাতি যাত্রাশুরুর পা উঠাতেই মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে। লক্ষণ সেন এবার বুঝতে পারে যে ওকে এখানে বরণ করে নেয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। এসব করতে গেল কেন অনির্বাণ? কোনো যুদ্ধ জয়ের পর রাজধানী ফিরে এলে এ রকম অভ্যর্থনা পেয়ে এসেছে লক্ষণ সেন। সেসব তো বিগত দিনের ইতিহাস। এটার অর্থ কী?

উদোম শরীর, কোমর জড়িয়ে এক টুকরো কাপড়ের উপর কালো কালো শরীরে ফুলের মালাগুলো যেমন বিসদৃশ, লক্ষণের কাছে পুরো ব্যাপারটাই তেমন মনে হয়। একটু পরে ভাবে, হোক যা খুশি। ওর ইচ্ছে, বা অনিচ্ছায় তো আর এসব হচ্ছে না।

দুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর মাধব সেন, কেশব, বিশ্বরূপ সহ মহামন্ত্রী পশুপতি, রাজজ্যোতিষী ও পুরোহিতকুল, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক প্রভৃতি ছোটবড় সব শাসক, প্রশাসক ও অমাত্যদের ডেকে পাঠানোর আদেশ দেয় লক্ষণ সেন।

কোনো এক শুভদিন দেখে রাজসভার আহ্বান জানাতে বলে মহামন্ত্রীকে। বল্লভকে বলে কর্ণসুবর্ণের প্রাক্তন সেনাপতি উমাচরণকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাতে। মহারাজের ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর প্রধান হিসেবে ওকে নিয়োগ দিতে চায় সে। আরণ্যের পর যাকে একান্ত বিশ্বাস করতে পারে, সে ওদের মধ্যে অন্যতম। সংবাদ পেয়ে দ্রুত এসে উপস্থিত হয় উমাচরণ।

অনির্বাণ সেন আত্মীয়তাসূত্রে রাজপরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ। আন্তরিকভাবে সে আহ্বান জানায় মহারাজের সাময়িক রাজাবাসটাকে শীতকালীন রাজধানীতে রূপান্তর করার জন্য। যদি মহারাজের ভালো লাগে তাহলে ভবিষ্যতে এখানেই জয়স্কান্ধাবার স্থাপিত হতে পারে।

এ বিষয়ে একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না লক্ষণ সেন।

সেনরাজ্যের চারদিক থেকে সামন্ত, মহাসামন্ত, বৈষয়িক, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক প্রভৃতি শাসক ও প্রশাসকেরা এসে বারকমণ্ডল ভরিয়ে তোলে। কিছুদিনের মধ্যে হাতি ঘোড়া ও সৈন্য সামন্তের পদভারে একটা সত্যিকার রাজধানীর রূপ পায় জায়গাটা। দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রামের প্রস্তুতি নেয় লক্ষণ সেন। বৈদ্যদের দেয়া ঘুমের ওষুধের প্রভাবে প্রায় সারাদিন ঝিমুনি ভাব থাকে। রাজমহিষী এসে মহারাজের পাশে বসে। বলে, 'অনুমতি দিন তো একটা আবেদন জানাতে চাই, মহারাজ।'

একটু অবাক হয় লক্ষণ সেন। চাওয়ার আর কী থাকতে পারে এখন বসুদেবীর? বলে, 'আবেদন বলছ কেন, আজ্ঞা কর বসুদেবী। কিন্তু আর কোনো কিছু দেয়ার বা অনুমোদন করার ক্ষমতা আছে আমার?'

'বিষয়টা একটু অন্য রকম, কীভাবে আপনার কাছে উপস্থাপন করব তাই ভেবে পাচ্ছি না অনেকদিন থেকে।'

'যাহোক, বলে ফেল বসুদেবী। জানই তো আজকাল কথা বলতেও ভালো লাগে না আমার।'

'আজ্ঞে মহারাজ। কথাটা বিশ্বরূপকে নিয়ে, ওকে রাজকার্যের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না কেন?'

লক্ষণ সেনের কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়। এটা জিজ্ঞেস করার পেছনের কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। বলে, 'এটা কী আবেদন, না অভিযোগ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপ করে থাকে রাজমহিষী। আবার বলে লক্ষণ সেন, 'কেন, অবশিষ্ট গৌড় রাজ্যটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা তো সেই করে যাচ্ছে। এটা গুরুদায়িত্ব না?'

'গৌড়ের কোথাও তো মহারাজের রাজধানী নেই।'

'কোথায় আছে, বসু দেবী?'

কোনো জবাব দিতে পারে না রাজমহিষী। বলে, 'শুনেছি মাধবকে নাকি পরবর্তী রাজা বানানো হচ্ছে?'

'ক্ষতি কী?'

'বিশ্বরূপ বোধ হয় একটু বেশি যোগ্য।'

'বিচক্ষণতায় হয়তো যোগ্য বিশ্বরূপ। কিন্তু রাজার দরকার বাহুবল। ওটা মাধবের বেশি। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেও বিচক্ষণতার ঘাটতি কিছুটা কাটিয়ে উঠা যায়। কিন্তু বাহুবল না থাকলে রাজা হওয়া যায় না।'

বসুদেবী বুদ্ধিমতি। বুঝতে পারে যে এখন কথা বলে কোনো কাজ হবে না। মাধবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন লক্ষণ সেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। যাওয়ার সময় বলে, 'মহারাজ নিশ্চয় ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভগবান সবার মঙ্গল করুন।'

রাজমহিষী বেরিয়ে গেলে দুশ্চিন্তার কালোছায়া নেমে আসে লক্ষণের মনের ভেতর। তন্দ্রাভাব কেটে গেছে পুরোপুরি। রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেও যে ভাঙন দেখা দিয়েছে এটা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। আর কদিনই বা বাকি আছে জীবনের। ওর মৃত্যুর পর ভাইদের মধ্যে যদি সিংহাসন নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় তাহলে এই সেনরাজ্যটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

আজ আরণ্য নেই। এখন একমাত্র ওর কথাই মনে পড়ছে বারবার। ও বলেছিল একদিন, 'মহারাজ, ভারতবর্ষের এ অঞ্চলে একটা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়ে উঠা দরকার। দক্ষিণের দ্রাবিড়দের সঙ্গে অথবা উত্তরের আর্যাবর্তের মানুষদের সঙ্গে এই পুবদিকের মানুষগুলোর একটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এদের একটা পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে উঠে দাঁড়ানো উচিত।'

পরিবারে যদি এখন এই অশান্তি দেখা দেয়, তাহলে ভবিষ্যতেও আর এটার সম্ভাবনা রইল না। পিতা, পিতামহকে দেখেছে, সেন পরিবারকে এক করে ধরে রেখে রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধবিগ্রহে সব সময় একতাবদ্ধ থেকেছে, রাজ্যের পরিধি বেড়েছে, সম্প্রসারণ হয়েছে সবকিছুর। এখন দেখি দুদিক থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে। বাইরে ও ভেতর থেকেও। ভেতরের এই ভাঙনের বিষয়ে সামান্য আঁচও করতে পারেনি লক্ষণ সেন। ভেবে শুধু অবাক হয়। এটার পরিণতি আর ভাবতে পারে না।

নাহ্, আর কিছু ভাববে না সে। আরণ্য ছিল তৃণমূল হতে আসা মানুষ। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি, দুটোই ছিল ওর প্রখর। সারা জীবন যুদ্ধে যুদ্ধে কেটেছে লক্ষণ সেনের। ভাবনার জগতটা গড়ে উঠার সময় পায়নি। ছোট্ট দুটো কাজ বাকি রয়েছে এ জীবনে। এ দুটো শেষ করতে পারলে জীবনকে বিদায় জানাবে লক্ষণ সেন। আবার ভাবে, এমনকি কোনো কিছু আর না হলেও বা ক্ষতি কী? সে তো কারো কাছে প্রতিশ্রুত না। আরণ্যই একদিন বলেছিল, ঈশ্বরও মাঝে মাঝে ভুলে যান তাঁর প্রতিশ্রুতি। সেও না হয় ভুলে থাকবে সব কিছু।

জ্যোতিষদের নির্ধারণ করে দেয়া এক শুভদিনে রাজসভায় বসে লক্ষণ সেন। সভার আনুষ্ঠানিকতা ও সাধারণ আলাপ আলোচনা শেষ হলে লক্ষণ সেন বিষয় দুটো উপস্থাপন করে।

'তিনটা বিষয় জানানোর জন্য আজকের রাজসভা। প্রথমটা হলো আরণ্যের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বিষয়ে, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম যা যা করার সবাই মিলে মিশে এই এখানটায় এটার অনুষ্ঠান করবেন। দ্বিতীয়টা হলো, ঐ অনুষ্ঠানের পর শুভদিন দেখে দুটো বিয়ের আয়োজন। মহামন্ত্রী পশুপতি, ধর্মাধিকারী হলায়ুধ ও ঈশান মহাশয়, আপনারা তিন ভাই-ই উপস্থিত আছেন এখানে, আমার পরম সৌভাগ্য। পণ্ডিত পুরুষোত্তম দেব আছেন। সামন্তরাজারা আছেন, মাণ্ডলিক মহামাণ্ডলিক ও অন্যান্য মাননীয় মহাশয়েরা আছেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রদ্যুম্নের কন্যা সংগীতার পাণিগ্রহণ করবে বল্লভ সেন।' এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে টিকি দুলিয়ে প্রধান পুরোহিত জোড়হাতে কোনো কিছু বলতে উদ্যত হয়। ওকে অনুমতি দেয় না লক্ষণ সেন।

'আচার্য মহাশয়, শাস্ত্রজ্ঞান অনেক নিয়েছি আপনাদের কাছ থেকে। আর চাই না। সামান্য হলেও ওই জিনিস কিছুটা আছে আমার। টিকি না থাকলেও গলায় একটা পৈতে ইচ্ছে হলে এখনো ঝুলাতে পারি।'

একেবারে চুপসে যায় পুরোহিত মহাশয়। মহামন্ত্রী পশুপতি কিছু বলার অনুমতি চাইলে লক্ষণ সেন বলে, 'বুঝেছি মহামন্ত্রী মহাশয় কী বলতে চাইবেন আপনি। আপনার দৌহিত্রীটি বল্লভের ঘরে না এলেও কেশবের পুত্র পৃথ্বীশের কাছে আসবে। বল্লভের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় সে, বরং বেশিই হবে। পৃথ্বীশের সঙ্গে দেবাঞ্জলিকে মানাবেও ভালো।'

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না লক্ষণ সেন।

'তৃতীয়, ওর সব চেয়ে বড় যে বিষয়টা, তা হলো, আমার অবর্তমানে মাধব সেন রাজা হবে।'

কারো সঙ্গে কোনো পরামর্শ বা বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও না দিয়ে এমন তিনটা ঘোষণা আসবে কেউ ভাবতে পারেনি। সভা শেষ করে দেয় লক্ষণ সেন। এত সংক্ষিপ্ত হবে এটা কেউ অনুমান করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব অনুষ্ঠান শেষ করতে শীত পেরিয়ে যায়। সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। প্রজাসাধারণ, অমাত্যবর্গ ও সামন্তরাজারা খুশি মনে ঘরে ফিরে যায়। হঠাৎ একেবারে একা হয়ে পড়ে লক্ষণ সেন। মহামাণ্ডলিক অনির্বাণের আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও উমাচরণকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ লক্ষণ সেন পদ্মাবতীর স্রোতে ভেসে পড়ে। নৌসেনাপতি জিজ্ঞেস করে, 'গন্তব্য কোথায় মহারাজ?' লক্ষণ সেন শুধু বলে, 'পদ্মাবতীর স্রোত ধরে উজিয়ে যাও।'

দিনের পর দিন পদ্মাবতীর স্রোত উজিয়ে এগিয়ে যায় লক্ষণ সেনের নৌবহর। প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। লক্ষণ সেনের জীবনে হয়তো এটাই শেষ বসন্ত। দুচোখ ভরে শেষবারের মতো দেখে নেয় নদীতীরের দৃশ্য। আরণ্য বলত 'মহারাজ, নদীর জল যত গড়িয়ে নেমে যায় ভাটিতে সময় তত সামনে এগিয়ে চলে। সময় ও জল দুটো বিপরীতমুখী।' বিষয়টা ওভাবে ভেবে দেখেনি তখন। আরণ্য বেঁচে থাকলে হয়তো বলত, বিষয়টাকে অন্যভাবেও দেখা যায়, সময়ের স্রোত যেমন সামনে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে, তেমনি একই সঙ্গে পিছিয়েও যায় অতীতের গর্ভে।'

এখন কার সঙ্গে তর্ক করবে এ নিয়ে। 'আরণ্য, বন্ধু আমার, এত একা করে দিয়ে গেলে আমাকে!'

বসন্তের পাখি কোকিল ডাকতে শুরু করেছে ডালে ডালে। বজরার সামনের দিকে বিছানা পেতে শুয়ে আকাশ দেখে লক্ষণ সেন। ভগবানে বিশ্বাস এখনো অটুট রয়েছে ওর। মনে মনে প্রার্থনা করে আরণ্যের জন্য। ভগবান, তোমার আশীর্বাদ রেখ ওর জন্য। তোমার এই নষ্ট পৃথিবীতে খুব বেশি আরণ্য জন্মায় না।

চোখে হয়তো তন্দ্রার ঘোর লেগেছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ মেলে চাইতে যায় লক্ষণ সেন। হয়তো সূর্য বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। চোখ খুলতে চেয়ে আবার বন্ধ করে ফেলে। এক ঝলকে যা দেখেছে তাতে আতঙ্ক জাগে ওর মনে। আকাশে এত বাদুড় এল কোত্থেকে! শত শত কালো বাদুড়ে ছেয়ে গেছে পুরো আকাশ! সূর্য হয়তো মেঘের আড়ালে সরে গেছে। চোখের পাতার ভেতর দিয়ে আলোর তীব্রতা সেভাবে আর নেই। চোখ খুলে দেখে বাদুড় নয়, আকাশে অসংখ্য কালো কাকের আনাগোনা। আবার চোখ বন্ধ করে সে। একটু পরে চোখ খুলে দেখে পুরোপুরি নীল আকাশ। একটা কাকও নেই। ছোট্ট একটা ফিঙে অনেক বড় একটা খয়েরি ডানার পাখিকে তাড়া করে চলেছে। পরক্ষণেই ভাবে, নাকি ওই পাখিটাই ফিঙেটাকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। কী যেন পাখিটার নাম? একাগ্রভাবে মনে করার চেষ্টা করে সে। কিছুতেই মনে করতে পারে না। আরণ্যকে জিজ্ঞেস করার জন্য মনের

ভুলে ডেকে ওঠে ওর নাম। আকাশের ওপার থেকে ওর গভীর গলার স্বর ভেসে আসে। সে যেন আবৃত্তি করছে:

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ।।

(এখনো যাদের আত্মোপলব্ধি হয়নি তারা শুধু মনের নিয়ন্ত্রণ করে ভয় ও দুঃখ জয় করতে পুরোপুরি সক্ষম হয় এবং আত্মজ্ঞান ও চিরশান্তি অর্জন করে।)

আরণ্য, প্রিয়সখা আমার, চিরবন্ধু আমার, আর কত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে ঐ চিরশান্তি লাভ করার জন্য? মনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই যে হারিয়ে ফেলেছি আমি!

চোখ মেলে লক্ষণ সেন। সামনে দেখে ঝকঝকে নীল আকাশ। কোথাও কিছু নেই। খুব তেষ্টা পেয়েছে ওর। রাজমহিষীকে ডাকার চেষ্টা করে। ওর নাম কেন মনে পড়ছে না? হায় ভগবান, রাজমহিষীর নামটাও যে মনে আসছে না! মানুষের স্মৃতি কী এতই দুর্বল? বেঁচে আছি তো!

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে লক্ষণ সেনের মনে হয় জীবনের আঁকাবাঁকা পথ চলায় সামান্য একটা দড়ি দেখে এতদিন সাপ বলে ভুল করে এসেছে। এখন মনে হয় মৃত্যুর ছদ্মবেশে প্রকৃতই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা সাপ! ঘোরের ভেতর সে শুনতে পায় অনেক দূর থেকে আরণ্যের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে:

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

(ব্রহ্ম অনন্ত। এ জগৎ অনন্ত। এ জগৎ ঐ ব্রহ্মার উপর আরোপিত এক সত্তা মাত্র। এ জগৎ সরিয়ে দেয়া হলেও ঐ ব্রহ্ম অনন্তই থেকে যায়। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~